উৎসর্গ।

অসেচনক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়

সোদর প্রতিমেষু।

প্রিয় সুহৃদ্!

ধর্ম্মের যদি কিছু সার বুঝিয়া থাকি, তবে তাহা প্রেম। ব্রহ্মাণ্ড এই প্রেম শিক্ষার বিশাল বিদ্যালয়; এখানে শিক্ষার আরম্ভ, অনন্ত জীবনেও শিক্ষার শেষ হয় না। সখ্য-প্রেম আবার আমার কাছে পরম উপাদেয়। শান্ত, দাস্য, কেন? বাৎসল্য ও মধুর প্রেমও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। সখা, সখাকে রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে তো উপদেশ দেন—ভালবাসেন; তা'ছাড়া জনকজননীর ন্যায় অকপটে স্নেহ করেন, দাসের ন্যায় সেবা করেন, এবং মনের গূঢ় কথা খুলিয়া বলিয়া আত্ম-সমর্পণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সখার নিকট সখার কিছুই ছাপা থাকে না। দুঃখের মধ্যে এরূপ অকৈতব সখ্যপ্রেম জগতে দুর্ল্লভ। আপনাতে সেই প্রেমের ছবি দেখিয়াছি, তাই আমার ন্যায় অপ্রেমিকও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে নাই। আপনি আমার বয়সে ছোট হইলেও আপনার কাছে কত পাইয়াছি, কত শিখিয়াছি; বলিতে কি—আপনার প্রেম-ঋণে আমি চির ঋণী; প্রতিশোধ দিবার ক্ষমতা নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় আপনার প্রেমই তাহার একমাত্র প্রতিশোধ। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলাপূর্ণ 'চৈতন্যলীলামৃত' আপনারই সখ্যপ্রেমের ফল; আপনার সাধু মন্ত্রণাই ইহাকে জগতে আনিয়াছে। আমার মানসপুত্র হইলেও আপনার কম আদরের পাত্র নয়। তাই আজ আনন্দমনে ইহাকে আপনার করকমলে অর্পণ করিয়া সুখী হইলাম। ইতি।

কুষ্টিয়া,
ভাদ্র, ১২৯৭ সাল।

আপনার স্নেহের
জগদীশ।

বিজ্ঞাপন।

হরি ওঁ।

ইতি পূর্ব্বে 'নব্যভারত' নামক মাসিক পত্রিকায় 'চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম' নামে শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সব প্রবন্ধ সংশোধিত ও কোন কোন অংশ পুনর্লিখিত হইয়া এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ সমাজের অবস্থা সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিচ্ছেদ ব্যতীত চৈতন্য-দেবের জীবন-ইতিহাসের সন্ন্যাসযাত্রা পর্য্যন্ত ঘটনা সন্নিবেশিত হইল। উত্তর ভাগে তদীয় জীবন লীলার শেষাংশ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীমল্লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীমদাচার্য্য কবিকর্ণপুর, শ্রীমন্নরহরি দাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণের গ্রন্থাবলম্বনে গ্রন্থের মূল বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই সকল মহানুভবদিগের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহাদের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম। স্বকীয় অনুভব যাহা গ্রন্থের অনেক স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বক্তব্য যে, জানিয়া শুনিয়া আমার অহঙ্কার-জনিত বিকৃত জ্ঞানে কোন কথা লিখি নাই। অন্তর্যামী অন্তরে বসিয়া যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, লেখনী তাহাই প্রকাশ করিয়াছে মাত্র। আমার লেখা শুক পাখীর পড়া ও ছায়াবাজীর পুত্তলিকার নাচের ন্যায় উপলক্ষ মাত্র। আমার কি সাধ্য যে, যুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের জীবন-লীলা স্পর্শ করি? বামন কি আকাশের চাঁদ ছুঁইতে পারে?

গ্রন্থের অনেক স্থানে বিশেষতঃ প্রথমাংশে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি থাকিয়া গেল, তাহা আমার দুর্ব্বল বুদ্ধির দোষে ঘটিয়াছে। সে জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে সাধারণের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি।

কুষ্টিয়া,
ভাদ্র, ১২৯৭ সাল।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

চৈতন্যলীলামৃত।

পূর্ব্বভাগ।

সূচিপত্র।

পত্রাঙ্ক।

চৈতন্যলীলামৃত।

পূর্ব্বভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

আজকাল এদেশে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। সহরে, পল্লিগ্রামে, নগরে, উপনগরে, যেখানে যাই সেইখানেই দেখি সাকার, নিরাকার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সকল উৎসাহের সহিত আলোচিত হইতেছে। স্কুলের ছাত্রদিগের মুখেও এখন ঈশা, মুসা, নানক, কবির, শাক্য, চৈতন্যাদি ধর্ম্মবীরগণের ধর্ম্মজীবনের অতি উচ্চ উচ্চ কথা সকল শুনা যাইতেছে। শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারত সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূরস্থিত সভ্যতম ইউরোপেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী মহা আন্দোলন চলিতেছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা মানব জীবনের প্রহেলিকা ও ঈশ্বর তত্ত্বের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া গভীর চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ নিচয় জগৎকে উপহার দিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যেক ঈশ্বর-বিশ্বাসীর মনে বড় আশার সঞ্চার হয় যে, বুঝিবা এই দুঃখময় অবিশ্বাসী জগতে বিশ্বাস রাজ্য স্থাপিত হইবার দিন আগতপ্রায়। যে সকল নাস্তিক ও সন্দেহবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন আসিবে, যখন ভগবানের নাম পর্য্যন্ত মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে চির দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে, বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মান্দোলন তাঁহাদের কথার অলীকতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। সুবিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার তাঁহার Ecclesiastical institution নামক গ্রন্থে এক্ষণে একথা স্পষ্টরূপে স্বীকার

করিতেছেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব ও উপাসনা যে কেবল চিরকাল মানব-মনে অঙ্কিত থাকিবে, তাহা নহে, আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই উপাসনার ভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে। উপাসনাকে তিনি ঐশীভাবের সঙ্গীতময় উচ্ছ্বাস (musical expression of sentiments) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "That a sphere will exist for those who are able to impress their hearers with a due sense of the mystery which enshrouds the universe, and that *musical expression to the sentiment* [illegible] *this sense will not only survive but will undergo further development.*" ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ যুগান্তর উপস্থিত না হইলে, আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইতাম না।

এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এখন আর সেকালের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের কথা শুনিলে কাহাকেও উপহাস করিতে শুনা যায় না। কিন্তু ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা কখন বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, শিখাকণ্ঠীধারী স্থূলকায় বাবাজীদের শাস্ত্রে আবার শিখিবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে দিন চলিয়া গিয়াছে; আজকাল ধর্ম্মযাজকগণ বৈষ্ণব শাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন, ধর্ম্ম মন্দিরের বেদী হইতে প্রেম, ভক্তি, ভাব, মহাভাব সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদত্ত হইতেছে, বৈষ্ণব সাধুগণের জীবনের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেমের কথা সংবাদ পত্রে নিনাদিত হইতেছে, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থের মর্ম্ম সকল সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, এ সময়ে চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কেহ উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

যদিও ভক্ত চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অনেক বিষয় সভ্য জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, অথবা যাহা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের মতে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। কেন না, এক্ষণকার পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বসিয়া সুমার্জ্জিত রুচির সহায়তায়

তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিতে গেলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের বৃত্তান্তগুলিকে সমুজ্জ্বল বিধানালোকে দেখিতে না পারিলে তদীয় জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা এই গ্রন্থে এইরূপ আলোকের সাহায্যে তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে আমাদের স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত অতি অল্পই থাকিবে। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উক্তি অনুযায়ী নিঃসন্দিগ্ধরূপে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহারই উপর আমরা বিশেষ নির্ভর করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মজীবনের বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিণতিও যাহা, ভক্তি-শাস্ত্রের বিকাশোন্নতিও তাহাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং পাঠক মহাশয় মনে করিয়া লইতে পারেন যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনাও এ গ্রন্থের এক প্রধান উদ্দেশ্য। "বৈষ্ণবীয় ভক্তি শাস্ত্র" অর্থে আমরা চৈতন্য-প্রণোদিত ভক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে ভক্তি বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। বাস্তবিক ঘটনা এরূপ নহে। কারণ চৈতন্য জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল। পৌরাণিক সময়ের অভ্যুদয় কালে ভক্তিপ্রবণ ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে, তাহার পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ে বা কিছু পরে বৌদ্ধধর্ম্মের তীব্রগতি প্রতিরোধের জন্য রামানুজস্বামী, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক, তৎপরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ও জয়দেব গোস্বামী দ্বারা, এবং অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতাচার্য্য ও যবন-কুল-তিলক হরিভক্ত হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক এ শাস্ত্র আলোচিত, শুধু তাহা নহে, স্বস্ব জীবনে সংসাধিত হইয়াছিল। তবে চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত ভক্তি ও প্রেম ইঁহাদের প্রেমভক্তি হইতে যে অনেকটা ভিন্ন ছিল, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

নানাবিধ অত্যুক্তি ও রূপকালঙ্কারের মধ্য হইতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত সকল নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। একে তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী অতি বিরল, তাহাতে আবার তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতেন, তাহাতে তাঁহার সামান্য সামান্য কার্য্য পরম্পরাকেও তাঁহারা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য বলিয়া অদ্ভুত ও অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন; সুতরাং চৈতন্য জীবনের প্রকৃত ঘটনা নির্ব্বাচন করা যে বড় সহজ হইবে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ইহার ঘটনাপুঞ্জ দুষ্প্রাপ্য নহে। বৈষ্ণবেরা তাঁহার জীবনের ও ধর্ম্ম মতের প্রায় সমস্ত ঘটনাই বজায় রাখিয়াছেন, কেবল তাহার অনেক স্থল অলৌকিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন করিয়াছেন মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিতেন ও উপদেশ শুনিতেন, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। যাঁহারা তাঁহার জীবনবৃত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুশিষ্য ছিলেন না। তাঁহার তিরোভাবের অনেক পরে অর্থাৎ যখন চৈতন্যের অবতারত্ব এক রূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনই এই সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং এবিষয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ অতি অল্পই দেখিতে পাইব; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের নিজের বাক্যকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ বলিতেছি। তাঁহার কার্য্য কলাপ পরিদর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল লিপি গ্রথিত হইয়াছে, তাহাকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিব। ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধান মতে ইহা যদিও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু দর্শক ও শ্রোতাদিগের নিজ নিজ মনের ভাব, ও ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা, বক্তা ও অনুষ্ঠাতার ভাবের সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, কোন্‌টী কাহার, তাহা বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। সে জন্য আমরা এখানে প্রমাণ শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, ব্যবস্থা শাস্ত্র-বিশারদ পাঠক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্যের বাচনিক শ্রুত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রাশি রচিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের মতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ।

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত,
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত।
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর,
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া

বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।”

চৈতন্য চরিতামৃত।

“বেদগুহ্য চৈতন্য চরিত কেবা জানে ?
তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে।”

চৈতন্য ভাগবত।

“শ্রীচৈতন্য কথা যথা মতি যথা দৃষ্টং যথা বর্ণিতং
স্বগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।”

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি কি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেবের স্বপ্রণীত গ্রন্থ বা আনুপূর্ব্বিক পদাবলী পাওয়া যায় না। কেবল এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গুটী কয়েক সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা পদাবলী যাহা তাঁহার মুখ-বিনির্গত বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কীয় সর্ব্বাঙ্গীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করা যাইতে পারে না। কারণ তত্তৎ শ্লোক বা পদ বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভাবিত হইয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে উচ্চারিত হইত, সুতরাং সমস্ত জীবনের ঘটনাবলীর পরিচায়ক বলিয়া তাহাকে সমর্থন করা উচিত নহে। তবে তদ্দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মভাবের অনেক তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়। এইরূপ কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

নাম সঙ্কীর্ত্তনকে তিনি ঈশ্বর সাধনের পরম উপায় মনে করিতেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই—

“নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।”

হে ভগবন্! আমাদের উপর তোমার এমনি কৃপা যে, তোমার

নামেতে তুমি তোমার সর্ব্বশক্তি বহুপ্রকারে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ এবং ঐ নাম স্মরণের জন্য সময়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ; কিন্তু আমার এরূপ দুর্দ্দৈব যে এমন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

যেরূপে ভগবানের নাম লইলে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়, তৎ সম্বন্ধে উক্তি।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবসহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন,কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" *

তৃণের ন্যায় নীচ ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করতঃ হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

প্রার্থনা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ, যথা—

"ন ধনং, ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা পাণ্ডিত্য এ সব কিছুই বাঞ্ছা করিতেছি না, আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহেতুকী ভক্তি থাকে।

কিরূপ বাহ্য লক্ষণ হইলে প্রকৃতরূপে ভগবন্নাম গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, স্থানান্তরে তিনি তাহা প্রার্থনা বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদা রুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈর্নিচিতংবপুঃকদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।"

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন যুগল হইতে অশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে থাকিবে, গদ গদ বাক্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিবে; এবং পুলকে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইবে।

ঈশ্বর বিরহে তাঁহার কীদৃশ অবস্থা ঘটিত, তাহা পশ্চাল্লিখিত শ্লোক পাঠে জানা যায়।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে।"

গোবিন্দ বিরহে আমার নিমেষকাল যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়;

---

* এই শ্লোকটী তাঁহার রচিত কিনা ঠিক জানা যায় না। সর্ব্বদা তিনি এই শ্লোকাবলম্বনে উপদেশ দিতেন।

বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হয় এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বোধ হয়।

সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া এই পদটী এক সময় গাইয়াছিলেন :—

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু,
যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে কড়চা গ্রন্থ গুলিই প্রধান। এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সভ্য সমাজে দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনার ডাইরি ও স্মৃতি লিপি (Memorandum) রাখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্থাকরঙ্গধারী অর্দ্ধসভ্য বৈষ্ণব সমাজে যে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ইহা সামান্য বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অনেক পাঠক হয় তো মনে করিতে পারেন যে, এরূপ বলা কেবল বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার আবিষ্কার মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ও অনুচরগণের মধ্যে স্মৃতিলিপি রাখার প্রথা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল। এইরূপ স্মৃতিলিপিকে তাঁহারা কড়চা গ্রন্থ বলিতেন ও রচয়িতার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইত। যথা ;—রূপ গোস্বামীর কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ইত্যাদি। অনুমান হয়, কড়চা নামটী পারস্য ভাষার জমিদারী কাগজ বিশেষের নাম হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এক্ষণেও জমিদারী সেরেস্তায় একটী কাগজ প্রচলিত আছে, তাহার নাম কড়চা কাগজ; ঐ কাগজে প্রতি প্রজার জমি ও তাহার জমার পরিমাণ ও যত টাকা যে যে সময়ে উসুল দিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে ; তাহা দৃষ্টি মাত্রেই বলা যাইতে পারে যে, ঐ প্রজার জমি জমা কত ও তাহার নিকট কত টাকা বাকী আছে। যাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব হইতে ধর্ম্ম জগতে কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে ; ও তৎকালের সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারের জন্য যিনি কতই অভিনব উৎকৃষ্ট রীতি চালাইয়া ছিলেন, সেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্যদেব যে পারস্য ভাষা হইতে এই কড়চা নামটী গ্রহণ করিয়া তাহা অন্য ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

উপরি উক্ত কড়চা গ্রন্থে চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী আপন আপন রুচি বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে তাঁহার কার্য্য বিবরণ, উপদেশ ও আচার আচরণ, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিয়া রাখিতেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা

তন্মধ্যে বহু পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া রাখিতেন। রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর কড়চায় সংস্কৃতের ভাগ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, সনাতন ও জীব সর্ব্বদা পুরুষোত্তমে চৈতন্তের নিকট বাস করিতেন না সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহারা কড়চা লিখিতে অমনোযোগী ছিলেন না। চৈতন্তের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রণীত কড়চা সকলও সেই ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে।

এ সম্বন্ধে মহর্ষি ঈশা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্তের জীবনেতিহাস অতি আশ্চর্য্য রূপে ঐক্য। জন, মথি, লুক প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়ানাচার্য্যগণ ঈশার সমসাময়িক থাকিয়া যেরূপে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই যোগীশ্রেষ্ঠ ঈশাকে স্বয়ং ব্রহ্ম, দেবনন্দন রূপে পৃথিবীর পাপীগণের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, বলিয়া যেরূপে বিশ্বাস করিতেন, ভগবদ্ভক্ত চৈতন্য সম্বন্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। উভয় স্থলেই গ্রন্থকারগণ প্রকৃত ঘটনার সহিত এত অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলী চিত্রিত করিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে তাহা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ এই সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানী ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অপ্রত্যয় করাও কঠিন। সাধারণতঃ আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, কি খ্রীষ্টীয়ানাচার্য্যগণ কি বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ, কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক অসত্যকে আশ্রয় দেন নাই। মহীয়সী-ক্ষমতা-সম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি সাধারণের অবিচলিত ও দৃঢ় বিশ্বাস নিবন্ধন দুর্ভাগ্য ক্রমে ধর্ম্ম জগতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

মুরারিগুপ্ত নামক নবদ্বীপবাসী জনৈক চিকিৎসক চৈতন্তের বাল্যসখা ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতন্যদেব সর্ব্ব প্রথমে যে সকল বন্ধুর নিকট আপনার ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন। চৈতন্তের আদিলীলা বিষয়ে তিনি এক কড়চা লিখিয়াছিলেন। এই কড়চাতে গৌরাঙ্গের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সূত্র অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা বৃন্দাবন দাস ইহাই অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত
সূত্ররূপে মুরারীগুপ্ত করিলা গ্রন্থিত।"
চৈতন্য চরিতামৃত।

শেষাবস্থায় চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করিতেন। স্বরূপদামোদর নামক শিষ্য তথন সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তাঁহার কড়চাই শেষ জীবনের প্রামাণিক গ্রন্থ। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহা হইতেই অধিকাংশ ঘটনা আপন পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

"প্রভুর মধ্য, শেষ লীলা স্বরূপদামোদর
সূত্ররূপে গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।" চৈতন্য চরিতামৃত।

এই শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর-প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রধান। কিন্তু কবিকর্ণপুরের প্রাপ্ত যৌবন হইতে না হইতে চৈতন্যের তিরোভাব হয়; সুতরাং তৎপ্রণীত গ্রন্থ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই পরিগণিত হওয়া উচিত।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতি মূলক যত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৃন্দাবনদাস কৃত চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত, কবিকর্ণ-পুরকৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকাদি ও লোচনদাস কৃত চৈতন্য মঙ্গলই প্রধান। তদ্ভিন্ন রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বহুবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে সমুদায় চৈতন্যের অবতারত্ব সংস্থাপন ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যত, তত তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে নহে। অতএব সে সমুদয় গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

চৈতন্যের স্বর্গারোহণের পর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবনদাসকে বৈষ্ণবেরা ব্যাসের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস;
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ;
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

ইনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দ ব্যাস পূজা করিয়াছিলেন ; সে সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বৎসর।

"শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান,
তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।
চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত,
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত।"

চৈতন্য এই বালিকাটীকে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যাসের উদ্দেশে নিবেদিত প্রসাদ আপনি খাইয়া ভুক্তাবশেষ নারায়ণীকে দিয়াছিলেন। অতএব বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, চৈতন্যদেবের শক্তি সঞ্চার হেতু বৃন্দাবন দাস ব্যাসের অবতার হইয়া উত্তর কালে নারায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

"নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাস বৃন্দাবন।"

চৈতন্য চরিতামৃত।

বৃন্দাবন দাস প্রণীত বলিয়া চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে এক্ষণে যে গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম চৈতন্য ভাগবত। অথচ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উহার নাম চৈতন্য মঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী আছে যে, পরবর্ত্তী সময়ে লোচন দাস নামক জনৈক বৈদ্যবংশীয় বৈষ্ণব চৈতন্য জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্য মঙ্গল নামে তাহার নামকরণ করেন। তৎকালের প্রথানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রন্থকারকে আপন গুরুর অনুমতি লইতে হইত। লোচনের ইষ্ট দেবের নিকট প্রকাশার্থে ঐ পুস্তক আনীত হইলে তিনি দেখিলেন যে, বৃন্দাবনের গ্রন্থের নামে এই গ্রন্থ অভিহিত হইয়াছে ; তজ্জন্য শিষ্যের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন যে "বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যতক্ষণ নিরাকৃত না হয় ততক্ষণ এ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, তোমার মুখদর্শন করিব

না।” বৃন্দাবন দাস তখনও জীবিত ছিলেন। লোচন দাস অগত্যা বৃন্দাবনের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করাতে বৃন্দাবন দাস প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও আপন গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া “চৈতন্য ভাগবত” রাখিলেন।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। যদি ও ইহা চৈতন্যভাগবতের পরে বিরচিত হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকরূপে চৈতন্যের ধর্ম্মমত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনাবলীর বৈচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহা সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও বৈষ্ণব সমাজে ইহা তদ্রূপেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গলাসাহিত্যসংসারের একটী অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার ও প্রেম ভক্তির অমৃত প্রস্রবণ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি দুর্দ্দশা যে, তাহারা আপনাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে কি রত্ন আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া উপবিভাগের অধীন ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পারে ঝামটপুর নামে এক খানি পল্লী গ্রাম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই গ্রামই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম স্থান।

“নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম,
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।” চৈঃ চঃ।

কথিত আছে যে তিনি অল্প বয়সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বপ্নে নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করত বৃন্দাবনে যাইয়া সমস্ত জীবন যাপন করেন। সে সময়ে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ অপরাহ্নে বৃন্দাবনবিরচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থে চৈতন্যের শেষ জীবনের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত না থাকায় তাঁহাদের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। তজ্জন্য মদন মোহন মন্দিরের অধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণদাসকে ঐ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণদাস যদিও তখন বৃদ্ধ, কিন্তু নবোৎসাহে উৎসাহিত

হইয়া ঐ গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন ; এবং উদ্যমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ ব্রজবাসীদিগকে উপহার দিলেন।

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল,
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল।
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন ;
পাছে বিস্তারিয়ে তাহা কৈল বিবরণ।
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ;
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ;
চৈতন্যের শেষ লীলা না কৈল বর্ণন।"

চৈঃ চঃ।

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ ;
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন।
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া ;
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।"

চৈঃ চঃ।

১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন নগরীতে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। তৎসম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন।

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবানেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽশিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।"

১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রায় ৮২ বৎসর পরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত হইলে জীব গোস্বামীর অনুমতি লইয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে ; তাহা অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে, অথচ আপনাদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইবে না, এই আশঙ্কায়, কৃষ্ণদাসের উপর রাগান্বিত হইয়া জীবগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ লুকাইয়া এক কুঠরীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন ও কবিরাজকে কটূক্তি করিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া মথুরায় গমন করিয়া সর্ব্বদা এই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে,

সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি পুস্তক রচনা করিলেন, তাহা প্রকাশিত হইল না ও গৌরাঙ্গের শেষ লীলাও অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

"আমি যে করিনু গ্রন্থ সবার কারণে,
বিদ্যা না হইলে ধর্ম্ম বুঝিবে দর্শনে।
প্রভুর যে শেষ লীলা কেহ না জানিবে,
প্রেমভক্তি আচরণ কেহ না শিখিবে,
হেন গ্রন্থ দৈবে গেল কেহ না পাইবে ;
দয়াল চৈতন্য লীলা কেহ না জানিবে।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, চৈতন্য চরিতামৃত যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার এক এক পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে তিনি (মুকুন্দ) এক এক প্রস্ত নকল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের নকল তাঁহার নিকট রহিয়াছে।

"মুকুন্দ কহিল প্রভু করি নিবেদন,
যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন।
পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হৈলে লৈয়াছি মাগিয়া—
পড়িয়া লিখিয়া প্রভু দিতাম আনিয়া।"

বিবর্ত্ত বিলাস।

ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ প্রতিলিপিটী আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া মুকুন্দকে গোপনে রাখিতে বলিলেন, যেন জীব তাহা জানিতে না পারেন।

"মুকুন্দে আনন্দ হইয়া কহিল বচনে,
প্রকাশ না করিও এবে রাখ সাবধানে।"

পরে মুকুন্দ দ্বারা কবিরাজ ঐ নকল গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। তদবধি তাহা ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রচার হইয়া পড়ে।

"গ্রন্থ লৈয়া যাও বাপ শ্রীগৌর মণ্ডল,
লিখিয়া লয়েন যেন বৈষ্ণব সকল।
যারে তারে দিবা বাপ কহেন বচন॥" বিবর্ত্ত বিলাস।

কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত আসল গ্রন্থ অদ্যাবধি বৃন্দাবনে রাধা দামোদরের মন্দিরে আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহা এদেশে কখন আইসে নাই।

ধর্ম্ম সমাজে চিরকালই ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য কত না বিবাদ কলহ হইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাটী এরূপ ঘটনা-পুঞ্জের একটী অংশ মাত্র। এক দিকে জীবগোস্বামীর ও ঈর্ষা, অপর দিকে কৃষ্ণদাসের উদার ভাব তুলনা করিতে গেলে মনে হয় যে, এইরূপে ধর্ম্ম জগতে কতই না অনিষ্টপাত হইয়া গিয়াছে। যদি ভাগ্য ক্রমে মুকুন্দ দত্তের নিকট একটী নকল না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম জগতে একটী প্রধান রত্ন কীটদষ্ট পুঁথির আকারে বিগ্রহ মন্দিরে লুকায়িত থাকিত ও অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাইত, কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিত না।

চৈতন্য চরিতামৃতের পর লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে বিশেষ নূতনত্ব কিছুই নাই। তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের ছায়ামাত্র। তবে তাঁহার প্রণীত পয়ার ও ধুয়া গীতি কাব্য আকারে লিখিত হইয়াছে। যেরূপ কীর্ত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলের গান বৈষ্ণবপ্রধান রাঢ় দেশের অনেক স্থানেই গীত হইতে দেখা যায়। বোধ হয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইরূপে চৈতন্যের জীবন লীলা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।

চৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর প্রণীত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক একখানি প্রধান ও বোধ হয় প্রাচীনতম গ্রন্থ। গ্রন্থপ্রণেতা পুরীদাস চৈতন্যপার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছানুসারে শিবানন্দ বালকের নাম পুরী দাস রাখিয়াছিলেন। পুরীদাসের যখন সাত বৎসর মাত্র বয়স তখন তিনি পিতার সঙ্গে নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে অতি শৈশব হইতেই বালকের অদ্বিতীয় বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চৈতন্য দেব তাঁহাকে শ্লোক পড়িতে বলিলে তিনি নাকি সংস্কৃত ভাষায় এক সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক পর-বর্ত্তী সময়ে ইনি কবিকর্ণপুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত গদ্য পদ্যে শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে নাটক ও চৈতন্যচরিত নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ চৈতন্যান্তর্ধানের ৩৯ বৎসর পরে চন্দ্রোদয় নাটক রচিত হয়।

"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজি যুক্তে,
গৌরহরি র্ধরণীমঙ্গল আবীরাসীৎ
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজিতলীয়লীলা
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ।"

বিশ্বমঙ্গলকারী বিশ্বম্ভরদেব ১৪০৭ শকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার লীলা যুক্ত এই গ্রন্থ ১৪৯৪ শকে কোন ব্যক্তির মুখ হইতে প্রকটিত হইল।

গ্রন্থখানি নাটকাকারে লিখিত হইলেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহার স্বকপোল কল্পিত কিছুই নাই। তিনি যেমন দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রেমভক্তি মৈত্রী প্রভৃতি কল্পিত চরিত্রের যথেষ্ট সমাবেশ দেখা যায় এবং ৭ বৎসরের বালক যে চৈতন্য চরিত্রের ঘটনাবলী সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও সম্ভব বোধ হয় না। সুতরাং সময় গণনায় কর্ণপুরের গ্রন্থ প্রাচীন হইলেও ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ ভিন্ন উচ্চতর শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে না।

চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম বিষয় আলোচনার জন্য যে প্রমাণ প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ নিচয়ে পাওয়া যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন ভক্তমাল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে, যাহাতে এসম্বন্ধে অনেক আলোক লাভ করিতে পারা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা।

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে বঙ্গসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল, তখন কোন্ কোন্ আধ্যাত্মিক শক্তিরদ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুধর্ম্মের উত্থান, বিস্তার ও অধঃপতন বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে জন্য আমরা সে বিষয়ের স্থূল স্থূল বিবরণ বিবৃত করিয়া পরে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিব।

শক্তি উপাসনাই মানব হৃদয়ের প্রথম ধর্ম্মভাব, একথা স্থির সিদ্ধান্ত। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় জড় জগতের যে কোন পদার্থের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়, তাহাই তখন অলৌকিক ঐশীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত

হয়; সুতরাং তত্তৎ বস্তুকে মানুষ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিয়া থাকে সমস্ত মানব জাতির আদিম ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের আর্য্য-পূর্ব্ব-পুরুষগণ এদেশের আদি নিবাসী ছিলেন না। যখন তাঁহারা মধ্য-আসিয়া হইতে ভারতসীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহারা এই ধর্ম্মভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তজ্জন্যই আমরা ঋগ্বেদের প্রথমে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" প্রভৃতি সূক্ত সকল দেখিতে পাই। তাঁহারা শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির প্রভাব ও উপকারিতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। সেজন্য তৎকালে অগ্নিই তাঁহাদের প্রধান দেবতা ছিল। পরে ভারতে আসিয়া যতই তাঁহারা প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলেন, শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল, সুবিশাল তরঙ্গময়ী স্রোতঃস্বতী নিচয়, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত মেঘমালা ও নানাজাতীয় সুগন্ধ ও সুন্দর কুসুমাবলী প্রভৃতি এখানকার বিচিত্র পদার্থপুঞ্জ যতই তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তাঁহাদের দেবতার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালক্রমে আর্যঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি জড় পদার্থ সকলে দেবত্ব নাই; কিন্তু ঐ সকল পদার্থের অন্তরালে এমন এক একটী শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতেছে যে, তাহারই প্রভাবে ঐ সকল ভৌতিক পদার্থ এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী হইয়াছে। এইরূপে জড় পদার্থ হইতে জড়ের আধারভূত পৃথক্ পৃথক্ শক্তিতে দেবত্ব আরোপিত হইল। তখন ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি অসংখ্য বৈদিক দেবগণ এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইতে লাগিল। ঋগ্বেদসংহিতার আদিদেবগণ জড়জগতের প্রাকৃতিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্র সকলে আবার ঐ সকল দেবতার দেবত্ব সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। জড়ময় অগ্নিই ঋগ্বেদের প্রথম দেবতা, কিন্তু উত্তরকালে জড়কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্তরালবর্ত্তিনী শক্তিতে অগ্নির দেবত্ব নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কালসহকারে আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই সকল দেবতা কখন অনুকূল কখন প্রতি কূল। কখন কালে বৃষ্টি হইয়া শস্যাদি জন্মায়, আবার কখন অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইয়া শস্য সকল বিনষ্ট হয়। তখন ঐ সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, তাহাদের অত্যাচার ও প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা প্রয়োজন হইয়াপড়িল। সে জন্য নানাপ্রকার যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, বলিদান

প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সকল রচিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বেদ-সকলের মন্ত্র, সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র-রূপে পরিণত হইল।

এইরূপে যুগ যুগান্ত চলিয়া গেল, আর্য্যগণ ক্রমেই অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গভীর চিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন হইয়া জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বর তত্ত্বান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে ভারতে উপনিষদের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর্য্য মহর্ষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, যে অসংখ্য শক্তির দ্বারা এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাহা পৃথক পৃথক দেবতার পৃথক পৃথক শক্তি নহে, একই কেন্দ্র স্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত বিশ্ব মণ্ডলে ওতঃপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তি হইতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে ও যাহা হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আধার একই। এই ভাবটী যেই হৃদয়ঙ্গম হইল, অমনি তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন যে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, এই আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি কেবল জড়শক্তিনিচয়ের নিদানভূতা নহেন, তাঁহাতেই সমস্ত জ্ঞান, চৈতন্য, আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ও প্রাণীবৃন্দের প্রাণও তাঁহা-তেই অধিষ্ঠিত আছে। তিনি অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ও এক। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া মাত্র আর্য্যগণ বলিয়া উঠিলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

এক্ষণে বহু সহস্র শতাব্দী পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে তত্ত্বলাভ করিতে কতই যত্ন করিতেছেন, এবং যাহার অল্পাভাস পাইয়া যাহাকে জড়শক্তি, কেহ বা অজ্ঞেয় শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কত যুগ পূর্ব্বে সেই মহান্ তত্ত্ব লাভ করিয়া অতি দার্ঢ্য সহকারে বলিয়া গিয়াছেন যে "বেদাহ মেতং" আমি নিশ্চয় রূপে জানিয়াছি। হায়! আমা-

দের কি দুরদৃষ্ট যে, আমরা তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দি; অথচ তাঁহাদের সঞ্চিত রত্নকে পদ দ্বারা দলিত করিতে লজ্জিত হই না।

এই রূপে আর্য্যসমাজে ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণীত হইল বটে; কিন্তু তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইল না। কতিপয় চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত জন সাধারণে এই মত গ্রহণ করিল না। এক্ষণকার ন্যায় প্রচার করিবার জন্য যে কোন চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না। বর্ত্তমান্ সময়ে যেরূপ দেশ সাধারণে শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সময়ে সেরূপ সাধারণ শিক্ষার নিয়মও কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে এই ধর্ম্ম মত যে অপ্রচারিত থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আপামর সাধারণ লোক পূর্ব্বের ন্যায় জড় পূজক ও কুসংস্কারাবিষ্ট থাকিয়া গেল। এই ভাবে বহুকাল কাটিয়া গেল, ভারত ধর্ম্ম শূন্য হইয়া পড়িল এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অভাবে কতিপয় যাগ, হোম, বলিদান প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানই তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের যুগের অন্তর্ধান এবং পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল।

খ্রীষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেখিলেন যে, এত যাগ যজ্ঞ করিয়াও মানুষ শান্তি পাইতেছে না। ইহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুত্র গৃহসংসার সকলই পরিত্যাগ করিলেন এবং সাংসারিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যা ব্রত গ্রহণ করিলেন। ভগবৎস্বেচ্ছায় কালক্রমে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বাসনানিবৃত্তিকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। ক্রমে তাঁহার ধর্ম্ম দিগদিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল তরঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম যায় যায় হইয়া পড়িল। তখন ব্রাহ্মণাচার্য্যগণ অনন্যোপায় হইয়া জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য অভিনব তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অমনি অসংখ্য পুরাণ ও উপপুরাণ সকল রচিত হইয়া দেশময় ব্যাপিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা এই সকল পুরাণের দ্বারা এখন এইমত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর বাক্যমনের অগোচর, নিরাকার ও নির্ব্বিকার হইলেও সাধকের সাধনা সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে মূর্ত্তি বিশেষ পরিগ্রহ করত জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং এই সকল মূর্ত্তি পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা করা হইল; এবং তাহাতেই মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" যমদগ্নি।

চিন্ময় অদ্বিতীয়, অংশরহিত এবং অশরীরী হইলেও সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। নিরাকার-বাদীগণ এই শ্লোকের 'কল্পনা' শব্দের অবস্তুতে বস্তুত্ব আরোপ করা অর্থ করিয়া সাধক কর্ত্তৃক ঈশ্বরের রূপ স্বকপোলকল্পিত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সাকার-বাদিগণ 'কল্পনা' অর্থে 'পরিগ্রহ' ধরিয়া সাধকের সাধন সৌকর্য্যার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাকাররূপ গৃহীত হইয়া থাকে, এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; এবং এই মূল সূত্র ধরিয়া অবতারবাদ ও ঈশ্বরবিগ্রহের নিত্যসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এইমত সংস্থাপিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে উন্মূলিত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই সময় হইতে নানাপ্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের এক একটী শক্তিকে এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, অথবা ক্ষমতাশালী ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষে ঐশী শক্তি ও ঐশী গুণ আরোপ করিয়া নানাপ্রকার রূপকালঙ্কার ও অত্যুক্তিতে পূর্ণ করতঃ দেবোপাখ্যান সকল রচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই পাঁচটী প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া আর্য্যগণ বহুবিধ উপধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ষষ্ঠিমাখাল প্রভৃতিও দেবাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া তেত্রিশ কোটী দেবতার দুর্ভেদ্য দুর্গ সংগঠিত হইয়া উঠিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন সংসারিক অভাব মোচন ও সুখ সচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধন জন্য প্রথমে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় ও পরে যেমন সে, সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, অর্থকেই সার বস্তু জ্ঞানে রাশি রাশি সঞ্চয় করিয়া সুখানুভব করিতে থাকে; তদ্রূপ আর্য্যব্রাহ্মণগণ মূর্ত্তিপূজাকে পরমার্থসাধনের সহজ উপায় বলিয়া জনসাধারণে প্রবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে তাহাকেই সারবস্তু করিয়া প্রকৃত পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন!

এই পাঁচটী উপাসক সম্প্রদায়মধ্যে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগের শাক্তগণ আর উপনিষদের সময়ের শক্তিপূজকদিগের ন্যায় জড়প্রকৃতির অন্তরালে সেই আদ্যাশক্তিকে দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের উপাস্য আর অসীম আকাশে ও মানবের অন্ত-

রাত্মায় তেজোময় অমৃতময় রূপে প্রকাশিত হয়েন না, তাঁহাদের ভগবতী এখন মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী জড়মূর্ত্তিতে পরিণতা। তাঁহারা এক্ষণে শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, দেবাসুরের যুদ্ধ ও মধুকৈটভরক্ত-বীজবধোপাখ্যান সকল প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কাহার সাধ্য যে সে সকলের অবান্তর ব্যাখা করে? সেই হইতে অবতারবাদের ও মূর্ত্তি পূজার ভাব দৃঢ়তর কুসংস্কাররূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

শক্তি মন্ত্র সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন্য এই সময়ে আবার নানাপ্রকার তন্ত্র শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সকল তন্ত্র কাহা কর্ত্তৃক ঠিক কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই। কারণ অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই সকল শাস্ত্রে গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল তন্ত্রই শিববাক্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, এই সকল তন্ত্র অতি আধুনিক। শিব-বাক্য বলিলে সকলের আশু বিশ্বাস ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন বলিয়া, গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই সকল তন্ত্র যে কেবল একজনের লেখনীসম্ভূত, ইহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে; নানা সময়ে নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, ইহাই ঠিক যুক্তি।

তন্ত্র সকলের অভ্যুদয় কাল হইতেই শাক্তসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। একদল পূজা, হোম, বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত; অপর দল সুরা ও গণিকা পর্য্যন্ত লইয়া সাধন আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম ব্যভিচারের চরমদৃষ্টান্ত দেখাইলেন। প্রথমোক্তগণ পশ্বাচারী, অর্থাৎ তাঁহারা মদ্য ও গণিকা ব্যবহার করেন না বলিয়া পশু-প্রকৃতি, আর শেষোক্তগণ বীরাচারী বা বামাচারী বলিয়া আখ্যাত হইলেন। অধিকাংশ তন্ত্রই বীরাচার মত সমর্থন করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনের পাঁচটী উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। যাহাই থাকুক না কেন, তান্ত্রিক সাধকদিগকে দেখিলে সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মই যে প্রবল ছিল এবং শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগের উপর যে বিবিধ অত্যাচার করিত বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া,
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল,
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তণ্ডুল।
মদ্য ভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।" চৈঃ চঃ।

শাক্তগণ যেমন ঈশ্বরের রুদ্রভাব ও ধ্বংসকারিণী শক্তিকে অবলম্বন করত আপনাদের উপাস্যদেবতার গঠনকল্পনা করিলেন, স্বত্ব গুণাবলম্বী বৈষ্ণবগণ সেই রূপ তাঁহার পালনী ও স্থিতিকারিণী শক্তি লইয়া বিষ্ণু পূজার মত প্রচার করিলেন। কাল সহকারে এই মত সর্ব্বত্র আদৃত হইতে লাগিল, এবং সাত্বিক ভাবের লোক সকল ইহাতে যোগদান করিলেন। তখন ভক্তি-প্রবণশাস্ত্র সকল বিরচিত হইয়া জন সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, হরিবংশ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র এই যুগের ধর্ম্মান্দোলনের ফল। ক্রমে বিষ্ণুর দশাবতার ও মর্ত্তালীলা সকল ব্যাখ্যাত হইল এবং বিষ্ণু ও তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি, মনোমোহন-কারী পরম সুন্দর দেবাকারে পরিগণিত হইলেন। বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবগণও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করিয়া ছিলেন। দাক্ষি-ণাত্যদেশে বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য, সম্প্রদায় সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মকে নিয়মবদ্ধ আকারে পরিণত করিলেন। বোধ হয় ব্যভিচারী শাক্তদিগের অত্যাচার হইতে জনগণকে রক্ষার জন্য সম্প্রদায় প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

"পর মত বিরুদ্ধাংশে ছেদন করিয়া
স্বমত যাথার্থ্য স্থাপে বিচার করিয়া।" ভক্তমাল।

চারিটী সম্প্রদায়ের নাম শ্রী, চতুর্ম্মুখ, রুদ্র ও চতুঃসন। শ্রীসম্প্রদায়ের আদিগুরু রামানুজস্বামী, চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্যের স্থাপিত, বিষ্ণু স্বামী রুদ্রসম্প্রদায়, এবং নিম্বাদিত্য চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুপাসক ছিলেন; কিন্তু পরস্পরে বিষ্ণুর বিভিন্ন অব-তারের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। রামানুজ সম্প্রদায় রামের এবং মধ্বা-চার্য্য সম্প্রদায় কৃষ্ণের প্রাধান্য মানিয়া থাকেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি প্রভৃতি সাত্বিক ধর্ম্ম সকল শিক্ষা দিয়াছেন। সম্প্র-

দায়ী বৈষ্ণব সকলেই গৃহত্যাগী উদাসীন। তাঁহারা একটী একটী দল বাঁধিয়া গুরুর অধীনে বাস করিতেন, এবং দেশপর্য্যটনে অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইহারা যে যে স্থানে থাকিতেন, তাহাকে মঠ বলে। এক্ষণেও রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু প্রথমকালের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মের আর আধ্যাত্মিক ভাব নাই। নানাপ্রকার কদাচার ও কদনুষ্ঠান ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সম্প্রদায় ধর্ম্ম এক সময়ে এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে সম্প্রদায়বিহীন হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই গ্রহণ করা হইত না, এই বিশ্বাস বৈষ্ণব জগতে বদ্ধ মূল হইয়াছিল। বোধ হয় এই বিশ্বাস হেতু চৈতন্য দেবকেও সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে মধ্বাচার্য্য মতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

"বিনা সম্প্রদায় গুরু উপদেশ ব্যর্থ ;
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ।" ভক্তমাল।

সম্প্রদায় ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রথমতঃ ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্মের উদয় হয়। মাধবেন্দ্রপুরী, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনে যে নদীর প্রথম প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয় এবং যাহা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া মৃদু মন্দগতিতে বহিতে বহিতে শ্রীবাস, অদ্বৈত ও হরিদাস প্রভৃতির হৃদয় ক্ষেত্র অভিষিক্ত করে, সাগর সদৃশ চৈতন্য হৃদয়ের বিপুল ফোয়ারা খুলিয়া গিয়া তাহারই কলেবর বৃদ্ধিকরত এক মহা প্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণের ঈশ্বর বিশ্বাস কি রূপ উজ্জ্বল ছিল, তাহা যামুনাচার্য্য কৃত নিম্নোদ্ধৃত স্তোত্রটী পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে।

"উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরি ব্রঢ়িম স্বভাবম্।
মায়া বলেন ভবতাপি নিগুহ্য মানম্
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্য ভাবাঃ।" অলকমন্দার স্তোত্র।

হে ভগবন্! আপনার গোপনীয় চরিত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সীমার পরাকাষ্ঠা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এবং আপনিও মায়াবলে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ; কেবল আপনাতে অনন্য ভাব ভক্তেরাই তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত পাঠে ইহা বুঝিতে হইবে যে, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ

কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম স্থাপিত হয়। বিষ্ণু পূজার পদ্ধতি পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্প্রদায়ীগণ কেবল তাহারই মত সকল লইয়া এক একটী পৃথক দল গঠন করেন; এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব কালক্রমে বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। তবে সম্প্রদায়ীগণের ভাবের সহিত ঐ ভাব মিশিয়া গিয়া একটী অভিনব আকার ধারণ করে। চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এই অভিনব ভাব লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজন করিতেছিলেন। মধ্বাচার্য্য মঠের অধস্তন সপ্তম আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরী দেশ পর্য্যটন উপলক্ষে এদেশে আগমন করতঃ অদ্বৈতকে ভক্তির ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান; তদবধি প্রেমভক্তির জলন্ত ভাব সকল অদ্বৈতান্তঃকরণে উদ্দীপিত হইয়াছিল।

"তাঁর ঠাঁই উপদেশ করিলা গ্রহণ,
হেনমতে মাধবেন্দ্র অদ্বৈত মিলন।" চৈতন্য ভাগবত।

তৎকালে অদ্বৈতভবনেই বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইতেন। অদ্বৈতাচার্য্যের টোল ছিল; সেখানে অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। যবন কুলোদ্ভব ভক্ত হরিদাস যবন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহারই বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গসমাজ যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিল না, তাহাতে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে ভক্তি ও বিশ্বাস শূন্য লোকগুলা ধর্ম্মের নামে কেবল কতগুলি বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হইয়া পরিত্রাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, দেখিয়া অদ্বৈত বড়ই ব্যাকুল হইতেন এবং কবে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডীদিগকে উদ্ধার করিবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন।

"বিষ্ণু ভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার,
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার।" চৈতন্য ভাগবত।

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ,
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব রোগ।
লোক গতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়;
বিচার করেন লোকের কৈছে গতি হয়?" চৈতন্য চরিত।

কথিত আছে যে, প্রেম ভক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবতীর্ণ করাইবার জন্য তিনি সেই হইতে বিশেষ সাধনা আরম্ভ করিলেন ও আপনিও প্রাণপণ যত্নে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাপনা ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে, তাঁহারই সাধনার বলে পরবর্ত্তী সময়ে স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই যত্নে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।" চৈতন্য চরিত।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি তখন সর্ব্বদাই উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইত; এবং ইতর ভদ্র সকলেই বৈষ্ণবদিগকে উপহাস করিত। চৈতন্যভাগবতকার তখনকার ভাব অতি সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

"হাততালি দিয়া যে সকল ভক্তগণ
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন;
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে,
'ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ?
আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নারায়ণ;
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ ?
সংসারী লোকেরে বলে মাগিয়া খাইতে;
ডাকিয়া বলয়ে হরি লোকে জানাইতে।
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।'
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মেলিয়া।" চৈতন্য ভাগবত।

বৌদ্ধধর্ম্মের গতিরোধ জন্য যতগুলি আধ্যাত্মিক বল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদই প্রধান। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই শঙ্কর আসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিলেম এবং অল্প বয়সে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মত এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; জীবের অস্তিত্ব কেবল মায়া মাত্র; মায়াত্যাগ হইলেই জীব ও ব্রহ্মে কিছুই প্রভেদ থাকে না। এইভাবে তিনি সমস্ত বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিলেন। এক্ষণেও ঐ সকল শাঙ্করভাষ্য বেদবাক্যের ন্যায় মান্য হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, শিক্ষিত ও জ্ঞানীব্যক্তিদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করার জন্য এই মত উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বাস্তবিকও

তাহাই ঘটিয়াছিল। তৎকালের পণ্ডিত সমাজে এইমত সম্মানিত হওয়ার পর, বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়া সমুদ্র পারে ও হিমালয় পারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে এইমত বহুল প্রচার হইয়াছিল। এই মতের বিরুদ্ধে তাঁহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে মত অবলম্বন করিয়া শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য বিধর্ম্মী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আবার তাহারই মূলোৎপাটনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। বৈষ্ণব সমাজে এই মত এতই দূষণীয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে যে আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণ শঙ্করের নাম শুনিবামাত্র খড়্গহস্ত হয়েন। চৈতন্য "সোঽহং" 'তত্ত্বমসি' মত সকলের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক দেখাইয়া কাশীবাসী পরমহংস ও সন্ন্যাসীগণকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। তিনি উপনিষদ ও বেদসূত্রকে তত্ত্বজ্ঞানের আকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কেবল শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখাই দূষণীয় মনে করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি শঙ্করকে তিরস্কার করেন নাই, বরং বলিতেন যে, তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য এই অর্থ করিয়াছিলেন।

"উপনিষদ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব;
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণবৃত্ত্যে যেই ভাষ্য করিল আচার্য্য;
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য।
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা,
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।" চৈতন্য চরিতামৃত।

কালে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ মধ্যে আবার নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল; তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম শৈবধর্ম্মরূপে পরিণত হইল।

বৈষ্ণবগণ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন ও তাহা তখনকার শিক্ষিতদলে কিরূপ সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা পশ্চাল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যাইতে পারে।

"সন্ন্যাসীর সনে না করেন আলাপন;
সেই আপনাকে মাত্র বলে নারায়ণ।"

জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, বিরক্ত খ্যাতি যার ;
কারও মুখে নাহি দাস্যমহিমা প্রচার। চৈতন্য ভাগবত।
"ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস ;
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ?
মায়াধীশ, মায়বশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ ;
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ?"

এই ত গেল সম্ভ্রান্ত লোক ও শিক্ষিত পণ্ডিতদিগের কথা। ইতর সাধারণ লোকে না শাক্ত, না বৈষ্ণব, না অদ্বৈতবাদী ; ইহার কিছুই ছিল না। তাহারা সকল মতেরই সকল কথা মানিত কিম্বা না মানিত। যখন যে সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা পরিচালিত হইত, তখনই সেইরূপ চলিত। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মও মানিত, মাংস, সুরা প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যোগ দিত, আবার মায়াময় জগৎ, ঈশ্বর ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা দায়িত্ব নাই, ইহাও বলিত। তদ্ভিন্ন জনসাধারণে কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত দেবতাপূজার পদ্ধতি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাতেই তাহাদের অধিক আমোদ ও কৌতুক দেখা যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ষষ্ঠী প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার পর্ব্বেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহছিল। এক্ষণকার ন্যায় দুর্গোৎসবের প্রথা তখনও প্রবর্ত্তিত ছিল ; তাহা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা চৈতন্যের পূর্ব্বে কি ইতর, কি ভদ্র কেহই জানিতেন না। পশ্চাদুদ্ধৃত কবিতাটী তখনকার সামাজিক ধর্ম্ম ভাবের একটী সুন্দর ছবি।

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে ;
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি ;
তাহা যে পূজেন সেই মহা দম্ভ করি।
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে ;
মদ্য মাংস দানে পূজে কোন কোন জনে।
যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত ;
ইহা শুনিতে লোক সব মহা আনন্দিত।" চৈতন্য ভাগবত।

বিষহরির গান, রামায়ণের গানের ন্যায় গীত হয় ; তাহা এক্ষণেও কোন

কোন ইতর শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যোগীপাল গীতাদি কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার যো নাই।

যে সকল ধর্ম্মের কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন মুসলমান ধর্ম্মও তখন বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অর্থ লোভেই হউক, আর বল প্রয়োগ দ্বারাই হউক, অনেক এ দেশবাসী তখন মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; মুসলমান-দিগের ভাষা ও ভাব বহুল পরিমাণে সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; এবং মহম্মদীয় ব্যবহারাদিও গৃহীত হইয়া ছিল। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তি তখন সমাজ মধ্যে কার্য্য করিতেছিল, তন্মধ্যে মুসলমানের ধর্ম্মভাবও একটী। তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শাক্ত ধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শাস্ত্র বহির্ভূত নানা প্রকার সামা-জিক উপধর্ম্ম এবং কতক পরিমাণে মুসলমান ধর্ম্মের ভাব দ্বারা তদানীন্তন বঙ্গসমাজ পরিচালিত হইতেছিল। চৈতন্য ও তাঁহার সহযোগী ধর্ম্মাচার্য্য-গণকে এই সমস্ত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম স্থাপিত করিতে হইয়াছিল। ইহাতে কি প্রকার আধ্যাত্মিক বলের প্রয়ো-জন হইয়াছিল, তাহা চৈতন্য জীবনের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দিতেছে। ফলতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক বলের সহিত এই সকল আধ্যাত্মিক শক্তির যে সংগ্রাম, তাহাই তাঁহার জীবনের গূঢ় রহস্য।

এত গুলি শক্তির ক্রীড়াভূমি হইয়া বঙ্গসমাজ সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া চলিল, বঙ্গবাসীগণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে নিস্তেজ, অবসন্ন ও অসার হইয়া পড়িল, প্রাচীন আর্য্য সমাজের দৃঢ় বন্ধন ও ধর্ম্মভাব সকল শিথিল হইয়া পড়িয়া সমাজকে আধ্যাত্মিক অবনতির চরমাবস্থায় উপনীত করিল, এবং অচিরকাল মধ্যে সোনার বঙ্গদেশ প্রেত-ভূমিতে পরিণত হইল! কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বাঙ্গালী, বল বীর্য্য, সৎসাহস প্রভৃতি মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণ সমূহ ও পার্থিব উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইল বটে, কিন্তু ভগবান্ বাঙ্গালীর হৃদয় দিয়া যে ভাগ-বতী লীলা প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা তখন কে জানিত? সেই অন্ধকারময় পিশাচভূমিতেই যে উত্তরকালে সত্য ধর্ম্মের সূর্য্য উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোক দান করিবে, তাহা কোন্ মানব বুদ্ধির আয়ত্তাধীন ছিল? সেই জন্যই বুঝিবা বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত বাঙ্গালী জাতির সমস্ত ঐহিক সুখ কাড়িয়া লইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের জন্য তাহাকে অল্পে অল্পে প্রস্তুত করিতে-

ছিল। ফলতঃ যেমন মহর্ষি ঈশার আগমনের পূর্ব্বে সংসারবিরাগী যোহন আসিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন যে, "আমার পরে যিনি আসিতেছেন তাঁহার দ্বারা স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে," তদ্রূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম আসিয়া যেন এই বলিয়া গেল যে "বঙ্গদেশ প্রস্তুত হও! ভক্তি বন্যার জলে অজ্ঞান অন্ধকারের আবর্জ্জনা সকল ধৌত কর, আমার পর যে আলোক এখানে আসিতেছে তাহা হইতেই স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; অতএব সেই আলোক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।" ফলে আমরা চৈতন্যচন্দ্রের উদয়কে পরবর্ত্তী বিধান বিকাশের প্রথম উষা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। তিনি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গের আকাশ প্রান্তে তেজঃপুঞ্জ ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া ৪৮ বৎসর কালযাবৎ প্রেমভক্তির আলোকে বঙ্গবাসীর হৃদয় আলোকিত করতঃ পুনরায় অনন্তের বক্ষে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছেন। এই ৪৮ বৎসর মধ্যে এ দেশের ধর্ম্ম জগতে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাস আমরা এই পরিচ্ছেদে কিছু কিছু বর্ণন করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা।

১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৮৫ অব্দে চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান হয়।

"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।" চৈতন্য চরিতামৃত।

এই অর্দ্ধ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক বৃত্তান্ত আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাবলম্বনে কতক কতক প্রদর্শন করিতেছি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে হিন্দুরাজত্ব লোপ হইল; পৃথ্বীরাজের অধিকৃত সিংহাসন যবনকরতলন্যস্ত হইল। সুলতান সাহাবুদ্দীন দিল্লীর সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া আপন সৈন্যাধ্যক্ষ কুতবুদ্দীনকে তাঁহার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে সাহাবুদ্দীনের মৃত্যু হইলে গজনীর সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইল। তখন কুতবুদ্দীন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করতঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রধান সেনাপতি

বখ্‌তিয়ার খিলিজী সেনবংশীয় বৃদ্ধ নরপতি লাক্ষণেয়কে কৌশলক্রমে রাজ্য-চ্যুত করিয়া বঙ্গদেশে যবন পতাকা উড্ডীন করিলেন, এবং দিল্লীশ্বরের নামে স্বয়ং ইহা শাসন করিতে লাগিলেন। গৌড়নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সেই হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ক্রমান্বয়ে মুসলমান সুবাদারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক এই দেশ দুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্ব্বভাগে বাহাদুর খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হইয়া সোনার গ্রাম নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। নাজীরুদ্দীন ইহার পূর্ব্ব হইতে সমস্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। বিভাগের পরও তিনি গৌড় নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে দিল্লীর সম্রাট্‌গণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের অধীনস্থ সুবাদারগণ দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন হইতে লাগিলেন। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে লোদী-বংশীয় সম্রাট মহম্মদ সাহার অধিকার সময়ে সোনার গ্রাম বিভা-গের সুবাদারের জনৈক সামান্য ভৃত্য কৌশলক্রমে সমস্ত বঙ্গদেশ হস্তগত করতঃ সুলতান সেকেন্দার নামে বঙ্গের একেশ্বর হইলেন; এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত করিলেন। দিল্লীশ্বর তখন ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেকেন্দরের কিছুই করিতে পারিলেন না। সেই হইতে সম্রাট আকবর সাহার অধিকার অর্থাৎ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাঠান রাজগণের এইরূপ স্বাধীনতার কালেই নবদ্বীপে শচীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন।

চৈতন্যচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে বারিক নামে বঙ্গে-শ্বরের জনৈক খোজা স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া সুলতান সাজাদা নাম গ্রহণ করত গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ৮ মাস গত হইতে না হইতেই মুলুক আন্দিল নামক তাঁহার একজন সেনাপতি তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেরোজ সাহা উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙ্গসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ফেরোজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সাহা এক বৎসর রাজত্ব করিলে ১৪৯৫ সালে একজন আবিসিনীয় রাজপুরুষ তাঁহার জীবন নাশ

করিয়া মজঃফর সাহা উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙ্গরাজ্য অধিকার করিলেন। এই ব্যক্তি অতিশয় নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত স্বভাবের লোক ছিল। তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অচিরকাল মধ্যে ওমরাগণ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং মহম্মদীয় বংশজাত মন্ত্রী সৈয়দ হোসেনকে সেনাপতি করিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড় নগরের প্রান্তরে এক মহাসমর হইল; তাহাতে মজঃফর সসৈন্যে নিহত হইলে, দ্বিতীয় আলা-উদ্দীন নাম গ্রহণ করতঃ সৈয়দ হোসেন বাঙ্গলার মজনদে উপবেশন করি-লেন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এবং ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত সৈয়দ হুসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্য জীবনের দ্বাদশ হইতে পঞ্চত্রিংশবর্ষ পর্য্যন্তের ঘটনা তাঁহারই রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়া-ছিল। এই রাজার রাজত্ব সময়ে রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রজাগণ নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং অনেক সুনিয়মও সংস্থাপিত হইল। ইনি এক ডালার দুর্গ সংস্কার করিয়া সেখানে আপন বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং রাজ্যের অহিতকারী আবিসিনীয় ও অন্যান্য দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিলেন। ইহার পুত্র নশরৎ সাহা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার সময়ে গৌড় নগরে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ মালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে বৎসরে চৈতন্যের তিরোধান হয়, ইনিও সেই বৎসরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

গৌড়েশ্বর সৈয়দহুসেনের নাম চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয় আলাউদ্দীনের পূর্ব্বনাম সৈয়দহুসেন ছিল ও সে সময়ে তিনিই বঙ্গের অধী-শ্বর ছিলেন। সুতরাং চৈতন্যভাগবতের সৈয়দহুসেনই যে দ্বিতীয় আলা-উদ্দীন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যখন রাজধানীর সমীপবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে চৈতন্য হরিনামের মহিমা প্রচার করিতেছিলেন, কোটি কোটি নরনারী তাঁহাকে দেখিতে ও নামসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেছিল, মৃদঙ্গ করতালের নিনাদে দিগন্ত কম্পিত হইতেছিল এবং প্রেমভক্তির বন্যাতে সমস্ত বঙ্গভূমি ভাসিতেছিল, গৌড়ের সহর-কোতয়াল রাজাকে সেই বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

"কোতয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে;
এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে;

নিরবধি করয়ে ভূতের সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন।" চৈতন্য চরিতামৃত।

এই সম্বাদ পাইয়া সৈয়দহুসেন হিন্দু সভাসদগণকে বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎকালে কেশবছত্রী ও রূপ এবং সাকর মল্লিক এই তিন জন সর্ব্ব প্রধান হিন্দু সভাসদ্ ছিলেন। রূপ ও সাকর মল্লিককে বীরখাস ও দবীর খাস বলিত। চৈতন্যের প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও মহোচ্চপদ-মর্য্যাদাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করতঃ পরবর্ত্তী বৈরাগ্যাশ্রমে ইঁহারাই রূপ সনাতন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা এই বলিয়া চৈতন্যের বিষয় উড়াইয়া দিলেন যে, "কোথা হইতে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসিয়াছে, তাহার এত মহত্ব কি যে আপনি তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন ?" তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন, যবন জাতি ঘোর অবিশ্বাসী, এক্ষণে যদিও সাধুভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু পরে অন্যের মন্ত্রণা শুনিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে, এই বিবেচনায় চৈতন্যকে রাজধানীর নিকট হইতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ভগবানের নামের কি মহিমা ও সাধুগণের প্রকৃতি কি মনোহর! হোসেন সাহা চৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য ও গোঁড়া কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

"রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে ;
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।
যেখানে তাঁহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে ;
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন ;
বিরলে থাকুন কিম্বা যেবা লয় মন।
কাজী বা কোটাল কিম্বা অন্য কোন জন,
যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন।" চৈতন্য ভাগবত।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হোসেন সাহা একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন ; সুতরাং হিন্দুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। বৈষ্ণব গ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট পোষকতা পাওয়া যায়।

"যে হোসেন সাহা পূর্ব্বে উড়ীয়ার দেশে,
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।" চৈতন্য ভাগবত।

তবে যে চৈতন্যের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের ইচ্ছায় বলিতে হইবে।

এই সময়ে রূপ ও সাকর মল্লিক, দুই ভ্রাতা চৈতন্যচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চৈতন্যের প্রজ্বলিত বৈরাগ্যভাব তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে বিঁধিল। চৈতন্যদেব রামকেলি গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে উভয় ভ্রাতারই বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। রূপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাগ্রে চৈতন্যসন্নিধানে চলিয়া গেলেন। তখন সাকর সংসার ত্যাগের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; ও সমস্ত রাজকার্য্যের ভারার্পণই তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি অমনোযোগী হইয়া পীড়ার ভান করত বাটীতে বসিয়া থাকাতে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ গৌড়েশ্বর তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

"রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল।
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা,
কার্য্য ছাড়ি রৈলা তুমি ঘরেতে বসিয়া।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ।" চৈতন্য চরিতামৃত।

ইহা শুনিয়া সনাতন বলিলেন যে তাঁহার দ্বারায় আর রাজকার্য্য চলিবে না। তাঁহার স্থানে দ্বিতীয় লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন রাগান্বিত হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কতক দিন পরে রাজ মন্ত্রী উৎকোচের দ্বারা কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করতঃ বারাণসীনগরে যাইয়া চৈতন্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তদবধি উজীরীর পরিবর্ত্তে তাঁহার ফকীরী অবলম্বন হইল।

এই বৃত্তান্ত পাঠে সুরুচিসম্পন্ন পাঠক মনে করিতে পারেন যে, সনাতনের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে পীড়ার ভান করিয়া বাটীতে বসিয়া থাকা ও উৎকোচ দিয়া কারামুক্ত হওয়া অতি অন্যায় হইয়াছিল। তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, সনাতনের সেই ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ। সত্যাসত্য, পাপ পুণ্যের প্রভেদ তখনও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তীব্র বৈরাগ্যের উত্তেজনায় সংসার পরিত্যাগ করা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও তাহা সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ বলি না যে, সনাতন

তখন সমস্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তাহা হইত, তবে তাহার পর দুই মাস পর্য্যন্ত কাশীতে চৈতন্যের নিকট তাঁহাকে উপদেশ লইতে হইত না।

চৈতন্ত জীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের ঘটনাবলী উড়িষ্যার নীলাদ্রিতে সংঘটিত হইয়াছিল; এবং উৎকল রাজ ও তাঁহার প্রধান সভাসদ্গণ চৈতন্তের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। সুতরাং সে দেশের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এ গ্রন্থের নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নহে। চৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশ যেরূপ স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়া যবন করতলন্যস্ত হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে উড়িষ্যার অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। তখনও নীলাচলের রাজ প্রসাদে হিন্দুস্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়িতেছিল এবং সমস্ত উৎকল দেশবাসী স্বাধীনভাবে কাল যাপন করিতেছিল। অধিক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে চৈতন্য দেবের সময়ে বঙ্গদেশীয় রাজগণ উড়িষ্যার নৃপাসনে আসীন ছিলেন।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাসনে কেশরীবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে কেশরীবংশ ধ্বংস করতঃ গঙ্গাবংশের জনৈক রাজকুমার উৎকল সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। সেই হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ একাদিক্রমে উড়িষ্যার রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজাগণের সময়ে কেবল কয়েক বৎসর সিংহাসন লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছিল। সে যাহা হউক চৈতন্তের সময়ে গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র নামে নরপতি উড়িষ্যার রাজাসনে আসীন ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব সাব্যস্ত করিয়াছেন যে মেদিনীপুর ও তমলুকের মধ্যবর্ত্তী স্থান বিশেষ হইতে গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ প্রথমে উৎকলে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং এই রাজাগণ যে জাতীতে বাঙ্গালীছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও উইলসন সাহেবের কথাই দৃঢ়ীভূত হয়। কারণ এই রাজা অতিশয় বাঙ্গালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। প্রধান সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল।

রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত

ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনগত ইচ্ছা পত্রের দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যেকে জানাইলে ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গতঃ ঐ কথা চৈতন্যকে জানাইলেন। স্ত্রী ও রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং সন্ন্যাসী চূড়ামণি চৈতন্য এই কথা শ্রবণ মাত্রে (বিষ্ণু) (বিষ্ণু) বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন ও সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে যদি তিনি পুনরায় ঐরূপ কথার প্রসঙ্গ করেন তবে আর তাঁহাকে নীলাদ্রিতে দেখিতে পাইবেন না। সার্ব্বভৌম পরাস্ত মানিয়া অগত্যা ঐ কথা রাজাকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপরুদ্র গৌরাঙ্গের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে ঐ কথা শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন এবং চৈতন্যের সাক্ষাৎকার না পাইলে রাজ্যাদি সমস্ত বিষয় বৈভব পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভগবৎপ্রেমিক রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশে প্রতাপ রুদ্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরে চৈতন্যের সহিত তাঁহার মিলন হওয়ার পর রামানন্দ রায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল চৈতন্যের সহবাসে কাটাইবেন। এই মনোগত ইচ্ছা তিনি রাজাকে নিবেদন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র আহ্লাদ সহকারে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও তাঁহার নির্দ্ধারিত বেতন তাঁহাকে পেন্সন্ স্বরূপ মাসে মাসে দেওয়া হইবে তাহারও আদেশ করিয়া দিলেন; এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন।

> "তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন;
> নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ।
> আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
> তাঁরে যেই ভজে তাঁর সফল জীবনে।" চৈতন্য চরিতামৃত।

রামানন্দ রায় চৈতন্য সমীপে রাজার এই কাতরোক্তি বিজ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র আপন রাজধানী কটকনগর হইতে সার্ব্বভৌমকে এই দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন যে যদি তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন না পান তবে নিশ্চয়ই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া চলিয়া যাইবেন। এই পত্রে তিনি মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদগণকেও অতি দীন ভাবে আত্ম নিবেদন জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত চৈতন্যের

নিকট অনুরোধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এই পত্র পাঠ করিয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সমস্ত ভক্তগণ চৈতন্যকে চটেপটে ধরিলেন; কিন্তু ধর্ম্মবীর চৈতন্য কিছুতেই আপন বিশ্বাস হইতে টলিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া এক রফা-বন্দোবস্ত করিলেন যে চৈতন্যের এক খানি বহির্ব্বাস রাজসমীপে পাঠান হইবে; চৈতন্যের পরিবর্ত্তে রাজা ঐ বহির্ব্বাসকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন। তাহাই করা হইল। তাহাতে রাজা কতক শান্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিল না। তখন চৈতন্যদেব রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলে রাজা আপন তনয়কে গৌরাঙ্গ সন্নিধানে পাঠাইলেন। গৌরাঙ্গ মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজাও পরে সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ করিয়া কটক নগরে চলিয়া আসিলেন এবং নগরের বহিরুদ্যানে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি প্রভুর আগমন বার্ত্তা রাজস্থানে জানাইলে রাজা প্রতাপ রুদ্র যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন এবং বহুকালের সঞ্চিত মনের গাঢ় অনুরাগ এখন অনায়াসে চরিতার্থ হইতে পারিবে ভাবিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত যাইয়া চৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন ও প্রণয়বিহ্বলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তখন তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

"শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা;
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয় বিহ্বল;
স্তুতি করে পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন;
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।" চৈতন্য চরিত।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন উড়িষ্যারাজ ও বঙ্গেশ্বরে যুদ্ধ হইতেছিল। উৎকল সীমার পর পারে যবন রাজ্য। পথে দস্যুভয় ও যবন-সৈনিকগণের প্রচুর অত্যাচার ছিল। বঙ্গদেশে যাইতে পথিমধ্যে চৈতন্যের কোন অসুবিধা না হয় ও যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পারেন এই উদ্দেশে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রদেশস্থ ও বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীগণকে পত্র

লিখিয়া দিলেন, এবং পথের দুই পার্শ্বে সামগ্রীসম্ভার প্রস্তুত থাকে ও জলপথে নৌকার সুব্যবস্থা হয় এরূপ উপায় করিয়া দিয়া রামানন্দরায় ও আপনার প্রধান অমাত্য শ্রীহরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে তাঁহার সমভিব্যাহারে দিয়া পাঠাইলেন। সচিবদ্বয় যাজপুর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ রায় রেমুণা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে বহু ভক্ত মণ্ডলী যাইতে লাগিলেন। যেখানে যান রাজকর্ম্মচারী-দের সুব্যবস্থায় সেইখানে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ বহু ভক্ত সমাকীর্ণ হইয়া উৎকলের সীমান্তঃপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উৎকলরাজের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহার নিরাপদে বাঙ্গলায় যাইবার জন্য যবন রাজকর্ম্মচারীর সহিত সন্ধিস্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।

"দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে ;
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে।" চৈতন্য চরিত।

এই সময়ে যবনরাজের এক অনুচর উড়িয়াদিগের কটকে আসিয়া মহা-প্রভুর ভক্তিভাব ও নামসংকীর্ত্তন দেখিয়া গিয়া আপন প্রভুকে জানাইল। যবনাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়া চৈতন্যকে দেখিতে ইচ্ছুক হওতঃ আপন বিশ্বাসী অনু-চর দ্বারা আপন অভিলাষ বলিয়া পাঠাইলেন। উৎকল রাজাধ্যক্ষ মহা-পাত্র প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি নিরস্ত্র হইয়া কেবল দুই চারি জন ভৃত্য সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারেন ; নচেৎ নহে। যবনরাজ সেই প্রকারেই আসিয়া চৈত-ন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; এবং তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমভক্তির ভাবা-বলোকনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই দাম্ভিক যবন আপন পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন; এবং বালকের ন্যায় পরিত্রাণের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াগেল। তখন যবনাধ্যক্ষ চৈতন্যের বঙ্গ গমনের সকল সুবিধা করিয়া দিলেন এবং জলপন্থায় উত্তম উত্তম নৌকা সজ্জিত করিয়া দিয়া জলদস্যুগণ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, সেই জন্য পিছলদা পর্য্যন্ত স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। সেখান হইতে তিনি বিদায় হইয়া গেলে চৈতন্যদেব তাঁহার প্রদত্ত নৌকারোহণে নির্ব্বিঘ্নে পানীহাটী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

"জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল,
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদী পার করাইল;
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে;
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হইতে।" চৈঃ চঃ।

এক্ষণে যে জমিদারী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহার মূলান্বেষণ করিতে গেলে মুসলমান্ রাজাদিগের অধিকার সময় নির্ব্বাচন করিতে হয়। ইতিহাস পাঠে জানাযায় যে মুসলমান রাজগণ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল উৎপন্ন শস্যের অংশের গড় পড়তা ধরিয়া করাবধারণ করতঃ ভূম্যধিকারীগণকে বিলী করিয়াদিতেন; ও তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কর আদায় করিয়া লইতেন। ভূম্যধিকারীগণ কারাদায়ে অশক্ত হইলে বা দুষ্টামি করিলে সরকার হইতে ক্রোধ সাঁজোয়াল নিযুক্ত করিয়া আদায়ের চেষ্টা হইত। ইংরেজাধিকারের প্রথমাবস্থাতেও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের শাসন কালে ঐ নির্দ্দিষ্ট করে জমিদারী সকল চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; এবং অদ্যাবধি তদনুসারে করাদায় হইয়া আসিতেছে। জমিদার, তালুকদার, মকররীদার প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ হইতে কর্ষণকারী কৃষক পর্য্যন্ত এক্ষণে বহুবিধ স্বত্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও অঙ্কুর মুসলমানদিগের আমলে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থের অনেক স্থানে এইরূপ ভূম্যধিকারীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে এস্থানে যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করাযাইতেছে, তাহা হইতেই পাঠক মহাশয় তৎকালের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার আভাস পাইতে পারিবেন।

চৈতন্যের সময়ে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস নামে দুই সহোদর সপ্তগ্রাম জমিদারীর ভূম্যধিকারী ছিলেন। এই জমিদারীর বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা ছিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন অতিশয় বদান্য, সদাচার নিষ্ঠ ধার্ম্মিক এবং ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে নবদ্বীপে এমন ব্রাহ্মণ ছিল না, যাঁহারা তাঁহাদের ব্রহ্মত্তর খাইতেন না বা অর্থে প্রতিপালিত হইতেন না। চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইঁহাদিগকে উত্তমরূপ জানিতেন। উভয় ভ্রাতা তাঁহাদের সেবায় বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। কালক্রমে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য অনেক টাকার

জন্য বাকীদার হইলে একজন মুসলমান্ চৌধুরী হিরণ্যদাসের জমিদারী ডাকিয়া লইল। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় দখল ছাড়িয়া না দেওয়ায় সে ব্যক্তিও রাজ-সরকারে বার লক্ষ টাকার দায়ীক হইল। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া রাজসরকারে দরখাস্ত করিয়া উজীরকে সরেজমিনে আনাইল। ভ্রাতৃদ্বয় এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পলায়ন করিলেন। উজীর আর কাহাকেও না পাইয়া গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাসকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই রঘুনাথ দাস পরবর্ত্তী সময়ে সমস্ত বিষয় সংসার পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেব মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করার পর বৃন্দাবনে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন ভগবানের আরাধনায় যাপন করিয়াছিলেন। যাহাহউক রঘুনাথ কারাবদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছচৌধুরীকে পিতৃসম্বোধন করতঃ এরূপভাবে বিনয় করিলেন যে যবন ভূম্যধিকারী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথের কারামোচন করাইয়া দিলেন; এবং তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত আপোষে মীমাংসা করতঃ সমস্ত দেনাপাওয়ানার হিসাব পরিষ্কার করিতে পারিলেন।

"রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল;
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল।" চৈতন্য চরিত।

যবন কুল তিলক ভক্ত হরিদাসের জন্মস্থান বূঢ়ন গ্রাম। অল্প বয়সে হরিদাস গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন বেণাঝোপের মধ্যে বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট করতঃ হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখান একজন দুর্দ্ধর্ষ ও বৈষ্ণবদ্বেষী লোক ছিল। লোকে হরিদাসকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত; তাহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। সে জন্য সে হরি-দাসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া রাত্রি যোগে একজন বারাঙ্গনা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। ইহাতে ভক্তের তপস্যা ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক সেই বেশ্যা সাধু ভক্তের ভক্তিভাব ও নিষ্ঠা দেখিয়া কুমতি পরিত্যাগ করতঃ নবজীবন লাভ করিল। স্থানান্তরে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইবে; এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই অধার্ম্মিক ও উপ-দ্রবকারী দেশাধ্যক্ষ শীঘ্রই স্বীয় অনুষ্ঠিত পাপের ফল ভোগ করিল। আর এক সময়ে বহুসংখ্য লোক সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দপ্রভু হরিনাম কীর্ত্তনের জন্য ইহার বাটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক এই পাষণ্ড তাঁহাদিগকে কুবাক্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল এবং

বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাহার যে আন্তরিক ঘৃণা ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য নিত্যানন্দ তাহার চণ্ডীমণ্ডপের যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের ও আঙ্গিনার মৃত্তিকা খনন করিয়া ফেলাইয়া দিল ও ঐ স্থান গোময় দ্বারা লেপাইল।

"তবে রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল;
গোঁসাই যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল।
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গন।" চৈতন্য চরিত।

এই রামচন্দ্র খান সুবিধা পাইলেই দস্যুবৃত্তি করিতে ছাড়িত না এবং জমিদারীর দেয় রাজস্ব আদায়ে পরাঙ্মুখ ছিল। ইহাতে রাজাজ্ঞায় উজীর আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাহার বহির্বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বাসা করিয়া থাকিল; এবং ভক্তসমাবেশ হইয়াছে বলিয়া যেস্থানের মাটী ইত্যগ্রে সে খনন করিয়া ফেলাইয়াছিল, সেই স্থানে অবধ্যবধ ও গোমাংসাদি রন্ধন করিতে লাগিল। পরে সপরিবারে রামচন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গ্রাম উজাড় করিয়া দিল। এইরূপে সাধুর অপমানের জন্য সমস্ত গ্রাম দণ্ডনীয় হইল। রামচন্দ্র খানের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রোধ হয়ে ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর;
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল;
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিল।
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া;
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।
মহন্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ উজাড়য়।" চৈতন্য চরিত।

এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুসভ্য ইংরাজাধিকারে বাস করিয়াও যখন ভূম্যধিকারীগণের নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রবের কথা নিতান্ত অবিরল দেখা যায় না, তখন যে রামচন্দ্র খানের ন্যায় অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ প্রকারে সমাজকে দূষিত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তখন মুসলমানের আমল-

দায়ী ; সে সময়ে তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ড হইয়াছিল, একালে সেরূপ দণ্ড দিবার নিয়ম নাই। স্ত্রী পুত্র সহিত বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া ও ঘরবাড়ী লুট-পাট করিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে এক্ষণে রাজকীয় দণ্ডবিধি ও শাসনবিধি অনু-সারে কার্য্য হইয়া থাকে।

তখনকার সময়ে নাম মাত্র মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা-শাস্ত্র দেশের রাজকীয় আইন রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু কার্য্যেতে তাহার কিছুই হইত না। এক্ষণে যেমন দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী প্রভৃতি বিভাগ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে কার্য্য শৃঙ্খলা সংগঠিত হই-য়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। রাজধানীতে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কিন্তু রাজার সানুকূল আদেশ লাভ তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে উৎকোচের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। প্রিয়মন্ত্রী বা অনুচর যেরূপ বুঝাইয়া দিতেন রাজা তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। রাজা ব্যতীত রাজধানীতে এক জন কাজী ও একজন সহর কোতয়াল থাকিতেন। তাঁহারা সামান্য সামান্য অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। রাজধানী ব্যতীত প্রধান প্রধান নগরেও এক এক জন কাজী থাকিত। এই সব কাজীগণের ক্ষমতা অদ্বিতীয় ছিল। তাঁহারা দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই শাসন কর্ত্তা ছিলেন; এবং আপনাদের ইচ্ছানুসারে দণ্ড পুরস্কার দিতে পারিতেন। চৈতন্যের সময়ে এইরূপ একজন কাজী নবদ্বীপে নিযুক্ত ছিলেন।

চৈতন্যচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে ভক্তিপথাবলম্বী যে সকল বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গাদাসপণ্ডিত নামে একজন ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ তিনি এক সময়ে যবনের কোপে পড়িয়াছিলেন। যবন প্রতিনিধি কাজী এই আদেশ দিয়াছিলেন যে রাত্রি প্রভাতে সপরিবারে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ও তাঁহার বাটীঘর কাটিয়া গঙ্গাজলে ফেলা-ইয়া দিতে হইবে। গঙ্গাদাস কোন বিশ্বস্তসূত্রে এই বিপদপূর্ণ সংবাদ জানিতে পারিয়া সেই গভীর রজনীযোগে সপরিবারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং কোন মতে গঙ্গাতীরে আসিয়া পারে যাইবার সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে তত রাত্রে খেয়াঘাটে নৌকা পাওয়া গেল না; এবং চারিদিক অন্বেষণ করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া গঙ্গাদাস অতিশয় কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার

সাক্ষাতে যবন তাঁহার পরিবারবর্গকে স্পর্শ করিবে এই ভাবনায় আকুল হইয়া অবশেষে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নয়নগোচর হইল যে এক জন নাবিক একখানি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া মধ্য গঙ্গা দিয়া বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি তাহাকে আহ্বান করতঃ একটী টাকা ও এক জোড়া বস্ত্র দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন যে স্বয়ং ভগবান্ খেয়ারীর রূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাদাসের পরিত্রাতা হইয়াছিলেন। কাজীদিগের এরূপ দৌরাত্ম্যের কথা তৎকালে বিরল ছিল না। যখন চৈতন্যের আদেশে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গকরতালের ধ্বনির সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গেল, তখন যবন ও অন্যান্য নাগরিক লোক কাজীর নিকট ঐ কথা জানাইলে কাজী স্বয়ং গৃহে গৃহে যাইয়া খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিলেন ও নাম সংকীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া সর্ব্ব সাধারণকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

"শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন;
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল;
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল:—
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি;
এবে উদ্যম চালাও সবে কার বল জানি?
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে;
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।" চৈঃ চঃ।

এই সম্বাদ চৈতন্যের কর্ণ গোচর হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত করিয়া এক মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র লোক মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, কাঁশর ইত্যাদি লইয়া তাঁহার দলে যোগ দিল; এবং সহস্র সহস্র মশালের আলোকে নগর দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। চৈতন্যের প্রকাশ্য সংকীর্ত্তনের এই আরম্ভ। সে রাত্রির সংকীর্ত্তনের প্রতাপে কাজী লুকায়িত হইতে বাধ্য হইয়া পলায়ন পর হইলেন। তৎপরে যখন তিনি চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও ঈশ্বর প্রেমের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি রূপে তাঁহাকে অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার বিদ্বেষ ভাব কোথায় চলিয়া গেল? তদবধি তিনি

একজন বিশ্বাসী ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন ; এবং নানা প্রকারে চৈতন্য-দেবের সংকীর্ত্তন বিলাসের সুবিধা করিয়া দিলেন।

বঙ্গে মুসলমানাধিকারের কিছু কম তিনশত বৎসর পরে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েন। এই দীর্ঘকাল জেতা ও জিতগণ এক দেশে বাস ও এক ভাষায় কথোপকথন করা ও পরস্পর সংযুক্ত থাকা হেতু পরস্পরের মধ্যে এক প্রকার সৌহৃদ্য ভাব জন্মিয়াছিল। উভয় জাতীয় লোকের মধ্যে সম্পর্ক পাতাইয়া পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত, ইহাতেই সে ভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। নবদ্বীপের চাঁদ কাজী চৈতন্যকে ভাগিনের বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই।

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা ;
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা ;
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ;
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।" চৈতন্য চরিতামৃত।

নদীয়া জেলার জজ কি মেজেষ্টর সাহেবের পক্ষে নবদ্বীপ নগরবাসী সামান্য একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত এইরূপে কথোপকথন করা সামান্য মহত্বের পরিচায়ক নহে। এক্ষণে কি আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? অসভ্য মুসলমানগণের অধিকার সময়ে নানা প্রকারে প্রজাগণের উপর অত্যাচার হইত সত্য ; কিন্তু তথাচ বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট যে সকল অধিকার পাইয়াছিল, সুসভ্য ইংরাজ গণের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে কি না জানি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক অবস্থা।

চৈতন্যের সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ের আচার আচরণ হইতে যে অনেক পরিমাণে ভিন্ন ছিল তাহা বলা নিষ্প্র-য়োজন. প্রথমতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর জাতীয়ভাব ও রুচি যে এক্ষণে

ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি সে সময়ের যদি কোন অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ পুনর্জীবিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, তবে তাঁহার অধস্তনবংশীয়কে দেখিলে তাঁহার বংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। কোথায় এক্ষণকার সার্ট, কোট, মোজা, পেণ্টুলেন, বিলাতি জুতা চশমাধারী ছোট বড় কর্ত্তিতকেশ ইয়ং বেঙ্গল, আর কোথায় তখনকার থরকাটা শূন্তপদ, শূন্যগাত্র, জানূর্দ্ধ পরিধেয়ী বঙ্গীয় যুবা! কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদাদি যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সহর বাজারে এক্ষণে মেয়েদের জুতা, মোজা ও বডী পরিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এক্ষণেও সেকালকার ভাব অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে গহনা সম্বন্ধে এক্ষণে সেকালের ন্যায় রুচি নাই। যাহা হউক এক বিষয়ে কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মহিলার পরিচ্ছদ এক্ষণ হইতে অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না যে তখনকার সম্ভ্রান্তভদ্রমহিলাগণ কেবল সাটীকে ভদ্রোচিত পোষাক মনে করিতেন না; সাটীর উপরে তাঁহারা ওড়নার ন্যায় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঐ বস্ত্রকে তখন ভুনি দোগজা বলিত। চৈতন্যের জন্ম হইলে অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবী কি রূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শিশুকে দেখিতে যাইতেছেন দেখুন।

"অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগত বন্দিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে, চলে উপহার লয়ে,
দেখিতে বালক শিরোমণি!
সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজতের পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কন;
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হার গণ।
ব্যাঘ্র নখ হেম জড়ি, কটি পট্টে সূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ;
চিত্র বর্ণের পট্টসাড়ী, ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন।

দূর্ব্বা ধান্য গোরচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া ;
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লয়ে দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কারে পেটরা ভরিয়া।
ভক্ষ্য যোগ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচী গৃহে হইল উপনীত।” চৈঃ চঃ।

আহারাদি ও খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে যে সেকালে ও একালে বিশেষ কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তখন ও ডাল, ভাত, তরকারী, শাক সবজী, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মৎস্য প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল ; এক্ষণেও তাহাই আছে। তবে এখন যে কালিয়া পোলাও খাওয়ার রীতি কোন কোন শিক্ষিত দলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। এতদ্ভিন্ন শাক্ত ও বামাচারীগণ ছাগমাংস আহার করিতেন। দধি ও ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধের সহিত চিপীটক ও রম্ভা চিনি সংযোগে ফলাহারের ঘটাটাও বিলক্ষণ ছিল। পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ যে চিড়া মহোৎসব দেন, তাহাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণকার মত নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদিও তখন প্রস্তুত হইত ; কিন্তু সর্ব্বত্রই রন্ধনের ভার স্ত্রীলোকগণের উপর অর্পিত থাকিত। আচার্য্য পত্নী সীতাদেবী চৈতন্যের নিকট কিরূপ দক্ষতার সহিত পাক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন, একবার দেখা যাউক।

“মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ ;
চারি দিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মুদ্গ সূপ।
বাস্তুক শাক পাক করি বিবিধ প্রকার ;
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মান কচু আর।
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া আর মূল ফলে ;
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্তঝালে।
কোমল নিম্ব পত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী ;
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর ;
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।

মধুরাম্ল বড়অম্ল অম্ল পাঁচ ছয়;
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
মুদ্গ বড়া মাস বড়া কলা বড়া মিষ্ট;
ক্ষীর পুলি, নারিকেল পুলি, যত পিটা ইষ্ট।
সঘৃত পায়স মৃৎ কুণ্ডিকা ভরিয়া;
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া।
দুগ্ধ চিতাউ, দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডি ভরি;
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।" চৈঃ চঃ।

লুচি কচুরির প্রথা বোধ হয় বড় একটা চলিত ছিল না। কারণ ঐরূপ খাদ্যের বর্ণনা কি চৈতন্য চরিতামৃত, কি চৈতন্য ভাগবত, কি অন্য কোন গ্রন্থে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রচলিত ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ভদ্র সকল লোকই ভূত, প্রেত উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত; এবং সাপের মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রের বলবীর্য্য দৃঢ়রূপে মানিত।

"কেহ রক্ষা বাঁধে, কেহ পড়ে স্তুতিবাণী।
কেহ বিষ্ণু পাদোদক অঙ্গে দেয় আনি।" চৈতন্য ভাগবত।
"ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই।" চৈতন্য চরিতামৃত।

আমোদ প্রমোদের মধ্যে মঙ্গল চণ্ডী, হরির গীতাদি শ্রবণ, ঢোল ঢক্কাদির বাদ্য শ্রবণ, কুস্তি মালামো করা প্রধান ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের প্রথা এক্ষণেও যেরূপ, তখনও সেইরূপ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্নপ্রাশন, উপবীত ধারণ ও বিবাহের যে বর্ণনা আছে, তাহা এক্ষণকার ব্রাহ্মণ বালকের তত্তদনুষ্ঠানের সহিত কোন অংশে বিভিন্ন বোধ হয় না। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের কোন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল না।

শিক্ষা সম্বন্ধে তখনকার তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন সাধারণ লোকের কোন শিক্ষা হইত না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসা করিতেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরে ভালরূপ সংস্কৃত শিখিতেন না। সাধারণ ভদ্রলোক আপন আপন বালকদিগকে প্রথমে পাঠশালায় ও পরে মৌলবীর নিকট পার্শী শিক্ষা দিতেন। তখন বাঙ্গলা ভাষায় কোন পুস্তকাদি ছিল না। ঐ রূপ পুস্তকাদি রচনা করা

চৈতন্যের সময়েই প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সুতরাং তখনকার লোক কেহই মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত হইতে পারিতেন না। চলিত কথা বার্ত্তা ও পত্রাদি লেখা বাঙ্গলাতে হইত বটে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। এক্ষণকার মত তখনও বিদ্যারম্ভের দিন হাতে খড়ি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল; এবং ফলা বনানাদি বঙ্গ ভাষার মূল শিক্ষাও দেওয়া হইত।

"শুভ দিনে শুভক্ষণে মিশ্র সুন্দর;
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর।
দিন দুই তিনে শিখিলেন বার ফলা;
নিরন্তর লেখেন কৃষ্ণের নাম মালা।" চৈতন্য চরিতামৃত।

যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্ম শাস্ত্র, কেহ দর্শন শাস্ত্র, কেহ বেদ বেদান্তাদি আপন আপন রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষা করিতেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রথা তখন আদৌ চলিত ছিল না। চৈতন্যের সময়েই যে স্ত্রী শিক্ষার দ্বার প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা একরূপ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্র ও স্ত্রীদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন চৈতন্যদেব ঐ প্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া আচণ্ডাল সকলেই হরিনামের অধিকারী, এই উদার মত প্রচার করিলেন, সেই দিন হইতেই বঙ্গীয় মহিলা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে অধিকার লাভ করিলেন। এবং শিখি মাইতির ভগিনী ও করমাবাই প্রভৃতি অনেক অনেক ভদ্র মহিলা উত্তর কালে বিদ্যাবতী রমণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আমলদারীর কাল হইতে এদেশে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। চৈতন্য দেবের সময়েও বঙ্গীয় মহিলাগণ অবরোধে অবরুদ্ধা ছিল। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে অদ্বৈত পত্নী "বস্ত্র-গুপ্ত-দোলা" আরোহণে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তখনকার কুলকামিনীগণ কিরূপে কালযাপন করিতেন ও তাঁহাদের পতিভক্তি ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি কিরূপ ছিল তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত আদর্শ চিত্র পাঠে বুঝা যাইতে পারিবে:—

"একেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী করেন রন্ধন;
তথাপিও পরম আনন্দ যুক্ত মন।
উষাকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম;
আপনে করেন সব এই তাঁর ধর্ম্ম।

দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিকমণ্ডলী ;
শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল ;
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল।
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন ;
ততোধিক শচীর সেবনে তাঁর মন।
কোন দিন লই লক্ষ্মী পতির চরণ ;
বসিয়া থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ।" চৈতন্য ভাগবত।

স্বভাব চরিত্রের বিষয় দেখিতে গেলে বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ হইতে আমরা এই নির্ব্বাচন করিতে পারি যে, তখনকার লোক অধিক সরল প্রকৃতি, সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু ছিল। এক্ষণে যেমন কপটতা, কলহপ্রিয়তা ও বঞ্চনার ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ততদূর ছিল না। প্রায় সকল লোকই আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত এবং শান্তভাবাবলম্বনে, কাল যাপন করিতে ভালবাসিত। বিলাস পরায়ণতা তখন বঙ্গসমাজকে এখনকার ন্যায় কলুষিত করে নাই। যাঁহারা ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা যে একবারেই বিলাসী ছিলেন না এরূপ নহে ; তবে তখনকার বিলাসে আর এখনকার বিলাসে প্রকৃতিগত অনেক বিভিন্নতা আছে। আর এক্ষণে যেমন সমাজ শুদ্ধ সকলেই বিলাসী, তখন সেরূপ ছিল না। তখনকার বিলাসিতার চিত্র দেখিলেই, পাঠক ইহার মীমাংসা আপনা আপনি করিতে পারিবেন।

'দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিতলে শোভা করে ;
দিব্য তিন চন্দ্রাতপ তাহার উপরে।
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে ;
পট্টনেতে বালিস শোভয়ে চারিপাশে।
বড় ঝাড়ি ছোটঝাড়ি গুটি পাঁচ সাতে ;
দিব্য পিতলের বাটা ; পাকা পান তাতে।
দিব্য আলবাটী দুই শোভে দুই পাশে।
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে ;
বাতাস করিতে আছে দেখে সর্ব্বক্ষণে।
কি কহিব সেবা কেশভারের সংস্কার ;
দিব্য গন্ধ আমলকি বহি নাই আর।

সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা;
বিষয়ীর প্রায় যেন সকল শোভনা।" চৈতন্য ভাগবত।

ইহা অতি উচ্চবংশীয় ধনীর আসবাব। সুতরাং সাধারণ লোকের লওয়াজিমা কিরূপ ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

হিন্দু জাতি স্বভাবতঃই অতিথি প্রিয়। এখন হইতে সেকালের লোক অধিক পরিমাণে আতিথ্য করিত। চৈতন্যের সময়ে অতিথি সৎকার গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য করণীয় ছিল; না করিলে মহা প্রত্যবায় হইত। বৈষ্ণব দিগের মধ্যেও এই ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; তখনকার অতিথি সেবার এই মূল মন্ত্র ছিল :—

"অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি;
তাহা করিলেই বলি অতিথিরে ভক্তি।" চৈতন্য ভাগবত।

পক্ষান্তরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরি, ব্যভিচার সমাজ মধ্যে বহু পরিমাণে সংঘটিত হইত, সন্দেহ নাই। তাহা না থাকিলে আর জগাই মাধাই, চাঁপাল গোপালের উপাখ্যান বিবৃত হইবে কেন? তবে তখন এই সকল পাপাচারীর প্রতি সামাজিক দণ্ড প্রয়োগ করা হইত এবং শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্তাদি করিলেই, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। এক্ষণে সমাজবন্ধন ও ধর্ম্মবন্ধন কিছু শিথিল হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ; তাহা ছাড়া সেকাল ও একালে এরূপ পাপ সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না।

যে সকল ভীষণ পাপের স্রোত বঙ্গসমাজের অন্তস্তরে স্তরে এক্ষণেও প্রবাহিত হইতেছে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও সেই রূপ হইতেছিল। কেবল চৈতন্য হৃদয়ের প্রবলতর প্রেমভক্তির তরঙ্গে কিছু কালের জন্য ঐ সকল দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা কতক পরিমাণে বিধৌত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু অচির কাল মধ্যেই তাঁহার ধর্ম্ম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া মলিন ও কলঙ্কিত হইল; তখন ঐ সকল পাপরাশি পুনরায় এই দুর্ভাগ্য সমাজকে পঙ্কপালের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পুনরায় যুগ ধর্ম্মের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ব্যতীত তাহা নির্ম্মূলিত হইবার নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের অবতার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার ও পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে সাধু ভক্ত ভিন্ন ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনই গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য চৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে এ পর্য্যন্ত দেশ মধ্যে এই বিষয়টী লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকের মনের কুসংস্কার ও জড়তা দূর হইতেছে ; শিক্ষিত সম্প্রদায় চৈতন্যাবতার কেন, অবতারবাদের মূল সূত্রেই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না ; সুতরাং এই আন্দোলনে তাঁহাদের কোনই সহানুভূতি নাই। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন ; তাঁহারা ইহাতে অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া আসিতেছেন।

চৈতন্যের দেহত্যাগ হইতে এপর্য্যন্ত চারিশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যেও এই তর্কাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও প্রাচীনদিগের মধ্যে এই বিবাদ অনেক পরিমাণে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই বিবাদের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এক দিকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিতে গিয়া গোঁড়ামীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ; অপরদিকে শাক্তগণ তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও তিরস্কার করিতে ক্রটি করেন নাই। এক্ষণে শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ দেশ মধ্যে একটী সাধারণ প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এতই বিদ্বেষ ভাব প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল যে, উভয়ে উভয়ের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি মনে করিতেন। শাক্তের ব্যবহৃত পূজা সামগ্রী ব্যবহার করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না। বিল্বপত্র ও জবার ফুল শাক্তের আদরের জিনিষ ; সুতরাং বৈষ্ণব তাহাদিগকে বিদ্বেষভাবে তেফাড়কার পাতা ও ওড়ফুল বলিয়া থাকেন। আবার নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় বলিয়া, ও বৈষ্ণবগণ মাংসাদি আহার করেন না বলিয়া

শাক্তগণ সে সকল লইয়া কতই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে দেশমধ্যে এতই রহস্য জনক গল্প প্রচলিত আছে যে, তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে গেলে, এক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ইহার উপরে আবার কবিগণ শাক্ত বৈষ্ণবের কাহিনী সকল কাব্যাকারে প্রকাশ করতঃ সাধারণের কৌতুক বর্দ্ধন ও স্ব স্ব মত প্রতিপন্ন করিতে ছাড়িতেন না। ভক্তবর রাম প্রসাদ সেন ও অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর বিবাদ ও উত্তর প্রতিউত্তর বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই আপামর সাধারণ সকলেই বিদিত আছেন। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই বিবাদ এতই প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং সমাজে শান্তি স্থাপনের জন্য তাহার মীমাংসা করা এতই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রবাদ আছে এক সময়ে ইহার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে করলিপি করাইতে হইয়াছিল। করলিপি বা হস্তলিপির অভ্রান্ততায় প্রায় তখনকার সকল লোকেরই বিশ্বাস ছিল। সংক্ষেপে তাহার প্রক্রিয়া এই:—কোন গুণী ব্যক্তি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, এবং তাহার নিকটে বসিয়া একটী অশিক্ষিত বালক ভূমিতে হস্ত সঞ্চালন করিবে। ঐ বালকের হস্ত দিয়া যে লেখা বাহির হইবে, তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়ের সৎ মীমাংসা মনে করিয়া লইতে হইবে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কি প্রকারে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কিছুই জানি না। তবে ঐ লিপিতে যে উত্তর পাওয়া গিয়াছিল তাহা অতীব কৌতুক জনক। নবদ্বীপের রাজবংশ চিরকালই প্রসিদ্ধ বামাচারী শাক্ত; সুতরাং তাঁহারা গৌরাঙ্গ দেবকে কোন প্রকারেই ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হস্তলিপিতে যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহাতে তাঁহাদের মতই দৃঢ়ীভূত হইল। সে উত্তর এই :—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো ন চাংশকঃ।"

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণও নহেন ও অংশাবতারও নহেন। যখন করলিপিতে এই উত্তর উত্থিত হইল, তখন শাক্তগণের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তাঁহারা নানা প্রকারে বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করিয়া এই মত সর্ব্বত্র ঘোষিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বাধা জন্মিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশোদ্ভব জনৈক শাস্ত্রবিশারদ গোস্বামী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের

সভায় আসিয়া এই জানাইলেন যে, করলিপিতে যে উত্তর পাওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা চৈতন্যের অংশত্ব ও ভক্তত্ব দূরীভূত হইয়া তাঁহার পূর্ণত্বই স্থাপিত হইতেছে। এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের এই ব্যাখ্যা করিলেন যে, "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন, অংশকো ন, সএব পূর্ণ ইতি।" এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। এদিকে শাক্তগণেরও মস্তক অবনত হইল, এবং বৈষ্ণবেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সকল বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চৈতন্যের প্রকৃত মহিমা দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল; এবং বাঙ্গালী জাতির প্রধান গৌরব পাত্র অবশেষে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে নীচ ও অন্ত্যজ শ্রেণী লোকের উপাস্য হইয়া থাকিলেন; ভদ্র সমাজে আর তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান থাকিল না। ইহার জন্য তাঁহার শত্রু পক্ষ অপেক্ষা তাঁহার মতাবলম্বীদিগেরই দোষ অধিক। তাঁহারা যদি গোঁড়ামী ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও শান্তভাবে তাঁহার প্রণোদিত মত সকল প্রচারে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অভিনেতাকে আজ আর এ তিরস্কার ও নিন্দাভার বহন করিতে হইত না। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া লোকে গ্রহণ না করুক, একজন অসাধারণ সাধুভক্ত বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে কোন সম্প্রদায়ই পশ্চাৎপদ হইত না।

অবতারবাদের মত সকল হিন্দুজাতির অস্থিমাংসের সহিত জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে; এমন হিন্দু নাই, যিনি পরমেশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করেন না। নিরাকার ও নির্গুণ ঈশ্বরকে মানুষ জানিতে পারে না ও তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না; তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, প্রভৃতি মত হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে নিঃশঙ্ক ভাবে রাজত্ব করিতেছে। আজকাল এই মতের বিরুদ্ধে কথন কথন কথা শুনা যাইতেছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বকালে কাহার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করে? সুতরাং চৈতন্যাবতার সংস্থাপন জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতে হয় নাই। অবতারবাদের দুর্গ তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাঁহারা কেবল তাহার মধ্যে চৈতন্যকে প্রবেশ করাইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহাদের মতে অন্য অন্য সকল

অবতারই ঈশ্বরের অংশাবতার, কেবল কৃষ্ণই স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সেই কৃষ্ণই আবার গৌরাঙ্গ হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন। সুতরাং গৌরাঙ্গের পূর্ণত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণেরও পূর্ণত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, তখন কৃষ্ণের পূর্ণাবতার সম্বন্ধে লোকের মনের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ ব্যতীত কোন প্রাচীন শাস্ত্রে কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করা হয় নাই। বিষ্ণু পুরাণের তো কথাই নাই; মহাভারতেও তিনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও যোগবিদ্যা পরায়ণ আদর্শ চরিত্র বৈ আর কিছুই নহেন। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতেরও স্থানে স্থানে তাঁহাকে ভগবান্ হরির অংশাবতার বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। যথা:—

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায়চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ।" ভা। ৪ স্ক।

"ভগবান্ হরির সেই অংশ ভূভার হরণ নিমিত্ত সম্প্রতি এই দুই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহার মধ্যে একজন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, অন্য জন কুরুপ্রবীর অর্জ্জুন।"

ইহার উপর আবার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমগ্র হিন্দুসমাজে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হয় নাই। প্রাচীনকালের কথা থাকুক, সে দিন আমাদের চক্ষুর সমক্ষে মুরসিদাবাদের খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ যে ব্যাস প্রণীত নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহুবিধ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গভীরতর বিচার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রথমে কৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপন জন্য চেষ্টা করিয়া, তৎপরে চৈতন্যের পূর্ণাবতারত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। জীব গোস্বামী প্রণীত কৃষ্ণসন্দর্ভগ্রন্থে ও চৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বিচারের অবতারণা হইয়াছে। যদি কখন অবকাশ হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনে পড়িয়া অবতারবাদ মতের মূলে যে সত্যটুকু নিহিত রহিয়াছে, তাহাও লোপ পাইতে চলিয়াছে। সে জন্য আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমে অবতারবাদের মূল সূত্র কি? কোন্

সত্যকে অবলম্বন করিয়া তাহার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? এবং তাহার কোন্ অংশই বা ভ্রম প্রমাদের সহিত জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে? তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত আপনা হইতে হইয়া উঠিবে। সৃষ্ট বস্তুতে পরমেশ্বরের অবতারত্ব আরোপ করার মত, সকল দেশে ও সকল সময়ে একই উপাদান লইয়া সংগঠিত হইয়াছে। যে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টীয়ান্‌গণ ঈশার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, হিন্দুগণের কৃষ্ণাদির অবতারত্বও ঠিক সেই সংস্কারমূলক। সুতরাং তাহার মূলান্বেষণ করিতে পারিলে, চৈতন্যের কেন, সকল অবতারেরই ভাব আপনা হইতেই বুঝা যাইতে পারিবে।

বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত স্বরূপ মানব জ্ঞানের অতীত। তবে বিশ্ব সৃষ্টিতে তিনি যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছেন, মানুষ কেবল তাহাই বুঝিতে পারে। এই সৃষ্টি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; জীব সৃষ্টি ও ভূত সৃষ্টি। জড় জগতেও তিনি যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, জীবগণের জীবনেও তিনি তদ্রূপ লীলা বিহার করিতেছেন। বিশ্বাসীব্যক্তি যখন তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, চারি দিক অবলোকন করিতে থাকেন, তখন তিনি কি জড় জগতে, কি মানব জাতির জীবনে, এবং কি নিজ আত্মায়, তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। তখন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া, চতুর্দ্দিকেই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ভক্ত তখন সৃষ্টি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলই তন্ময় দেখিতে থাকেন। তখনই পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ রূপে অবতীর্ণ হয়েন। 'অব' পূর্ব্বক 'তৃ' ধাতুর অর্থ অবতরণ করা অর্থাৎ উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন করা। ঈশ্বর পদার্থ মহোচ্চ ও স্বর্গের জিনিষ, তিনি যখন ভক্তহৃদয়ে অবতরণ করেন বা প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহার অবতার হইয়া থাকে। এই ভাবে বিশ্বাসী ভক্তের নিকট চরাচর বিশ্বরাজ্য সমস্তই তাঁহার অবতার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথারই পোষকতা পাওয়া যাইতেছে। নানাবিধ অবতারের কথা বলিয়া ভাগবতকার বলিতেছেন;—

'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধে র্দ্বিজাঃ
যথা বিদাশিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।' ভা। ১স্ক। ৩অ। ২৬শ্লোক।

'হে দ্বিজগণ! সত্ত্ব নিধি হরির অবতার অসংখ্য; যেমন উপক্ষয় শূন্য

জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হইতে অসংখ্য অবতার হইয়াছে।'

এই সকল অবতীর্ণ পদার্থের মধ্যে কাহাতেও ঈশ্বরের প্রকাশ অধিক, কাহাতে ও বা তদপেক্ষা ন্যূন লক্ষিত হইয়া থাকে। একটি সামান্য মানব-জীবনে তাঁহার যে প্রকাশ বা লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, সাধু জীবনে তদপেক্ষা অনেক অধিক মাত্রায় উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেতেই যে তাঁহার গুণাংশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই :—

'যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ সম্ভবম্॥' গীতা। ১০ অ। ৪১।

যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য যুক্ত, তেজোযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার তেজোংশ সম্ভূত বলিয়া জান।

'এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীর্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ।'

ভা। ১স্ক। ৩অ। ৫শ্লোক।

ভগবানের অবিনাশী বিরাটরূপ, সকল অবতারের বীজ স্বরূপ ও সকলের আশ্রয় স্থান। ইহারই অংশ হইতে দেবজাতি, তীর্য্যক্ জাতি ও নরজাতি, সকলই সৃষ্ট হইয়াছে।

আর্য্যদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের আমূল আলোচনা করিতে পারিলে এ বিষয়ের অতি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতে উপনিষদ্‌যুগের শেষ পর্য্যন্ত আমরা আর্য্যদিগের মধ্যে কোন অবতারের কথা শুনিতে পাই না; কারণ এই সময় তত ঈশ্বর সম্ভোগের কাল নহে, যত ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ের কাল। তখন আর্য্য ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কারে যত্নশীল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার গুণ ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার অবসর পাইয়া উঠেন নাই। যখন ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণীত হইল, তখনই আর্য্যহৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়া উঠিল; এবং ভক্তিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল। এই যুগেই আমরা নানাবিধ অবতারের কথা শুনিতে পাই। অবতারবাদ-সমর্থনকারীগণ অবতারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে একটী এই যে, মানব জাতির মধ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য পরমেশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহা যদি

সত্য হইত, তবে আর্য্যজাতির আদিম সময়ে, যখন ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় নাই, তখনই অনেক অবতারের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রথম কালে কোন অবতারের কথাই ত শুনা যায় না। সে যাহা হউক যখন ভক্তির প্রবল তরঙ্গ ভারতভূমিতে বহিয়া চলিতে লাগিল, তখনই মৎস্য কূর্ম্মাদি ইতর জন্তুতে, নদীপর্ব্বতাদি জড় জগতে, এবং রামকৃষ্ণাদি মানবে অসংখ্য অবতার সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটি সংখ্যা পরিপূর্ণ হইয়া বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়া গেল। সে দিন মহানগরীর কোন পল্লীতে শীতলা পূজা হইয়াছিল। দ্বিভুজা জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায় শীতলার প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহের পরিবর্ত্তে একটী গর্দ্দভকে তাহার বাহন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শীতলার ধ্যান ও মূর্ত্তি কোন্ শাস্ত্রে আছে জানি না; কিন্তু এটী যে মানব মনের ভয় যুক্ত ভক্তির ভাব হইতে সম্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেরূপ সৃষ্ট বস্তুতে ভগবানের প্রকাশ ও বিলাসই তাঁহার অবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই রূপ আবার তাঁহার গুণের রূঢ়ভাবও (abstract quality) অবতারের আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হইল। জ্ঞান-পিপাসু ভক্ত, জ্ঞানপথে বিচরণ করিতে করিতে জ্ঞানরত্নাকর মধ্যে যতই নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, সৌন্দর্য্য মুগ্ধ প্রেমিক ভক্ত, সৃষ্টি রাজ্যের সৌন্দর্য্য ও শোভা যতই সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, ততই তিনি তাঁহাকে স্বরস্বতী ও লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল দেবতাগণের ধ্যান ও মূর্ত্তি, সাধকের মনের প্রত্যক্ষীভূত ভাব বাহিরে কথায় ও প্রতিমায় প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যে জীবন্ত ভাব অনুভূত হইয়া এই সকল ধ্যান ও মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে? এক্ষণে কেবল তাহার মৃত কঙ্কালমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাই-তেছে যে, মনুষ্য বিশ্বাস ও ভক্তি যোগে পরমেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব যে যে বস্তুতে, পদার্থে বা মনুষ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে সেই সেই বস্তু, পদার্থ ও মনুষ্যকে অবতার বোধে উপাসনা করিয়াছে। যদি তাহা না করিয়া, সেই সেই বস্তুতে ভগবানের যে গুণের বা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা-কেই পূজা করিত, এবং সেই সেই গুণ বা ভাব যে আধারকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ গুণ বা ভাব হইতে পৃথক্ রাখিতে

পারিত, তাহা হইলে অবতারবাদ মতের মধ্যে কোনই দোষ বা ভ্রম পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীমদীশার মধ্য দিয়া ভগবানের যে যে প্রেমভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, মানুষ যদি চৈতন্য ও ঈশার জীবত্ব হইতে ঐ সকল স্বর্গীয় ভাবকে পৃথক বলিয়া, সেই সেই ভাবকে পূজা করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর নরপূজা স্থান পাইত না। কিন্তু মানুষ দুর্ব্বল, সে সাধু জীবনের জীবত্বের সহিত তন্মধ্যস্থ ঈশ্বরত্ব এবং জড়ের জড়ত্বের সহিত তদুপহিত ভগবত্তা মিশাইয়া ফেলিয়াই মহাভ্রমে পড়িয়া গিয়াছে। জীবের মধ্যে দেবতা দেখাই অবতারবাদের মূল সত্য; আবার জীবত্বে দেবত্ব আরোপ করাই তাহার ব্যভিচার। এই সূত্রানুসারে ভগবদ্‌গুণের আংশিক প্রকাশ বা অংশাবতার সম্ভব; কিন্তু পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণাবতার একেবারে অসম্ভব। কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তিকে এই বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে, যেন তিনি একদিকে জড়পূজা ও নরপূজার ভ্রমে পতিত না হয়েন, এবং অপর দিকে ভগবানের গুণাবতার সকলকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মাকে কলুষিত না করেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যকে স্বয়ং পরমেশ্বর পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং যুক্তি ও শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের দ্বারা ঐ মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরমেশ্বর অচিন্ত্য ক্ষমতাশালী; সুতরাং ইচ্ছা করিলে মানবরূপে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, এই পুরাতন যুক্তিটীই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বনীয়। ইহার অযৌক্তিকতা দেখাইবার আবশ্যকতা নাই। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে এই যুক্তির মধ্যে কোন সার নাই। সর্ব্বশক্তিমত্তার এইরূপ অর্থ করিতে গেলে যে পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকেনা, তাঁহার স্বরূপ সকল যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং তিনি যে জন্ম মরণাদি মানবধর্ম্মের আয়ত্ত হইয়া প্রকৃত মানব রূপে পরিণত হইয়া যান, ইহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। পরন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহার স্বরূপ সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হইতে পারিত, তবে তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ হইতে পারিত। একি ভয়ানক মীংমাংসা! অবতারত্ব রাখিতে গিয়া শেষে নাস্তিকতার সিদ্ধান্তে উপস্থিত। ইহাকেই বলে দেব গড়াইতে বানর গড়া। যাহা হউক শাস্ত্রকারদিগের চক্ষে এ যুক্তির অযৌ-

ক্তিকতা লুক্কায়িত ছিল না। নতুবা অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কেন এই কথা বলিয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবেন?

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ মদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

হে জগদীশ! তুমি রূপহীন, অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্বব্যাপী; আমি বিকল চিত্ত হইয়া ধ্যানাদির দ্বারা তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, স্তুতি আদি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয়তা নিরাকৃত করিয়াছি, এবং তীর্থাদিতে তোমার ব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তুমি তাহা ক্ষমা কর।

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপনের জন্য যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। চৈতন্য সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিব। এই সকল প্রমাণের মধ্যে আবার কতকগুলি বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধেও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদিগেরই নির্দ্দেশ তত উপযুক্ত প্রমাণ হইতে পারে না। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। সমস্ত মহাভারতের মধ্যে চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। শান্তিপর্ব্বের অনুশাসনপর্ব্বাধ্যায়ের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া রূপগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, উহা গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।"

বিষ্ণুর সহস্র নাম প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, অন্যান্য নামের মধ্যে তাঁহার এই সকল নামও নির্দ্দিষ্ট আছে;—যথা, তাঁহার সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ ও সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; তিনি চন্দন তিলকধারী, সন্ন্যাসকারী ও নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণ।

মহাভারত গ্রন্থে দেখা যায় যে, ঐ শ্লোকটি কোন একটি শ্লোকের

উদ্ধৃতাংশ নহে। অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৯ অধ্যায়ের দান ধর্ম্মের ৯২ শ্লোকের প্রথমপাদ ও ৭৫ শ্লোকের দ্বিতীয়পাদ লইয়া উহা সংগঠিত হইয়াছে। ঐ শ্লোক দুইটী এই :—

"সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
বীরহা বিষমঃ শূন্যো ঘৃতাশীব চলশ্চলঃ।"

তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তিনি হেমাঙ্গ, চন্দনের অঙ্গদ ধারী, অসুরনাশকারী, তাঁহার সমান কেহই নাই, তিনি শূন্য অর্থাৎ নিরাকার এবং অগ্নির ন্যায় চঞ্চল। ৯২।

"ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।"

তিনি ত্রিবেদী, সামবেদ গায়ক, সামস্বরূপ, নির্ব্বাণস্বরূপ, ঔষধস্বরূপ, এবং ভিষক্; এবং সন্ন্যাসকারী, শমগুণ বিশিষ্ট, শান্ত এবং নিষ্ঠাপরায়ণ। ৭৫।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে মহাভারত প্রণেতা চৈতন্যাবতার লক্ষ্য করিয়া, এই সকল নামাবলী বলিয়াছিলেন কিনা? এবং বিভিন্ন শ্লোকের বিভিন্ন স্থান লইয়া ঐরূপ শ্লোক সংগঠন পূর্ব্বক তাহা উদ্ধার করিলে চৈতন্যাবতার সংস্থাপিত হয় কিনা?

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া চৈতন্যাবতার সংস্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্লোক দুইটী এই :—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।"
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ।"

ইহার প্রথমটী ভাগবতের দশমস্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ের নবম শ্লোক। নন্দভবনে গর্গাচার্য্য যাইয়া কৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে নন্দকে বলিতেছেন যে, "হে নন্দ, তোমার এই পুত্রটী প্রতি যুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন; ইহার শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ হইবে।" বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, অতীতকালের প্রয়োগ, "আসন্" ক্রিয়ার ভবিষ্যতের ন্যায় অর্থ হইবে, এই অর্থ ধরিয়া শ্লোকস্থ পীতবর্ণ শব্দ গৌরাঙ্গাবতারে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া

থাকেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা মহামান্য শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যার বিপরীত ও কষ্টার্থ কল্পনা মাত্র।

দ্বিতীয়টি একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের ২৯ শ্লোক। কলিযুগের ধর্ম্ম বর্ণনায় চমস ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুযায়ী ইহার অনুবাদ এইঃ—

"ইনি কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ (অর্থাৎ কৌস্তুভ, সুদর্শন, সুনন্দাদি) সহিত অবতীর্ণ হয়েন। তখন বিবেকী মনুষ্যগণ সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন।" স্বামী স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কলিযুগে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য দর্শিত হইয়াছে। অধিকন্তু যে সকল নামোল্লেখ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে হইবে তাহা ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহাতেও চৈতন্যাবতারের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। অথচ বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের সংকীর্ত্তন ও সাঙ্গোপাঙ্গাদি শব্দ দেখিয়া এবং "কৃষ্ণবর্ণ" ও "ত্বিষা কৃষ্ণ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া চৈতন্যোদ্দেশে ঐ শ্লোক প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "কৃষ্ণ বর্ণ" অর্থাৎ কাল রং যার কিন্তু "ত্বিষা কৃষ্ণ" অর্থাৎ কান্তি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়। বৈষ্ণবগণ বলেন যে 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইবর্ণ যাহার মুখে উচ্চারিত হয় এবং যাহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত। কোন্ পক্ষের অর্থ সরল ও স্বাভাবিক তাহা পাঠকেরাই বিচার করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে এই কবিতাটী দেখিতে পাওয়া যায়।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্।"

সত্য যুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি করিয়া এবং দ্বাপরযুগে পূজা অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, কলিযুগে কেবল মাত্র কেশবকে সংকীর্ত্তন করিলে সেই ফল পাইতে পারে।

একণে জিজ্ঞাস্য যে এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া কেহ যদি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অবতারত্ব সংস্থাপন পক্ষে প্রয়োগ করেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ হয়, বৈষ্ণবদিগের উদ্ধৃত উপরি উক্ত প্রমাণ গুলিও কি সেইরূপ হইতেছে না?

প্রকৃত কথা এই যে, যদি ভাগবতকার চৈতন্যাবতার লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেন, তাহা হইলে এরূপ অস্পষ্ট ও পরোক্ষ ভাবে কোন কথার নির্দ্দেশ থাকিত না। কলিযুগের শাক্যসিংহ কোন্ স্থানে কাহার গর্ব্ভে জন্মিবেন, এপর্য্যন্ত যিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন, তখন চৈতন্য সম্বন্ধে কি তিনি কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না? ইহা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ নিবাসী পরলোকস্থ ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় কোন কোন উপপুরাণ ও উদ্ধ্যম্নতন্ত্র নামক অপরিচিত তন্ত্রের নামকরণে আরও কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া চৈতন্যের পূর্ণত্ব স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যদি কোন বচন প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল তন্ত্রে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে প্রথমকালীন মহামহোপাধ্যায় অশেষশাস্ত্রদর্শী গোস্বামীপাদ মহোদয় তাহা উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা যে ঐ সকল তন্ত্র ও পুরাণ পাঠ করেন নাই, তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাঁহাদের যেরূপ শাস্ত্রানু-সন্ধিৎসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের নিকট যে ঐ সকল শাস্ত্র অবিদিত থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন গুলি যে নিতান্ত আধুনিক, ও স্বকপোলকল্পিত তাহা বুঝা যাইতেছে।

বৈষ্ণব দিগের গ্রন্থে চৈতন্য অবতার সম্বন্ধে যে সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে পাঠকদিগের নিকটে তাহাই উপস্থিত করি-তেছি। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের নানা স্থানে তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য এবং তিনিও কোন কোন সময়ে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দশাবতারগণের সহিত অভিন্নাত্মক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও সত্য; কিন্তু তাহা কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় এবং কি প্রকারে কথিত হইয়াছে? তাহা সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিলে, এবিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা, যেমন কোন কোন সময়ে তিনি আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া ছিলেন, তেমনি অন্যান্য বহু স্থলে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, একজন পাপী ও সামান্যব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিতেন; এবং যদি কেহ তাঁহাকে পরমেশ্বর বোধে স্তুতি করিত, তবে তাহাদিগের উপর

রাগান্বিত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে যে সকল মহাত্মা-গণ তাঁহার মতাবলম্বী ও প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে স্বয়ং পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন, প্রথমকালে তাঁহারাই বা তাঁহাকে কি ভাবে দেখিতেন, কি কি সূত্র ধরিয়া তাঁহার অবতারবাদে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশায় এই মত কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহাই আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রেমভক্তিশূন্য হইয়া কতকগুলি উপধর্ম্ম ও বাহ্যানুষ্ঠান লইয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অচিরকাল মধ্যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ ও সদ্ধর্ম্মের পুনস্থাপন করিবেন। শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় লিখিত আছে যে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, ভগবান সেই সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্যধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মনে ঐরূপ ভাব বদ্ধমূল হইয়া ছিল। সে যাহা হউক, চৈতন্যাবতার সংস্থাপন পক্ষে উত্তর কালে এই ভাবই মূল কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে শ্রীচৈতন্য দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পিতৃকৃত্য করিবার নিমিত্ত গয়া ধামে গমন করিয়া ছিলেন। সেই স্থানে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পুরীর অলৌকিক ভক্তিভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন; তদবধি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রেম, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে কখন ধর্ম্ম বিষয়ে বড় একটা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবন চরিত পাঠে জানা যায় না। বরং অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদাই বহুল ছাত্র সমভিব্যাহারে অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নানা প্রকারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন লোকে তাঁহার অহঙ্কারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিমাই "ঢাঙ্গাতি" বলিয়া ডাকিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, উত্তরকালে যাঁহারা তাঁহার প্রধান অনুচর হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তখন ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ভবিষ্যতে ইনি একজন পরম ভাগবত হইয়া উঠিবেন। অবতার-

বাদের ত কথাই নাই। তাঁহার বাল্য জীবনের যে সকল অলৌকিক ঘটনা চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা উত্তর কালীন তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মজীবনের আদর্শে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপে একটী ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠি ছিল। শ্রীবাস, অদ্বৈত, মুরারী, মুকুন্দ প্রভৃতি সকলে এই গোষ্ঠীভুক্তছিলেন। গয়াগমনের পূর্ব্বে গর্ব্বিত নিমাইপণ্ডিত কত প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন, ও তাঁহাদের ভাবুকতা লইয়া উপহাস করিতেন, এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া নিরুত্তর করিতেন। ইহাতে সকলে তাঁহার উপর এত বিরক্ত হইত যে, পথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। চৈতন্য-ভাগবতে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন,
মিথ্যা বাক্য ব্যয়ভয়ে সবে পলায়েন।
যদি কেহ দেখে তাঁরে আইসেন দূরে,
সবে পলায়েন ফাঁকি জিজ্ঞাসার ডরে।"

স্থানান্তরে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতেছেন :—

"এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র,
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র।
আমা সম্ভাষণে নাহি কৃষ্ণের কথন,
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন।" চৈতন্য ভাগবত।

একদিন ভাগীরথী তীরে শিষ্যবৃন্দের মধ্যে বসিয়া নিমাইপণ্ডিত শাস্ত্রের বিচারে মগ্ন। দূর হইতে শ্রীবাস, মুরারি ও মুকুন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছেন ;—

"কেহ বলে হেন রূপ, হেন বিদ্যা যার,
না ভজিলে কৃষ্ণ, কিছু নহে উপকার।
মনুষ্যে এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই,
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই।

দণ্ডবৎ হই সবে পড়িলা গঙ্গারে,
সব ভাগবত মিলি আশীর্ব্বাদ করে।
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন,
তব রসে মত্ত হই ছেড়ে অন্য ধন।" চৈতন্য ভাগবত।

পুনশ্চ—"কেহ কেহ সাক্ষাতেই প্রভু দেখি বলে,
কি কার্য্যে গোঁড়াও কাল তুমি বিদ্যাভোলে?
কেহ বলে হের শোন নিমাই পণ্ডিত,
বিদ্যায় কি কাজ? কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত।" চৈতন্য ভাগবত।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তখন অবতারের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারই ভাবি শিষ্যগণ তাঁহাকে একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াও জানিতেন না; বরং যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মে মতি হয়, সে জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। ইহার পরে গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপন মনের পরিবর্ত্তিত ভাব দুই চারিটী বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে ঐ সব বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন;—

"মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার!
এমন ইহানে কভু না দেখি যে আর।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ না দেখি ইহানে,
কি বিভাব পথে বা হইল দরশনে?" চৈতন্য ভাগবত।

পরদিন প্রত্যূষে বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে লইয়া শ্রীবাস প্রাঙ্গনে কুন্দ পুষ্প তুলিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীবাসের সহোদর শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট গৌরাঙ্গের ভাব পরিবর্ত্তনের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

"পরম অদ্ভুত কথা বড় অসম্ভব,
নিমাই পণ্ডিত হইল পরম বৈষ্ণব।
পরম বিরক্ত রূপ নাহিক সম্ভাষ,
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধাত্যের নাহিক প্রকাশ।
শেষে কৃষ্ণ বলিয়া যে কাঁদিতে লাগিলা,
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা।
যে ভক্তি দেখিনু আমি তাঁহার নয়নে,
তাঁহারে মনুষ্য বুদ্ধি নহে আর মনে।

"শ্রীমান বচন শুনি সর্ব্ব ভক্ত গণ,
হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখন।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার,
গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।" চৈতন্য ভাগবত।

ইহার পর দিন দিন চৈতন্যদেহে প্রেম ভক্তি প্রকাশ হইতে লাগিল, তিনি ধর্ম্ম জীবন লাভের জন্য মহা ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং অশেষ প্রকারে সাধু সঙ্গ ও সাধু সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীবাস আদি ভক্তগণকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন ও নানা প্রকারে তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহারাও কৃষ্ণলাভ হউক বলিয়া প্রাণ মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তখন পর্য্যন্তও কিন্তু অবতারের কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

"শ্রীবাস আদি দেখিলে প্রভু নমস্কারে,
প্রীত হয়ে ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে।
তোমার হউক ভক্তি শ্রীহরি চরণে,
মুখে হরি বল, হরি শুনহ শ্রবণে।
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ,
সবারে চাহে প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ।
তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে,
দাসে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই,
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঁই।
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে,
ধুতি বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে।
কুশা গঙ্গা মৃত্তিকা দেন কারো করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে।" চৈতন্য ভাগবত।

এইরূপে চৈতন্য দেব যতই ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার অলৌকিক ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মহাভাবের লক্ষণ সকল তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। মহাভাবে মগ্ন হইয়া কখন নাচিতেন, কখন কাঁদিতেন, হাসিতেন এবং কত সময়ে নীরবে বসিয়া থাকিতেন। আবার কখন ভাবে উন্মত্ত হইয়া মহাবেগে আপনাকে কৃষ্ণের সহিত

অভিন্নাত্মা বোধে কত কথা কহিতেন। এই সময়ে নিত্য নিত্য নূতন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে নৃসিংহাবেশ হইত, কখন বলরামের ভাব প্রকাশ পাইত, কখন বা আপনাকে রামচন্দ্র মনে করিতেন এবং আর আর নানা ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কত প্রকারে নৃত্য করিতেন। তাঁহার সঙ্গীগণও তখন প্রেম ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া, ঐসকল প্রকাশকে ঐশ্বরিক প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই সকল ভাবের প্রকাশ হইতেই যে তাঁহার অবতারত্বের মত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগাবসানে যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত, তখন ঐ সকল ভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হইত না। বরং মহা দৈন্য ও ব্যাকুলতা সহকারে আপনাকে অতি হীন ও সামান্য জ্ঞান করিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যেক মহাপুরুষেই এই সকল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দেবনন্দন ঈশা মহাযোগে মগ্ন হইয়া আপনাকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া ছিলেন। 'I and my father are one'। যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুনকে সমস্ত ভগবৎগীতার উপদেশ বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মহাত্মাগণ যোগ হইতে বিযুক্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া পরিচিত করিতে কখনই সঙ্কুচিত হইতেন না।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে, অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন "হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে যে ধর্ম্মতত্ত্ব আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি; অতএব পুনরায় সেই সমস্ত তত্ত্ব কথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।" ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে, অতি সুস্পষ্টরূপে আমাদের কথা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি বলিলেন, 'তখন আমি যোগযুক্ত হইয়া যে তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলাম, এইক্ষণে আর তাহা পুনরাবৃত্তি করিবার সাধ্য নাই।'

"ন শক্যং তন্ময়া ভূয় স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগ যুক্তেন তন্ময়া॥"

অনুগীতা। ১৬ অ। ১২। ১৩।

শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের মধ্য দিয়া প্রাগুক্তরূপে যে ভগবত্তত্ব প্রকাশিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেলেন, এবং

তাঁহার জীবত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব পৃথক্ করিতে না পারিয়া, তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া ফেলিলেন। অবতারবাদের মত তখন এদেশে অক্ষুণ্ণ ভাবে রাজত্ব করিতেছিল; সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের উপর বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এদেশে যখনই প্রাকৃতিক পদার্থে বা মানব জীবনে ভগবল্লীলা লক্ষিত হইয়াছে, ভারতের দুর্ভাগ্য ক্রমে তখনই অবতার-বাদ আসিয়া ভগবানের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মবীর চৈতন্যের মহত্ব ও গৌরব রক্ষার জন্য ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মহাভাবের দশা ভিন্ন আপনাকে কখনই ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত করেন নাই।

ঈশ্বরাভিমান করা দূরে থাকুক, তিনি আপনাকে ভক্ত বা ধার্ম্মিক বলিতেও লজ্জা বোধ করিতেন; এবং অন্যে যদি তাঁহার প্রশংসা করিত, অমনি 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলিয়া কর্ণে হাত দিতেন, ও ঐরূপ প্রশংসাকারীদিগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। না হইবেনই বা কেন? যাঁহার মতে তৃণ হইতে আপনাকে নীচ মনে না করিলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, তাঁহার মুখ হইতে কি কখন অভিমানের কথা উচ্চারিত হইতে পারে? কাশীতে যখন তিনি মায়াবাদী ও অদ্বৈতবাদী পরমহংসগণকে অলৌকিক পাণ্ডিত্যবলে পরাস্ত করিয়া, দাস্য প্রেমের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তখন পরমহংসগণের মুখপাত্র প্রকাশানন্দ স্বামী তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও প্রেম ভক্তির ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে নিরভিমানী চৈতন্যদেব মহাবিরক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেনঃ—

"প্রভু কহে 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' আমি জীব হীন;
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন।
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মসম,
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন।" চৈঃ চঃ।

পুরুষোত্তমে অবস্থিতি কালই চৈতন্যজীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠার সময়। তখন তাঁহার ধর্ম্ম জীবন ষোলকলাপূর্ণ পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম যৌবনে প্রেম ভক্তির যে জোয়ার আসিয়াছিল, তাহা অসামান্যরূপে পূরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্ম পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বে মণিপুর ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যেখানকার যত সাধুভক্ত সকলই তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সম্মান করিবার নিমিত্ত লালায়িত। তাঁহার ধর্ম্মে সহস্র সহস্র লোক দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিপুষ্ট করিতেছে এবং চারি দিক হইতে তাঁহার জয় বিঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে কিন্তু তাঁহার নিজ ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। তখনও কোন শিষ্যের সাহস হইত না যে, তাঁহার সমক্ষে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার স্তুতি করিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে, কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। এক দিন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, মত্ততা সহকারে তাঁহার নাম দিয়া একটী নূতন গান রচনা করত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ গান কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না; বোধ হয় তাঁহার নামরচিত সঙ্কীর্ত্তনের এই প্রথম সূত্রপাত। যাহাহউক ইহা শুনিতে পাইয়া চৈতন্য প্রভু অশেষ প্রকারে গায়কদিগকে তিরস্কার করিয়া ছিলেন।

"এক দিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ,
মহাপ্রভুর গুণ গাইয়া করেন কীর্ত্তন।
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন:—
'কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন?
ঔদ্ধত্য করিতে হইল সবাকার মন,
স্বতন্ত্র হইয়া সবে শাসিবে ভুবন?'" চৈঃ চঃ।

চৈতন্যের তিরোভাবের পর রূপ ও সনাতন গোস্বামীই তাঁহার অবতারত্ব স্থাপন বিষয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যাবতার যে একরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফলে। কিন্তু তাঁহার জীবনসময়ে ইহাঁরাও কোন কথা বলিয়া উঠিতে পারিতেন না। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ঐ দুই নাটকের নান্দীতে আপন অভীষ্ট দেবের বন্দনা উপলক্ষে দুইটী শ্লোকে চৈতন্যাবতারের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া ছিল, এক দিন হরিদাসের বাসায় চৈতন্য দেব, রামানন্দ রায়, ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ সমাগত ছিলেন, হরিদাস প্রমুখাৎ ঐ দুই নাটক রচনার বিষয় অবগত হইয়া রামানন্দ রায় তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন রূপগোসাই মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া গ্রন্থের অংশ স্থানে স্থানে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রায়

রামানন্দ নান্দী ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন।

"রায় কহে কহ ইষ্ট দেবের বর্ণন,
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন।
প্রভু 'কহে কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে?
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে।' চৈঃ চঃ।

তখন রূপ গোস্বামী ঐ দুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শ্লোক দুইটীর বাঙ্গলানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"পূর্ব্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ ভক্তি সম্পদ প্রদান করিবার জন্য, যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও উজ্জ্বল, সেই শচী নন্দন হরি (সিংহ) তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত থাকুন।" বিদগ্ধমাধব।

"যিনি জগতে উদিত হইয়া স্বর্গীয় প্রেমসুধা অপর্য্যাপ্তরূপে বিতরণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করত সকলের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেমে সকল জগৎবাসী বশীভূত হইয়াছে, সেই শচীনন্দন শশী আমাকে অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করুন।" ললিতমাধব।

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্য দেব রাগান্বিত হওত রূপকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও রামানন্দ রায় রূপের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহার উপরও মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু বলিতেছেন;—

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণ রস কাব্য সুধা সিন্ধু?
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষার বিন্দু?
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পুর;
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস?
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস।" চৈঃ চঃ।

অবশেষে রায় রামানন্দ এই বলিয়া মহাপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, গ্রন্থমধ্যে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারদিগের ইষ্টদেবের বন্দনা করিবার রীতি প্রচলিত আছে; রূপ ঐ প্রথানুসারে আপন ইষ্ট দেবতাকে হরি (সিংহ) ও শশীর সহিত উপমা দিয়া স্তব করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।

এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিলে, কি কারণে চৈতন্যাবতারের মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে। ধর্ম্ম জগতে ইহা নুতন কথা নহে; সমস্ত মানব জাতির ধর্ম্ম ইতিহাসে এইরূপ ঘটনাই দেখা যায়। তবে এই প্রস্তাবে আমরা ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, যে মত অবলম্বন করিয়া এক্ষণে বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া ঘরে ঘরে পূজা করিতেছেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্ম মতের নিতান্ত বিরুদ্ধ। তিনি জীবিত থাকিলে, এই অনুষ্ঠান কখনই অনুমোদন করিতেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যের ধর্ম্মের সহিত বাঙ্গলা ভাষার সম্পর্ক।

কোন্ সময়ে ও কিরূপে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রাকৃত ভাষা বাঙ্গলার আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও দেশবাসীদিগের প্রকৃতির প্রভাবে কাল সহকারে বাঙ্গলা ভাষা রূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। তবে ইহা ঠিক বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা প্রত্যক্ষ-ভাবে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। যদিও ইহাতে ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রাকৃত ভাষার মধ্যে দিয়া পরোক্ষ ভাবে উপনীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, চৈতন্য দেবের বহু পূর্ব্ব হইতে যে বাঙ্গলা ভাষাই এ দেশীয়দিগের ভাষা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন ভাষার সুমার্জ্জিত গঠন, লালিত্য বা অঙ্গ সৌষ্ঠব আদি কিছু ছিল না। যেমন একটী বিস্তীর্ণ জঙ্গলে কণ্টকাকীর্ণ আগাছার মধ্যে সুন্দর সুন্দর কুসুম স্তবক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ফুটিয়া থাকে, তখন বাঙ্গলা ভাষারও সেই অবস্থা। কালক্রমে ঐ ভাষারূপ জঙ্গলে আগাছা কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যেখানে যে গাছটী সাজে, সেই স্থানে তাহাকে রাখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে এখন একটী সুন্দর প্রমোদকানন করিয়া তুলিয়াছেন। ভাষা তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, সকল দেশে ভাষাটী প্রথমে চলিত কথা বার্ত্তায় আবদ্ধ থাকে, তখন তাহাকে মৌখিক ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কাল সহকারে সুখ দুঃখাদি ভাবব্যঞ্জক মনের নানাবিধ অবস্থা কবিতাকারে প্রকাশিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইলে লিখিত ভাষার জন্ম হয়। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বেদাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল মনুষ্যজাতি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বিধাতা ছন্দো বন্ধে রচনা করত, ব্যক্তি বিশেষ, কি জাতি বিশেষকে অর্পণ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাঁহাদের কথায় সায় দেয় না। বাঙ্গলা ভাষাও যে এইরূপ কথা বার্ত্তার মৌখিক ভাষা হইতে লিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, কোন্ সময়ে কেমন করিয়া বাঙ্গলা বর্ণ মালার সৃষ্টি হইল ?

এ বিষয়েরও ঠিক তত্ত্ব কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। দেবনাগর অক্ষরই সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা ; বাঙ্গলা অক্ষর তাহার রূপান্তরিত অবস্থা বই আর কিছুই নহে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রাদিতে বাঙ্গলা বর্ণমালার উল্লেখ আছে। তাহা সত্য, কারণ অধিকাংশ তন্ত্রই অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে ন্যায়রত্ন মহাশয় যে লিখিয়াছেন, বাঙ্গলা অক্ষর ও বাঙ্গলা ভাষা একদা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

চৈতন্যের পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, এবং বাল্মীকি ও চসরের ন্যায় তাঁহারাই বাঙ্গলার আদি কবি ছিলেন সত্য ; কিন্তু বাল্মীকি ও চসর যেরূপ সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় আনুপূর্ব্বিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইঁহারা সেইরূপ করেন নাই। ইঁহাদের রচিত অনেকানেক পদাবলী ও গীতিকবিতা আছে বটে, কিন্তু তাহা রামায়ণ ও Canterbury Tales এর ন্যায় পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সূত্রে গ্রথিত গ্রন্থ বিশেষ নহে। ঐ সকল কবিতার অধিকাংশই রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক নানা ভাবের ও নানা অবস্থার খণ্ড খণ্ড কবিতাবলী মাত্র। চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গ ভাষায় আনুপূর্ব্বিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতকেই বাঙ্গলার আদি গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও কড়চা গ্রন্থ গুলি এই দুই গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তত্তাবতে কোন ঘটনা-

বিশেষ আনুপূর্ব্বিক বিবৃত না হওয়ায়, সে গুলিকে গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করা কর্ত্তব্য নয়।

যেরূপ পিতা মাতার নিকট সন্তানগণ, সেইরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিকট বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে এবিষয়ে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন ও অশেষ প্রকারে বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ ঘৃণা সহকারে মাতৃ ভাষাকে উপেক্ষা করত, ইহাতে গ্রন্থাদি রচনা করিতেন না। তখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক গ্রন্থাদি রচিত হইত, কিন্তু সে সকলই সংস্কৃত ভাষায়। এমন কি বৈষ্ণব কবিগণ ও উত্তরকালে সমুদ্ভূত রায় গুণাকর প্রভৃতি বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ কবি সকলও সম্পূর্ণরূপে এই প্রথাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকেও সংস্কৃতে গ্রন্থ সকল রচনা করিতে হইত। রূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, চৈতন্য চরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃত গোবিন্দলীলামৃত ও ভারত চন্দ্র রায়ের চৌর পঞ্চাশত, নাগাষ্টক প্রভৃতি কাব্য এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

চৈতন্যদেব ভারতীয় ধর্ম্ম জগতে যে যে সংস্কার আনিয়া দিয়া যান, তাহার মধ্যে দেশের চলিত ভাষায় ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল প্রচার করা একটী প্রধান। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণাচার্য্যদিগের মত, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্মের অনেক সংস্কার করিয়াছিলেন সত্য বটে; কিন্তু এ বিষয়ে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহারা উদারচেতাও সমদর্শী চৈতন্য দেবের অনেক পশ্চাতে ছিলেন বলিতে হইবে। যিনি জাতি ও পাত্র নির্ব্বিশেষে আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সকল সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষার অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা কখনই অনুমোদন করিতে পারে না। তাই তিনি ঐ সকল তত্ত্ব প্রচলিত-গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তদবধি কড়চা গ্রন্থ সকল, সুমধুর পদাবলী ও বিবিধ ভাব পূর্ণ সঙ্গীত মালা বিরচিত হইয়া মাতৃ ভাষার অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল। ভাষার উন্নতি সাধন করা বৈষ্ণবগণের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও গৌণরূপে যে তাহা সংসাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের মধ্যে কড়চা গ্রন্থগুলি, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, ভক্তমাল ও নানাবিধ মহাজনী পয়ার ও পদাবলী এবং নরোত্তম দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনা, প্রেমভক্তি ও পাষণ্ড দলন সচরাচর দেখা যায়। কড়চা গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য। প্রথমোক্ত তিন খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রস্তাবের উপক্রমণিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পাঠক মহাশয় তাহাদের বিষয় ও প্রকার ভেদের বিবরণ অনেকটা জানিতে পারিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে গ্রন্থকারগণ ভাষার লালিত্য ও কবিতার সৌন্দর্য্যের দিকে তত দৃষ্টিপাত করেন নাই, যত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতেই এই সকল গ্রন্থ একণকার মার্জ্জিত বুদ্ধি পাঠকের নিকট তত প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। নতুবা ইহাদের মধ্যে যে, অপূর্ব্ব ভাব ও মাধুর্য্য-সম্পন্ন কবিতা নাই, তাহা নহে। বরং ভাব ও রস মাধুর্য্যে বৈষ্ণব কবিগণ যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে এবং স্থানে স্থানে ভাষামাধুর্য্যেরও এরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে তাহা অতি কম কবিতেই দেখা যায়। আমাদের কথা সপ্রমাণার্থে এখানে একটী মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম?
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে মোর নাম?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি?
কোন্ রন্ধ্রে কেকারবে নাচে ময়ূরিণী?
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত?
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ?
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে?
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফলফুলে?
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।" জ্ঞানদাস।

বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্রজবুলি ও "যাঙা" "যাইঙা" প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন

অধিকাংশ গ্রন্থকারের বাসস্থান রাঢ়দেশে ছিল, তখন তাঁহারা যে তাঁহাদের দেশ প্রচলিত শব্দ সকল স্ব স্ব গ্রন্থমধ্যে প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে ব্রজভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহা অনুমান করা ঠিক নহে যে, তৎকালে ঐ প্রকার ভাষা এ দেশে প্রচলিত ছিল। জীব গোস্বামী প্রভৃতি অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তৃগণ বৃন্দাবনে বাস করিতেন; তাঁহাদের বর্ণিত বিষয় গুলিও প্রায় রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে থাকিত; এবং ব্রজবুলি গুলি শুনিতেও সুমধুর, তারই জন্ত বোধ হয় গ্রন্থ মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ চৈতন্তের জন্ম ভূমি ও প্রথম লীলার স্থান। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটী অতি পুরাতন ও সুপ্রসিদ্ধ নগর। কোন্ সময়ে ও কিরূপে এই নগরের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার ঠিক বৃত্তান্ত নির্ণয় করা অসম্ভব। বাল্যকালে একবার প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, অতি পূর্ব্ব কালে ভাগীরথী ও খড়িয়া নদীর স্রোত-বিবর্ত্তনে উপদ্বীপাকারে একটী চর পড়িয়াছিল, লোকে তাহাকে নূতন দ্বীপ বলিত। কাল সহকারে কয়েকজন মৎস্যজীবী ধীবর ঐ নবোদ্গত ভূমিখণ্ডে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করায় ইহা একটী যৎসামান্ত ক্ষুদ্র পল্লীর আকার ধারণ করিয়াছিল। নবোদগত ভূখণ্ড উপদ্বীপাকারে গঠিত হওয়ায় প্রথম হইতেই পল্লীর নাম নূতনদ্বীপ বা "নবদ্বীপ" হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন্ যে, নয় ঘর ধীবরের আবাস স্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম নবদ্বীপ হয়। সে যাহা হউক পরে যখন ইহা বহুজনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী রাজধানী রূপে পরিণত হইয়া প্রাচীনাবস্থায় উপনীত হইল, তখনও কিন্তু ইহার নামের নবীনত্ব বিলুপ্ত হইল না।

এক্ষণে যে স্থানটীকে নবদ্বীপ বলা যায়, প্রাচীনকালের নবদ্বীপ যে ঐ স্থানে ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর

পূর্ব্ব প্রায় ৫ মাইল দূরে ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘীকার কঙ্কাল একণেও নয়ন গোচর হইয়া থাকে। লোকে ঐ শুষ্ক খাতকে 'বল্লাল দিঘী' বলিয়া থাকে। একণে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে উহাতে জল থাকে না। ঐ দিঘী সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে পৌরাণিক সময়ে পৃথু রাজা ঐখানে এক কুণ্ড কাটিয়াছিলেন, তাহার নাম পৃথু কুণ্ড ছিল। পরে সেন বংশীয় শেষ রাজা লাক্ষণেয় সেন তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দীর্ঘীকাকারে পরিণত করতঃ স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ বল্লাল সেনের নামে উৎসর্গ করেন। সেই হইতে উহা বল্লাল দিঘী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। দিঘীর পূর্ব্বধারে লোকের বসতি আছে; এবং উত্তরভাগে একটু দূরে ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় ইষ্টক, প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী উচ্চ স্থান আছে, তাহার নাম'বল্লালের ঢিবি'। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই স্থান হইতে অনেক প্রস্তরাদি লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাটী নির্ম্মাণে লাগাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে রাজা বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল; তাহারই ভগ্নাবশেষ একণে 'বল্লালের ঢিবি' নাম ধারণ করিয়া বহুদিনের ইতিহাসের কথা আপনার উদরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দু রাজত্বের সময়ে সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী নবদ্বীপ নগরে ছিল। সুতরাং প্রাচীনকালের নবদ্বীপ যে, 'বল্লাল ঢিবি' ও বল্লাল দিঘীর সন্নিধানে ব্যবস্থিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। তখন এই নগরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে নির্ম্মল সলিলা ভাগীরথী ইহার পাদমূল বিধৌত করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া গোয়ালপাড়ার নিকটে খড়িয়া নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল; এবং পূর্ব্বে বল্লাল দিঘীর কিছু দূরে খড়িয়া নদী মৃদু মন্দ গমনে দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইত। এই নবদ্বীপই হিন্দু রাজত্বের শেষ রঙ্গ ভূমি ও লাক্ষণেয় সেনের কাপুরুষতার পরিচয় স্থান। তাই বুঝি বিধাতা ইহার উৎসন্ন সাধনে যত্নবান হইলেন।

মুসলমানদিগের আমলদারীর সুরু হইতে ক্রমে ভাগীরথীর স্রোত পশ্চিমদিকে সরিয়া যাওয়ায় সেন রাজাদিগের নবদ্বীপ শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে যাইয়া বাস করিতে লাগিল এবং মায়াপুর আতোপুর, গঙ্গানগর, সীমুলীয়া, ব্রাহ্মণ পুকর (বামন পুকুরিয়া) ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পল্লী আয়তন লইয়া উঠায় পুরাতন নবদ্বীপ এক প্রকার স্থান ভ্রষ্ট হইয়া গেল। রাজকীয়

স্থান আবার সীমূলীয়ায় উঠিয়া আসাতে উহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। ক্রমে এইস্থান গুলিকেই লোকে নবদ্বীপ বলিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে এই সব গ্রামই নবদ্বীপ ছিল। বর্তমান নবদ্বীপ যেস্থানে সন্নিবিষ্ট, তখন সেখানে দুইটী বিস্তীর্ণ চরা ছিল, লোকে তাহাকে পারডাঙ্গা ও ছিনাডাঙ্গা বলিত।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে নবদ্বীপের অতিমাত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা দেখা যায়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিষ্ণুপুরাণের নিম্ন লিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়া নবদ্বীপের অলৌকিক প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। "ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্। নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্তথবারুণঃ। অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সম্বৃতঃ। যোজনানাং সহস্রস্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।"

'সাগর সম্বৃত' পদের সমুদ্র প্রান্তবর্ত্তী অর্থ ধরিয়া এবং নবমদ্বীপের পৃথক্ নাম বলা হয় নাই বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিষ্ণুপুরাণের এই শেষোক্ত স্থান নবদ্বীপকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা অবধারণ করিয়াছেন। এই নবদ্বীপ আবার দুই চারি খানি গ্রাম লইয়া পরিগণিত হয় নাই। বৃন্দাবন লীলার অনুসরণ করিয়া ভাগীরথীর উত্তর ও দক্ষিণে উভয় পারে ষোল ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন স্থানকে গৌরলীলায় নবদ্বীপ ধাম বলা হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে নয়টী দ্বীপে ভাগ করা হইয়াছে এবং তাহার প্রত্যেক খণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ পৌরাণিক উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। সেই সমস্ত আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া আমরা প্রস্তাব দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল মাত্র ঐ নয়টী দ্বীপ ও তাহার অন্তর্গত স্থানের বিষয় কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। নয়টী দ্বীপের নাম যথাঃ—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম ও রুদ্রদ্বীপ। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটী গঙ্গার পূর্ব্ব পারে এবং শেষ পাঁচটী গঙ্গার পশ্চিম পারে। ইহাদিগের তদানীন্তন নাম ও অন্তর্গত স্থান এইরূপঃ—

১। অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ আতোপুর। গ্রামটী বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে মায়াপুর যেখানে জগন্নাথ মিশ্রের বাটী ছিল। ভারুইডাঙ্গা (ভারদ্বাজ টিলা), বামুনপুকুরিয়া ইহার অন্তর্গত। একণে শিবডোবা বলিয়া যে খাত বর্ত্তমান আছে, উহা চৈতন্য চন্দ্রের সময়ে গঙ্গাগর্ভ, এবং বৃদ্ধ শিবের ঘাট

ছিল। বামুনপুকুরিয়াতে চাঁদকাজীর বংশীয়গণ এক্ষণে ও বসতি করিতে-ছেন।

২। সীমন্তদ্বীপ বা সীমুলিয়া। গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান সীমুলিয়া চরের নিকটবর্ত্তী সিমলা নামে যে স্থান আছে—তাহাই প্রাচীন সীমুলিয়ার ভগ্নাবশেষ। এখানে এখনও পৌরাণিক সীমন্তিনী (সীমলী) দেবীর পূজা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রুকুনপুর পর্য্যন্ত সীমন্ত দ্বীপের অন্তর্গত। এই খানে মুসলমান রাজপুরুষ চাঁদকাজীর বসতি ছিল। ইনি গৌড়াধিপ হোসেন সাহার আত্মীয় ছিলেন। গঙ্গা নগর ইহার অন্তর্গত; এই গঙ্গা নগরে শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও সহাধ্যায়ী সঞ্জয় বাস করিতেন। পৃথুকুণ্ড অর্থাৎ বল্লাল দিঘী ইহার নিকটবর্ত্তী।

৩। গোদ্রুম বা গাদিগাছা। এই স্থান দিয়া শ্রীচৈতন্যের নগর সংকীর্ত্তনের দল পরিক্রমা করিয়াছিল। সুবর্ণ বিহার ইহার অন্তর্গত। সুবর্ণবিহারে গৌরচন্দ্র ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্ত্তনে মহানৃত্য করিয়াছিলেন। গৌরকে দেখিয়া লোকে মনে করিত বুঝি সুবর্ণের বিগ্রহ নাচিতেছে।

৪। মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা। বামন পুরা (ব্রাহ্মণ পুকুর), হাটডাঙ্গা (উচ্চ হট্ট), ইহার দক্ষিণে। শ্রীগৌরাঙ্গের মহা নগরসংকীর্ত্তনের দল দক্ষিণে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। এই চারিটী দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব পারে এবং ইহাদিগকেই প্রকৃত নবদ্বীপ বলা যাইতে পারে।

৫। কোলদ্বীপ। কুলিয়াপাহাড় ভাগীরথীর পশ্চিমে। নীলাচল হইতে আসিয়া চৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামে মাধব মিশ্রের আলয়ে অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। সমুদ্রগতি (সমুদ্রগড়) চম্পকহট্ট (চাঁপাই হাটী) ইহার অন্তর্গত। শায়ডাঙ্গা ও ছিনাডাঙ্গা নামক বিস্তীর্ণ চরা ভূমি, যেখানে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ব্যবস্থিত, ইহার সমীপবর্ত্তী।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাহুতপুর। বিদ্যানগর ইহার সমীপবর্ত্তী। শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে বিদ্যানগরে নানাবিধ বিদ্যাচর্চ্চা হইত। বেদবেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলদর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের অধ্যাপকগণেরই এখানে টোল ছিল। কথিত আছে স্বয়ং বৃহস্পতি বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে বিশারদের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া এখানে বিদ্যাবিলাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি বাসত্যাগ করিয়া উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত হইয়া নীলাচলে

গিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বিদ্যাবাচস্পতির এখানে টোলছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ নদী পার হইয়া সময়ে সময়ে বিদ্যানগরে আসিয়া পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন।

৭। জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর।

৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—মাউগাছি। বৈকুণ্ঠপুর, অর্কটীলা(আকৃডাঙ্গা), মহৎপুর (মাতাপুর) ইহার অন্তর্গত।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রাহুপুর (রুদ্রপাড়া)। পূর্ব্বস্থলী, চুপী, কোব্দশালী ও মেড়তলা ইহার অন্তর্গত।

এই সমস্ত স্থানই গৌরাঙ্গ বিলাসের স্থান বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে মহা-তীর্থ জ্ঞানে পূজিত। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশতরঙ্গে শ্রীমদাচার্য্যপ্রভুর নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাতে পাঠক মহাশয় এই সকল স্থানের পৌরাণিকবৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। সে যাহাহউক নবদ্বীপ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে একটী সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপে বুড়াশিব ও পোড়ামা নামে দুইটী গ্রাম্য দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ব্ব নবদ্বীপের বৃত্তান্ত মধ্যে এই দুই দেবতার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই দুইটী দেবতার নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন লীলায় যেমন কাত্যায়নী ও গোপে-শ্বর যোগমায়া ও কালভৈরবরূপে কৃষ্ণলীলায় সাহায্য করিয়াছিলেন, গৌর লীলায় তেমনি পোড়া মা (প্রৌঢ়া মা) একাংশে ও সিমুলীদেবী "সিমন্তিনী দেবী" অপরাংশে যোগমায়ারূপে এবং বৃদ্ধ শিব (বুড়াশিব) ক্ষেত্রপাল রূপে লীলার সহায়তা জন্য প্রকাশিত হইয়া ছিলেন। ফলতঃ গৌরাঙ্গাবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে এই দুই দেবতা যে বিদ্যমান ছিলেন তাহার কিম্বদন্তী এই যে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন উদাসীন সন্ন্যাসী আসিয়া এই গ্রামে ভগবতীর এক ঘট স্থাপন করেন। ইনি একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর মাহাত্ম্যও চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। দেবীর নাম 'পোড়ামা' বা প্রৌঢ়ামা কেন হইল, জানি না; কিন্তু ঐ ঘট অদ্যাপিও এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মূলে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ প্রদেশের সমস্ত লোক সিদ্ধপীঠ জ্ঞানে ঐ স্থানে পূজা দিয়া থাকে।

এমন কি, টোলের ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে পোড়ামার পূজা না দিয়া যাইতে পারে না। এই রীতি একণে প্রচলিত আছে কি না, জানি না; কিন্তু ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম যে, কৃতবিদ্য ছাত্র পোড়ামার পূজা দিয়া সেই বৃক্ষ মূলে সমবেত অধ্যাপক মণ্ডলীর নিকট উপাধি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে স্বদেশে যাইতে পাইতেন। অতি প্রাচীন সময় হইতেই নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; তজ্জন্য নানাবিধ ও নানা দেশীয় ছাত্রগণ এখানে আসিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিত। তদ্ব্যতীত গঙ্গাস্নানোপলক্ষেও বহুবিধ লোকের সমাগম হইত। এই সকল কারণে নবদ্বীপ নগর অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। চৈতন্য চন্দ্রের সময়ে এই গ্রাম যে, একটী সমৃদ্ধিশালী উপনগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা আমাদের কথাই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। বিদ্যা, বাণিজ্য, তীর্থ ও রাজকীয় সকল অংশেই নবদ্বীপের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়;—

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই;
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা;
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে?
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ;
সরস্বতী দৃষ্টি পাতে সব মহা দক্ষ।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে;
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপ যায়;
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা রস পায়।
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বৈসে;
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।

চৈঃ ভাঃ আদি ১ অধ্যায়।

কবিকর্ণপূরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতের প্রথম প্রক্রমেও এইরূপই দেখা যায়।

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরম বৈষ্ণবে,
ব্রাহ্মণাঃ সাধবাঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ
মহান্তঃ কর্ম্ম নিপুণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ
অন্যেচ সন্তি বহু শো ভিষক্‌শূদ্র বণিক্‌ জনাঃ।
স্বাচার নিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবকচঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠ ভবনোপমে।"

চৈতন্যের সময়ে এই নগরে একজন কাজী বা রাজকীয় কর্ম্মচারী বাস করিতেন। চৈতন্য চরিতামৃতের ও চৈতন্য ভাগবতের নানাস্থানে ঐ কাজীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি গৌড়াধিপ সৈয়দহোশেনের আত্মীয়, নাম চাঁদকাজী। কাজীর দরবারে বা দেওয়ানে কোন্ দিন কি আদেশ হইত, তাহা জানিবার জন্য প্রজাগণ বড়ই উৎসুক থাকিত; এবং কোন অহিতকর আদেশ হইলে তজ্জন্য প্রভুত শঙ্কিত হইত। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, কাজীসাহেব বিচার কার্য্য ব্যতীতও দেশের শান্তি রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিতেন। এক্ষণকার উপবিভাগ সমূহে যেরূপ সবডিবিসনাল আফিসার ও দেওয়ানী বিচারকগণ পৃথক পৃথক নিযুক্ত হইয়া থাকেন; তখন বোধ হয় এক কাজী উভয়বিধ ক্ষমতাই পরিচালনা করিতেন।

চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ বলিয়া যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা নবদ্বীপের সমৃদ্ধিশালীতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। নানা জাতীয় লোক শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে নগরের বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আচার্য্য, তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক, শঙ্খ বণিক, মালাকার, তাম্বুলী, তরকারি বিক্রেতা, মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই বহুল পরিমাণে উল্লেখ দেখা যায়। হাট, ঘাট বাজার, রাজপথ ও অট্টালিকা সমূহেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা যায়। সর্ব্ব দক্ষিণে বৃদ্ধ শিবের ঘাট, তাহার উত্তর গৌরাঙ্গের ঘাট, পরে মাধায়ের ঘাট, নাগরীয় ঘাট ও বার কোণা ঘাট এইরূপ পর পর কয়েকটী নদীর ঘাটের বর্ণনা চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে রহিয়াছে। সুতরাং এই নগর যে তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গঙ্গার অপর পারস্থ কোন কোন পল্লীর বিষয়ও বর্ণনা আছে। নবদ্বীপাধিবাসিগণ কার্য্যার্থ বা ভ্রমণার্থ ঐ সকল গ্রামে সর্ব্বদা গতি বিধি করিতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ

সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঐ সকল গ্রামে যাইয়া সময়ে সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন :—

"নিত্যানন্দ সকল পার্ষদগণ সঙ্গে,
প্রতি গ্রামে ফিরেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
খানা চৌড়া, বড়গাছি, আর দোগাছিয়া ;
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।"

এই সকল গ্রাম এক্ষণে নবদ্বীপ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই যে ভাগীরথী কালধর্ম্মে প্রাচীন নবদ্বীপকে ধ্বংস করিয়া অপর পারে লইয়া গিয়াছে বলিয়া। তৎকালের পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে কণ্টক নগরী (কাঁটোয়া) শান্তিপুর, বরাহনগর, কুমারহট্ট (হালিসহর), সপ্ত গ্রাম, পাণিহাটি, গৌড়, রামকেলি ; উড়িষ্যার মধ্যে জলেশ্বর, বালেশ্বর, যাজপুর, কটক, রেমুণা ও পুরী প্রভৃতি চৈতন্য বিলাসের স্থান বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণকার সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতা, কি হুগলী, ফরাস ডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কোন স্থানেরই উল্লেখ নাই। তৎকালে যে এই সকল স্থান কোন অংশেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

লীলাভেদ।

চৈতন্যের জীবনেতিহাস লেখকগণ তাঁহার জীবনগ্রন্থ খানি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার মর্ত্ত্য জীবন ৪৮ বৎসর ব্যাপী। চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যমঙ্গল কর্ত্তা লোচন দাস, ইহা একরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্য জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুসরণ করিয়া তচ্চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদের প্রণালীকে আধ্যাত্মিক

বিভাগ এবং শেষোক্ত গ্রন্থকার তাঁহার প্রাকৃত জীবন অবলম্বন করিয়া লীলাভেদ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার অবলম্বিত প্রথাকে প্রাকৃতিক বিভাগ বলা যাইতে পারে। ২৩ বৎসর বয়সের সময় শ্রীচৈতন্য পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াতীর্থে গমন করেন; সেই খানে ভক্তবর ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ও তিনি পুরীর নিকটে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এত দিন তিনি বিদ্যারসে মত্ত এক জন দাম্ভিক পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু এক্ষণ হইতে বিনয় ও ব্যাকুলতা অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল এবং তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভক্তি বিকাশের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। এখন হইতে তিনি পূর্ব্বের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিচার বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা রজনী প্রেম ভক্তির অনুশীলনে ও সঙ্কীর্ত্তন বিলাসে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে বৃন্দাবন দাস প্রমুখ গ্রন্থকারগণ এইখানে তদীয় জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছেন। আবার তখন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত এক সম্বৎসরকাল তাঁহার জীবনে মূর্ত্তিমতী ভক্তির অলৌকিক বিকাশ দেখা গিয়াছিল। প্রেমোন্মত্ততা, মহানৃত্য, মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তগণের সহিত বিবিধ লীলা বিলাস ও সমাধি মহাভাবের প্রগাঢ় অবস্থা, এই সময়ের প্রধান ঘটনা। সে জন্য সেই খানে তাঁহার জীবন গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশ পর্য্যটন ও নীলাদ্রিতে অবস্থিতি এবং লীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসরের ঘটনা তৃতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদ। এই তিন পরিচ্ছেদের নাম আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড।

লোচন দাসের বিভাগ, বৃন্দাবন দাসের ঠিক্ অনুকরণ নহে। কিছু বিশেষ আছে। ইহার মতে জন্ম হইতে গয়াগমন পর্য্যন্ত আদিখণ্ড; নবদ্বীপ বিলাস, সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাদ্রিতে গমন মধ্যখণ্ড; এবং দেশ পর্য্যটন ও নীলাচলে অবস্থিতি শেষ বা অন্ত্যখণ্ড।

পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যলীলা এইরূপে বিভাগ করিয়াছেন;— জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ ত্যাগ ২৪ বৎসর কালের ইতিবৃত্ত আদি লীলা এবং শেষ জীবনের ২৪ বৎসরের ঘটনাবলীকে শেষলীলা বলিয়া তিনি অবধারণ করিয়াছেন। শেষের ২৪ বৎসরের মধ্যে আবার ৬ বৎসর কাল দেশ পর্য্যটনে ও অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর ক্রমিক লীলা-

ত্রিতে অতিবাহিত হয়, সে জন্য শেষলীলা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রথম ৬ বৎসর মধ্যলীলা ও শেষ ১৮ বৎসর অন্ত্যলীলা নামে অভিহিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন;—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি,
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস;
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস;
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন;
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে;
কৃষ্ণপ্রেম লীলামৃতে ভাসাল সকলে।
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান;
মধ্য, অন্ত্য, নামে শেষলীলার দুই নাম।"

চৈঃ চঃ আদিলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার লীলাভেদ তত্ত্বৎভাবে দেখিতে গেলে সুসঙ্গত ও শ্রেণী বিন্যস্ত হইলেও চৈতন্যচরিতামৃতের বিভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখবোধ্য বলিয়া বোধ হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা ও পরিচয়।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ নবদ্বীপের আদিম নিবাসী ছিলেন না; পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়া তাঁহার পিতা নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টদেশে উপেন্দ্র মিশ্র নামে একজন সম্ভ্রান্ত বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

বাস করিতেন ; কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ নামে তাঁহার সাত পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে জগন্নাথ জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র অতি শান্ত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন ; এবং দেবার্চ্চনা, অধ্যয়ন, তপ জপাদি ব্রাহ্মণোচিত পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠানেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুরন্দর উপাধি ছিল ; সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। বিবাহের পূর্ব্বে কি পরে জগন্নাথ স্বদেশ পরিত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় না ; সম্ভবতঃ নবদ্বীপগমনের পরই তিনি পরিণীত হইয়া থাকিবেন। কারণ তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপবাসী সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত লোক ছিলেন। সমস্ত নবদ্বীপবাসীই নীলাম্বরের যথেষ্ট সম্মান ও খাতির করিত এবং সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস তাঁহার শিষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সুতরাং সুদূর দেশ শ্রীহট্টে নীলাম্বর যে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব বোধ হয় না। তবে ইহা হইতে পারে যে জগন্নাথের ন্যায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন।

শচী জগন্নাথের প্রথমে সন্তানভাগ্য বড় ভাল ছিল না। এক একটী করিয়া আটটী কন্যা জন্মগ্রহণান্তর গতাসু হইলে পতি পত্নী বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছিলেন ; এবং সন্তান কামনায় বিষ্ণুপূজাদি নানারূপ দেবানুষ্ঠান করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনান্তর সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী পুত্র জন্মিল। পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিশ্বরূপ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে একজন ভগবৎপরায়ণ সাধুমধ্যে পরিগণিত হইলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য একটী ক্ষুদ্র বৈষ্ণব দলের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপের জন্মের পর দীর্ঘকাল যাবৎ শচী জগন্নাথের আর কোন অপত্যোৎপাদন হয় নাই। পরিবারের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় চৈতন্যচন্দ্র উদিত হইলেন। তখন বিশ্বরূপ প্রায় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

এইখানে বিশ্বরূপের শেষ জীবনের কথা কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক।

হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে বালক বিশ্বম্ভর মাতৃ আজ্ঞায় ভোজন জন্য জ্যেষ্ঠকে ডাকিতে যাইতেন এবং জ্যেষ্ঠের হস্ত ধরিয়া লইয়া আসিতেন। উভয় ভ্রাতার কমনীয় সৌন্দর্য্য ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহারা সামান্য বালক নহেন। এইরূপে কতকদিন কাটিয়া গেলে জগন্নাথ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম লক্ষ্য করিয়া বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপ সংসারে অনাসক্ত; এক্ষণে পরম্পর পরিণয়ের কথা শুনিতে পাইয়া রাত্রিযোগে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ পিতামাতাকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গেলেন; এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রজ্যা করতঃ দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটে সন্ন্যাস লীলা সম্বরণ করিলেন।

এই সময়ে নবদ্বীপে যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতেন ও ভবিষ্যতে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সর্ব্ব প্রধান পার্ষদ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এখানে তাঁহাদের জীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু কিছু বলিয়া রাখা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই সকলের মধ্যে অদ্বৈত বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ ছিলেন। শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী নবগ্রামে কুবের পণ্ডিত নামে এক বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী নাভাদেবী। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মে। পুত্রের নাম কমলাক্ষ রাখা হইয়াছিল। কমলাক্ষের শৈশবাবস্থাতে কুবের পণ্ডিত পৈতৃক বাস পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাবাসের জন্য শান্তিপুরে উঠিয়া আইসেন। ক্রমে কমলাক্ষ কৃতবিদ্য হইলে কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবী পরলোক গমন করেন। পিতৃকৃত্য উদ্দেশে পুত্র গয়াগমন করিলেন এবং নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুদিন পরে নৃসিংহ ভাদুড়ী নামে ব্রাহ্মণ শ্রীদেবী ও সীতা দেবী নাম্নী স্বীয় কন্যাদ্বয় তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। কমলাক্ষ টোল খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে এক জন ভগবৎ পরায়ণ সাধু পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বোধে ভক্তি ও পূজা করিত। ঈশ্বর হইতে দ্বৈত বা ভেদ না থাকা বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত হইয়াছিল; এবং আচার্য্য স্বরূপে ভক্তিশাস্ত্রের

ব্যাখ্যা করিতেন বলিয়া 'আচার্য্য' উপাধি যুক্ত হয়। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাটী ছিল। বোধ হয়, অধ্যাপনা উপলক্ষেই নবদ্বীপে বাসস্থান হয়। যাহা হউক শ্রীচৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণ যত্নে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। ভক্তিধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য মঠের প্রধান সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আগমন করেন ও অদ্বৈতকে দীক্ষিত করিয়া যান। সেই হইতে অদ্বৈতের ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। চতুর্দ্দিকে ভক্তিহীন শুষ্ক ক্রিয়াকাণ্ডে রত লোকদিগকে দেখিয়া করুণহৃদয় অদ্বৈত বড় ব্যথিত হইতেন এবং ভগবানের অবতারণার জন্য সর্ব্বদাই সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। কথিত আছে যে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ও অধর্ম্ম বিনাশের জন্য শীঘ্রই ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। এই আশায় আশান্বিত হইয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী গঠনপূর্ব্বক সর্ব্বদা গীতা ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত সদালাপ ও সঙ্কীর্ত্তনে কাল অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পত্নী সীতাদেবীও স্বামীর ন্যায় ভক্তিমতী ও পবিত্রচারিণী ছিলেন।

অদ্বৈতের ভক্তগোষ্ঠির মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত একজন প্রধান। ইনি ও ইহার অপর তিন সহোদর শ্রীরাম, শ্রীপতি, ও শ্রীনিধি পণ্ডিতও চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে ভক্তিপথাবলম্বী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আদিবাস কুমারহট্টে বা বর্ত্তমান হালিসহরে ছিল। কোন কারণ বশতঃ ইঁহারা সপরিবারে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতেন এবং প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেন বলিয়া নগরবাসী অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল এবং সুযোগ পাইলে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িত না। দেবানন্দ পণ্ডিত নামে নবদ্বীপে একজন বিখ্যাত ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র ভাগবত পাঠ করিত; কিন্তু তিনি ভাগবতের ভক্তিপক্ষে কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহার টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণচরিত্র শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া বহুল পরিমাণে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। দেবানন্দের তরলমতি শিষ্যগণ পাঠের

ব্যাঘাত হয় দেখিয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। দেবানন্দ উপস্থিত থাকিয়াও নিষেধ করেন নাই, এই অপরাধে উত্তরকালে চৈতন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা হউক শ্রীবাস পণ্ডিত লোকের এতই বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন যে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ ত্যাগের পর পুনরায় কুমারহট্টে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থিতি কালে শ্রীবাসভবনই চৈতন্যের বিলাসের প্রধান স্থান ছিল। শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীও স্নেহময়ী ও উদারমতী ছিলেন।

গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বনমালী আচার্য্য এবং আরও অনেকানেক ব্যক্তি এই বৈষ্ণব দলের সভ্য ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপের মাধব মিশ্রের পুত্র। শৈশব সময় হইতেই ইনি সংসারে বিরক্ত হইয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন এবং স্থির কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী হইয়া আজীবন ধর্ম্মানুশীলনেই অতিবাহিত করেন। ইনি চৈতন্যের একজন প্রিয়সুহৃদ ও প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

নবদ্বীপের কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলে মুরারি গুপ্তের জন্ম হয়। ইঁহাদিগকে গুপ্ত বেজ বলিত। এক্ষণেও নবদ্বীপে বেজপাড়া বলিয়া একটী পল্লী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নামানুসারে ঐ পল্লীর নাম হইয়া থাকিবে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহাকে বৈষ্ণবেরা হনুমানের অবতার বলিয়া থাকেন। ইনি চৈতন্যের প্রথম জীবনের এক কড়চা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দ দত্ত—ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্টে। ইনি চৈতন্যের সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। যখন বিশ্বম্ভর বিদ্যামদে মত্ত, ইনি তখন হইতেই শান্ত ও শুদ্ধভাবে হরিভক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন। একত্র অধ্যয়ন হেতু মুকুন্দ ও সঞ্জয়ের সহিত বাল্যকাল হইতেই চৈতন্যের সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

শ্রীমান্ পণ্ডিত—নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীচৈতন্যের মনের ভাব পরিবর্ত্তনের কথা ইনি বৈষ্ণবসমাজে প্রথমে জানাইয়াছিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপবাসী জনৈক ভিক্ষুক। চৈতন্যের জন্মের

বহু পূর্ব্ব হইতে ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। গয়া হইতে আগমনের পর ইহারই গৃহে সর্ব্ব প্রথমে চৈতন্যদেব আপন মনের পরিবর্ত্তিত ভাব বন্ধুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও কোন সময়ে ইহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া খাইয়াছিলেন ; এবং অপর সময়ে ইহার পাক করা অন্ন চাহিয়া খাইয়াছিলেন।

বনমালী আচার্য্য—নবদ্বীপস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ। কোন সময়ে রাজকীয় আদেশে ইহার বাটী কাটিয়া উঠাইয়া দিবার ও স্ত্রীলোকদিগকে অসম্ভ্রম করিবার দণ্ড প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ রাত্রিযোগে সপরিবারে পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন ; কিন্তু ঘাটে খেয়ার নৌকা না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া বেড়াতেছিলেন ; কথিত আছে যে এমন সময় স্বয়ং ভগবান্ খেয়ারীর রূপ ধরিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী করিয়া ইহাকে পার করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সকল লোক ব্যতীত নবদ্বীপে আরও অনেক লোকের সহিত চৈতন্যের বহুতর সম্পর্ক ছিল। এস্থানে তাঁহাদের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান নামে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে তাঁহার টোল ছিল এবং বুদ্ধিমন্ত তাঁহার একরূপ মুরুব্বি ছিলেন। চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহের সমস্ত ব্যয় বুদ্ধিমন্ত খান সরবরাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য চৈতন্যের আত্মীয় ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং চৈতন্য ইহাকে পিতৃসম্বোধন করিতেন। কোন সময়ে ইহারই বাটীতে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বিবিধ সাজ সাজিয়া গীত বাদ্য ও নৃত্য সংযোগে শ্রীচৈতন্য নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য নামে ব্রাহ্মণের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরাঙ্গের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। বনমালী আচার্য্য এই বিবাহের ঘটকালী করিয়াছিলেন। সনাতন পণ্ডিত নামে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় পরিণয় সম্পন্ন হয়। সনাতন রাজপণ্ডিত ছিলেন ; কাশীনাথ মিশ্র দ্বিতীয় বিবাহের ঘটক ছিলেন। শ্রীধর নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি নবদ্বীপে তরকারী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত ; লোকে তাঁহাকে "খোলা বেচা শ্রীধর" বলিত। বিদ্যামদে মত্ত হইয়া যখন নিমাই পণ্ডিত সকলের সঙ্গেই বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখনও সময়ে সময়ে তিনি শ্রীধরের ভগ্ন কুটীরে আসিয়া তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেন। শ্রীধরকে তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন

যে. যদি শ্রীধর প্রত্যহ তাঁহাকে থোড় কলা মোচা আদি না দেন, তবে তাহার যে গুপ্ত সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহা সকলকে বলিয়া দিবেন। শ্রীধর একজন অতি সরল প্রকৃতি সাধু পুরুষ ছিলেন। নগর সংকীর্ত্তনান্তে গৌরাঙ্গ ইহার ফুটা লৌহ পাত্রে জল পান করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের বাটীতে মহা প্রকাশের দিন চৈতন্য দেব ইহাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের বাসস্থান যদিও নবদ্বীপে নহে, তথাচ শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার কেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা বিবেচনায় এস্থানে তাঁহারও কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত এক চাকা বীরচন্দ্রপুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হাড়ো ওঝা, দ্বিতীয় নাম মুকুন্দ পণ্ডিত ; মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী। নিত্যানন্দ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার কিশোর বয়সের সময় তাঁহাদের বাটীতে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিল। বালকটীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া অভ্যাগত সন্ন্যাসী কৌশল ক্রমে হাড়ো ওঝাকে সত্যে আবদ্ধ করত বালকটীকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন এবং আপনার চেলা করিয়া নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং লোক মুখে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ এবং হরিনাম প্রচারের বার্ত্তা পাইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। নিতাই মহা প্রেমিক, সরল এবং করুণহৃদয় ছিলেন। চৈতন্য ইহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য করিতেন। তাঁহাকে পাইয়া শচী দেবী কথঞ্চিৎ বিশ্বরূপের শোক সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে যে বিশ্বরূপের অন্তর্ধানের পর তদীয় তেজঃ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল সেজন্য ইনি ও বিশ্বরূপ অভিন্নাত্মক। নবদ্বীপে অবস্থিতি কালে ইনি শ্রীবাসালয়ে থাকিতেন। শ্রীবাসের পত্নী পুত্র জ্ঞানে ইহাকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া দিতেন। নিত্যানন্দ হরি প্রেমে মগ্ন থাকিয়া বালকের ন্যায় আচরণ করিতেন; কখন গঙ্গায় সাঁতার দিতেন, কখন দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতেন; এবং কখন বন্ধুদিগকে প্রহার করিতেন ও ভোজন কালে সকলের পাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়া দিতেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলে নিত্যানন্দ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে যুক্তি করিয়া ধর্ম্ম প্রচারার্থে তাঁহাকে

বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন। নিতাই অভিরাম দাস প্রভৃতি পরিকরগণে বেষ্টিত হইয়া প্রথমে পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আলয়ে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে এঁড়িয়াদহে গদাধর দাস গোস্বামীর ভবন হইয়া খড়দহে গমন করিলেন। খড়দহ গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া নিতাই মনে মনে সেইখানে স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ স্বর্ণবণিকগণকে কৃপা করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আগমন করিলেন ও সেখানে কিছুদিন অবস্থিতি করতঃ নবদ্বীপে শচীমাতার নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার দারপরিগ্রহের ইচ্ছা হইলে বড়গাছীনিবাসী রাজা হরিহোড়ের বংশোদ্ভব কৃষ্ণদাস নামে তদীয় জনৈক শিষ্যের চেষ্টায় বড়গাছীর নিকটবর্ত্তী সালিগ্রামের সূর্য্যদাস সরখেলের দুহিতাদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবাদেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। সূর্য্যদাস পণ্ডিত একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি, গৌড়ের বাদসাহের চাকরী করিয়া বিপুল ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন ও সরখেল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি সহোদর সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সেই হইতে নিত্যানন্দ শিষ্যবর্গের মধ্যে গণ্য হইলেন। নিত্যানন্দ ইহার পর পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে কিছুদিন নদীয়ায় অবস্থিতি করতঃ খড়দহে বাস করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে বলরামের ও লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে যবন হরিদাস একজন অতি উচ্চঅঙ্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি বিস্ময়জনক ও অলৌকিক; সে জন্য এখানে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা যাইতেছে। চৈতন্য জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যায় নিমগ্ন আছেন, শিষ্যগণ কেহ বা শুনিতেছেন, কেহ বা ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে শ্মশ্রুধারী এক সুদীর্ঘ যুবা হরিনাম গান করিতে করিতে, পুলকাশ্রু প্রেমে গদ গদ হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলায় ও হস্তে হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, নয়নে দর দরিত ধারা বহিতেছে, এবং মুখশ্রীতে যেন চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মনে হইল স্বর্গ হইতে যেন কোন দেবতা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন; জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, তাঁহার জন্ম

যবন কুলে, নাম হরিদাস, নিবাস বূঢ়ন গ্রামে। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে হরিদাসের মহাভাবের আবেশ হইল; তাহা দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য নহে। তদবধি তিনি অতিযত্নের সহিত হরিদাসকে নিজালয়ে রাখিয়া দিলেন। শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য এক গোফা নির্ম্মিত হইল। তিনি সেখানে নামানন্দসুখে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের গৃহে ভোজন করিতেন এবং সময়ে সময়ে নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইতেন। বৈষ্ণবেরা ইহাকে প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

তাঁহার পূর্ব্ব জীবন অতি কৌতুকজনক ও নানা প্রকার ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। বূঢ়নগ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই শুষ্ক মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার বীতরাগ ও প্রেমভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থা জন্মিয়াছিল। কি প্রকারে ও কাহার সংসর্গে পড়িয়া তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল ও কেই বা তাঁহাকে হরিদাস নাম প্রদান করিল, বৈষ্ণবেতিহাসে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, পিতা-মাতা তাঁহার হিন্দুয়ানি দৃষ্টে তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বাটী হইতে বাহির হইয়া হরিদাস কোন নির্জ্জন বেণাবোনের মধ্যে গোফা নির্ম্মাণ করতঃ হরিনাম সাধন আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র খান্ নামে সেই দেশের এক অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার ছিল। সে হরিদাসের কঠোর তপস্যার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে এক সুন্দরী ও যুবতী বেশ্যাকে রাত্রি যোগে তাঁহার গোফায় প্রেরণ করিল। বেশ্যা যাইয়া হরিদাসকে জানাইল যে, সে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম না করিয়া কাহার সহিত আলাপ করিতেন না; সুতরাং বেশ্যাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলেন যে, নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তিনি তাহার সহিত আলাপ করিবেন। এদিকে নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; তখন সেই বারবনিতা ভগ্নোদ্যম হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল, ও আপন প্রভুকে সমস্ত অবগত করিল। পাপমতি রামচন্দ্র ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তৎপর দিন রাত্রিতে আবার ঐ বারনারীকে প্রেরণ করিল। সে দিন হরিদাস

তাহাকে বলিলেন; 'কল্য বড় দুঃখ পাইয়াছ, অদ্য নাম সাঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, অবশ্য তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা তচ্ছ্রবণে গোফার দ্বারদেশে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে আপনিও দুই চারিবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে দিনও নামসমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই নিশাবসান হইয়া গেল। তৃতীয়রাত্রিতে বেশ্যা আসিলে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, 'এক মাসে এককোটি হরিনাম জপ করিবার ব্রত লইয়াছি, মনে করিয়াছিলাম কল্যই নাম শেষ হইবে, তাহা হইয়া উঠে নাই ;-আজ নিশ্চয় সাঙ্গ হইবে; তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সহিত আলাপ করিতে পারিব।' বেশ্যা পূর্ব্ববৎ দ্বারদেশে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল ও আপনিও মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম ভাবে নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। সাধু সঙ্গের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! এইরূপ করিতে করিতে বেশ্যার মন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন সে আপনার কুৎসিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং হরিদাসের চরণতলে কাঁদিয়া পড়িয়া রামচন্দ্র খানের চরিত্র আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল। হরিদাস বলিলেন "তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি এবং এদেশ পরিত্যাগ করিয়াও যাইতাম, কেবল তোমার জন্য এই তিন দিন এখানে রহিয়াছি।" তখন সেই বেশ্যা নিজ পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর হরিদাস তাহাকে বলিলেন যে, 'তোমার যথাসর্ব্বস্ব দীনদরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া এই গোফার মধ্যে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে হরিনাম সাধন কর, অবশ্য মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা তাহাই করিল এবং মস্তক মুণ্ডন করতঃ একবস্ত্রা হইয়া নামসাধন করিতে আরম্ভ করিল। ঈশ্বর কৃপায় অচিরাৎ সে রিপুদমনে সমর্থা হইয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়া উঠিল।

হরিদাস সেখান হইতে চাঁদপুর গ্রামে বলরামাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। বলরাম সপ্তগ্রামের পুণ্যশীল জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ছিলেন। তিনি হরিদাসের সৌম্যমূর্ত্তি ও ভক্তিভাব দেখিয়া তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। এইখানে হিরণ্যের পুত্র বালক রঘুনাথ দাস হরিদাসের দর্শন পান ও এই সাধুসঙ্গগুণে ভবিষ্যতে হরিভক্তি পাইয়া উদ্ধার হইয়া যান। এইস্থানে অবস্থিতি করার সময় বলরাম একদিন হরিদাসকে জমিদারের সভায় লইয়া গেলেন। হরিদাসের সাধুব্যবহারে ও সুমিষ্ট আলাপে সভাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলেই

তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলেন; এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিলেন। কেবল গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি অসাধু ব্যবহার করিয়াছিল। এই ব্যক্তি মজুমদারদিগের ঘরে আরিন্দাগিরি করিত এবং গৌড়ে বাদসাহের দরবারে যাতায়াত করিত। হরিদাস 'নামাভাসে মুক্তি হয়,' এই ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যক্তি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, 'আপনারা এই ভাবুকের কথা শুনিবেন না, কোটি জন্ম ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হয় না, তাহা কি নামাভাসে হইতে পারে? তাহা যদি হয়, তবে আমার নাক কাটিব।' হরিদাস দার্ঢ্য সহকারে উত্তর করিলেন, 'যদি না হয়, তবে আমার নাক কাটিব।' তচ্ছ্রবণে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল ও অশেষ প্রকারে গোপাল চক্রবর্ত্তীর নিন্দা করিতে লাগিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও সেই দিন হইতে গোপালকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। সভাসদ্‌গণ গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষমা করিবার জন্য হরিদাসকে অনুরোধ করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আপনারা কিছু মনে করিবেন না। এই ব্যক্তির উপর আমার কোন রাগ নাই। এ তর্কনিষ্ঠ; তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নামের মহিমা কি বুঝিবে?' কথিত আছে যে, কিছুকাল পরে ঐ ব্যক্তির কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়াছিল; তাহাতে লোকে মনে করিল যে, ভগবদ্ ভক্তের অপমান করার জন্য, ভগবান্ তাহাকে ঐ দণ্ড দিলেন।

চাঁদপুর হইতে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, আপামর সাধারণ সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিত। কেবল স্থানীয় কাজি তাঁহার হিন্দুর আচার ব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত বিরক্ত হইল ও তাঁহার প্রতি নানাপ্রকারে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ঐ গোঁড়া কাজি দেশাধিপতির নিকট তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ আনিল যে, হরিদাস মুসলমান হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ হিন্দুর আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন। দেশাধিপতির সম্মুখে নীত হইলে, হরিদাস অকুতোভয়ে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রেরিত পিতরও দণ্ডভয়ে আপন অভীষ্ট দেবকে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং ক্রুশে হত ধর্ম্মবীর ঈশাও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া একবার আত্মবিচ্যুত হইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মসিংহ হরিদাস যবনের দণ্ডভয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বিচারের পূর্ব্বে তাঁহাকে এক কারাগারে রাখা হইল। সেখানে আরও

কতগুলি বন্দী ছিল। ভগবদ্ভক্ত সাধু হরিদাসের আগমনে তাহাদের মনে আশ্বাস হইয়াছিল যে, তবে বুঝি তাহাদেরও কারামুক্তির সময় আগত প্রায়। এই ভাবিয়া তাহারা হরিদাসকে বন্দনা করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। হরিদাস তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন :—

'থাক থাক এখন আছহ যেইরূপে ;
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।'

তাঁহার ঈদৃশ নিষ্ঠুর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বন্দীগণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন ভক্ত হরিদাস তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তাঁহাদের এখন যেরূপ ঈশ্বরে মতি হইয়াছে, এইরূপ সমস্ত জীবন যেন থাকে ; তিনি এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এবং আরও কহিলেন যে, অচিরাৎ তাঁহাদের কারামুক্তি হইবে, কিন্তু তাঁহারা যেন পীড়ন ও অত্যাচার না করিয়া শান্তভাবে জীবন যাপন করেন।'

পরদিন রাজসমক্ষে নীত হইলে যবনাধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ওহে ভাই ! তোমার এ কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে ? কত ভাগ্যে দেখ তুমি মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তোমার কি হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ? হিন্দু কাফের, হিন্দু ধর্ম্মহীন, আমরা হিন্দুর দর্শনেও আহারাদি করি না ; তুমি কেমন করিয়া এই মহা গৌরবান্বিত বংশমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাও ? পরম পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি কাফেরের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিবে ? অতএব আমার অনুরোধ রাখ ; না বুঝিয়া যে পাপ কার্য্য করিয়াছ, কলমা পড়িয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর।"

হরিদাস মায়ামুগ্ধ রাজার কথা শুনিয়া 'অহো বিষ্ণুমায়া !' বলিয়া একটু হাসিলেন এবং বিনীত অথচ নির্ভয়ভাবে উত্তর করিলেন "জাঁহাপনা ! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন হিন্দু ও মুসলমানের একই ঈশ্বর কি না ? যিনি হিন্দুকে ধর্ম্মজ্ঞান দিয়াছেন, মুসলমানও তাঁহা হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়াছে কি না ? তাহা যদি হয়, তবে হিন্দু ও যবন কেবল নামভেদে ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকে মাত্র। ধর্ম্মের চরমফল হিন্দুরও যাহা, মুসলমানেরও তাহাই। এক শুদ্ধ অখণ্ড নিত্যসত্য বস্তু বিশ্বরাজ্য পরিপূর্ণ করিয়া জীবমাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সেই প্রভু যাহাকে যেমন বুদ্ধি দিতেছেন, সে সেইরূপ আচরণ করিতেছে। আমার হৃদয়ে লোকরঞ্জন

বসিয়া যেমন মতি দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করিতেছি।' ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে অনেকে মুসলমান হইতেছেন, কই হিন্দুরা তাহার সম্বন্ধে কি করিতেছে? যে ব্যক্তি আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক মরিবে, তাহাকে মারিয়া কি লাভ?'

এই যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ কথা শুনিয়া যবনপতি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পার্শ্বস্থ কাজিগণ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, যদি হরিদাসের দণ্ড না হয়, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টান্তে ও কুমন্ত্রণায় অপরেও মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। তখন যবনাধিপতি হরিদাসকে কলমা পড়িয়া পুনরায় স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, অথবা বিধর্ম্মীর প্রতি সমুচিত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে, ইহার অন্যতরটী মনোনীত করিতে পারেন বলায়, ধর্ম্মবীর হরিদাস বলিতে লাগিলেন;—

'খণ্ড খণ্ড এই দেহ, যায় যদি প্রাণ;
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।'

তখন নিষ্ঠুর কাজীগণ পরামর্শ করিয়া হরিদাসের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিল যে, বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করা হউক, এবং আরও বলিল যে 'যদি তাহাতেও উহার মৃত্যু না হয়, তখন বুঝা যাইবে যে, ও যাহা বলিতেছে তাহা সত্য বটে।' পাইকগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র বন্ধন করতঃ তাঁহাকে বাজারে বাজারে সাধারণের সম্মুখে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। কথিত আছে যে, হরিদাস তখন নামানন্দে নিমগ্ন হইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় শত্রু নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন এবং কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁহার দণ্ডদাতাদিগের ভীষণ পাপের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "প্রভো! ইহারা জানে না যে কি পাপ করিতেছে।" তাঁহার জন্য সর্ব্ব সাধারণ লোকে হায়! হায়! করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে এবং নানাপ্রকারে নবাবকে শাপ দিতে লাগিল। পরে তিনি ধ্যানযোগে মহাসমাধিতে মগ্ন হইলে যবনগণ মনে করিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্তিকা প্রোথিত করিলে তাঁহার সদ্গতি হইবে বিবেচনায়, তাঁহার দেহ নদীতে নিক্ষেপ করা স্থির হইল। কথিত আছে যে, নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঠাকুর হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে পুনরায় সেই যবনাধিপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন যবনরাজ তাঁহাকে মহাপীর জ্ঞান করিয়া অশেষ

আকারে তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিলেন ও তাঁহার স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছ গমনের আদেশ দিলেন।

এই প্রকারে ঠাকুর হরিদাস রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় যবনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ গান করিতে করিতে ফুলিয়া নগরে ব্রাহ্মণ সজ্জন মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ফুলিয়াবাসী সকল লোকেই পরম আনন্দ লাভ করিল ও আনন্দ-সূচক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিদাসও মহানন্দে তাঁহাদের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে "আপনারা আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। আমি অনেক সময় ঈশ্বরনিন্দা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে জন্য প্রভু আমাকে এই শাস্তি দিলেন। ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত আছি; কারণ কুম্ভীপাক নরকভোগ না করাইয়া তিনি যে আমাকে এত অল্প দণ্ড দিলেন, ইহা তাঁহার অতীব কৃপা বলিতে হইবে"। তদবধি তিনি গঙ্গাতীরে গোফামধ্যে থাকিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর এই গ্রামে এক দিন কোন ভদ্র ব্যক্তির বাটীতে ডঙ্কের নৃত্য হইতেছিল। তৎকালে এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বাঙ্গে অহিভূষা ধারণ করিয়া গীত বাদ্যের সংযোগে নৃত্য করিয়া বেড়াইত; তাহার নাম ডঙ্কের নৃত্য। ডঙ্ককে তখন দেবাধিষ্ঠিত বোধে লোকে ভক্তি ও ভয় করিত। হরিদাসও ঐ নৃত্যের স্থলে ছিলেন। কৃষ্ণের কালিয়দহের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত হইতেছিল; হরিদাস শুনিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে ডঙ্কের গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, ডঙ্ক তাঁহাকে কিছু না বলিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। তদ্দৃষ্টে এক দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণ যুবক বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কৃত্রিম ভাবে নৃত্য করিতে করিতে ঐ ডঙ্কের উপর যাইয়া যখন পড়িল, অমনি ডঙ্ক তাহাকে নির্ঘাৎ প্রহার করিতে লাগিলেন। সে ব্রাহ্মণ বাপ! বাপ! করিয়া পলাইয়া গেল। সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, অহিভূষাধারী ডঙ্ক বলিলেন যে, 'ভগবদ্‌ভক্তকে পরিহাস করিয়া ঐ ব্যক্তি যে কৃত্রিমভাব দেখাইল, সেজন্য উহাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া দিলাম।'

হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন। দুষ্টবুদ্ধি লোকদিগের তাহা ভাল লাগিত না। তাহারা সাধুভক্তের বিদ্রূপ করিয়া কত কথাই বলিত। কেহ বলিত 'এ পাষণ্ড বেটারা রাজ্য ছারেখারে দিবে, ইহাদের

অন্ত দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে। এক্ষণে বিষ্ণুশয়নের সময়; এখন কি উচ্চ ডাক ডাকিতে আছে? হরির নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ পাঠাইয়া দিবেন।' কেহবা বলিত 'আরে ভাই! যদি ধানের দাম কিছু চড়ে, তবে এ বেটাদের ঘাড় ধরিয়া কিলাইয়া দিব'। একদিন হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'ওহে হরিদাস! বলি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর কেন? চুপ করিয়া নাম করিলে কি ফল হয় না? কোন্ শাস্ত্রে ডাকিয়া নাম লইতে বলিয়াছে?' হরিদাস বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, 'ঠাকুর! আমি শাস্ত্রতত্ত্ব কিছুই জানি না। তোমরা ব্রাহ্মণ; তোমরা শাস্ত্রমত সকল অবগত আছ। তোমাদের মুখে শুনিয়া আমার যাহা কিছু শিক্ষা।' এই বলিয়া তিনি বলিলেন, "উচ্চ কীর্ত্তন করিলে শতগুণ ফল হয়'। বিপ্র বলিলেন, কেন? হরিদাস বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রহ্লাদোক্ত বচন অনুসরণ করিয়া উত্তর করিলেন, "নীরবে যে নাম করে, তাহার কেবল পুণ্য হয়; কিন্তু উচ্চ স্বরে নাম করিলে শ্রোতাদেরও পুণ্য হইয়া থাকে। পরোপকার করার এরূপ ক্ষমতা থাকিতে মানুষের কি পরোপকার করা কর্ত্তব্য নহে? মনে করুন, দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন কেবল আপনাকে পোষণ করে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সহস্র লোকের ভরণপোষণের ভারবহন করে; বলুন দেখি এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে'? এই কথা শুনিয়া বিপ্র তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল যে "ব্রাহ্মণে শাস্ত্র বুঝে না, এক্ষণে হরিদাস শাস্ত্রকর্ত্তা হইয়াছে। হায়! কালে কতই হইবে, কথিত আছে যে যুগশেষে যে সে বেদোচ্চারণ করিবে, এ যে তাহাই হইল" ইহা বলিয়া—হরিদাসকে বলিল, 'তুই বেটা যাহা ব্যাখ্যা করিলি তাহা যদি সত্য না হয়, তবে তোর নাক কাটিব'। সাধু হরিদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কথিত আছে কিছু দিন পরে বসন্তরোগে এই ব্যক্তির নাক খসিয়া পড়িয়াছিল।

এইখান হইতে হরিদাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নবদ্বীপে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবদলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরে আচার্য্যের সহিত শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন যে, পিতৃবাসরে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধ পাত্র তাঁহাকে ভোজন করিতে দিতেন।

ইহাতে হরিদাস তাঁহাকে বলিতেন "তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ, কুটুম্বসাক্ষাৎ লইয়া গৃহস্থালি করিতেছ; আমি যবন, আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিও না, করিলে তোমার জাতি নষ্ট হইবে।" অদ্বৈত তাহার উত্তর করিতেন "তোমাকে ভোজন করান, বেদপরায়ণ সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের ফল হইতেও শ্রেষ্ঠ।"

হরিদাসের সাধন অতি কঠোর ছিল। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরি-নাম জপ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। এইরূপে ভক্ত হরিদাস হরিনাম-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তখনও কিন্তু চৈতন্য দেব অবতীর্ণ হন নাই।

হরিদাস ঠাকুর যবনকুলোদ্ভব হইয়াও পরম ভক্ত হইয়াছিলেন; সমস্ত বৈষ্ণবসমাজ এখনও অবনত মস্তকে তাঁহার গুণগান করিতেছে ও চৌষট্টি মহন্তের মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে ও ভোগ দিতেছে। বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ তাঁহার জাতি সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে,
জন্মিলেন নীচ কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়,
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব বেদে কয়।
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে;
কুলে তার কি করিবে? নরকেতে মজে।
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে,
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।
প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপী হনুমান;
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম।"

হরিদাস ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের পরজীবনের ইতিহাস চৈতন্য-চরিত্র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জন্মোৎসব ও বাল্য জীবন।

চৌদ্দশত ছয় শকের মাঘ মাসের শেষে জগন্নাথপত্নী শচী দেবীর গর্ভ সঞ্চার হইল। কথিত আছে যে গর্ভাবস্থায় শচী জগন্নাথ আশ্চর্য্য দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন জগন্নাথ স্বপ্ন দেখিলেন যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। শচী দেবীও দেখিতেন যেন আকাশ মণ্ডলে দিব্য-মূর্ত্তি লোক সকল তাঁহার বন্দনা করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া উভয়ে অনুমান করিতেন, এবারে বুঝি কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করি-বেন। মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্তে এরূপ অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জ ভূরি ভূরি বিবৃত হইয়াছে। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমুদায় মহাপুরুষের সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত ঘটনাবলী দেখা যায়। এই সকল ঘটনার মূলে কতটুকু সত্য আছে, মীমাংসা করা বড় কঠিন। তবে ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মহাপুরুষগণের পর জীবনের অলোকসামান্য ঘটনার আলোকে বসিয়া তাঁহাদের জীবনেতিহাসলেখকগণ তাঁহাদের চরিত্র যে নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্রমে ক্রমে শচীর গর্ভ ত্রয়োদশ মাসে পরিণত হইল, তথাচ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। তদ্দর্শনে পিতা মাতার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে অধিককাল আর সন্দিগ্ধাবস্থায় থাকিতে হইল না। ফাল্গুনমাসের পৌর্ণমাসীর সান্ধ্যরজনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। দৈবযোগে সেই দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল; পুর-বাসীগণ চারিদিকে হরিধ্বনি করিতেছিল, এবং আনন্দ কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হইতেছিল; এই শুভক্ষণে জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ভাবিজীবনে চৈতন্য প্রভু হরি-নাম প্রচার করিবেন বলিয়া, হরিনামের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আবির্ভূত হইলেন, এবং নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট হইবে, সকলঙ্ক চন্দ্রের আর প্রয়োজন নাই ভাবিয়া রাহু যেন আকা-

শের চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার লগ্ন গণিয়া সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গে মহাপুরুষের বত্রিশটী চিহ্ন * দেখিয়া বলিলেন যে, এই বালক হইতে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলেরই উদ্ধার সাধন হইবে।

বালকের জন্মগ্রহণের পর জগন্নাথগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হইল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলে নানা উপহার লইয়া বালকটিকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। নর্ত্তক, বাদক, ভাটে আঙ্গিনা পরিপূর্ণ হইয়া গেল, এবং চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল। মিশ্র পুরন্দরও যথাসাধ্য দানধ্যান করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পত্নী, শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবী, অন্যান্য প্রবীণা পুরনারীগণে পরিবৃতা হইয়া ধান্য দূর্ব্বা গোরচন দিয়া বালকের রক্ষা বন্ধন করিলেন; নবীনারা হাস্য পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, এবং অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া দোলারোহণে বালককে দেখিতে আসিলেন। তৎকালে সকলেরই ভূতপ্রেত ডাকিনীতে বিশ্বাস ছিল, তাহাদিগের উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরন্ধ্রীগণ পরামর্শ করতঃ শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। 'নিমাই' নামের সহিত ভূত প্রেতের কি সম্বন্ধ, তাহার কোন ব্যাখ্যা মহিলাগণ আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই; কিন্তু তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ঐ নামে ভূতের ভয় থাকিবে না। যাহাহউক, পুরন্ধ্রীগণ কয়েক দিন পর্য্যন্ত শচীগৃহে অবস্থিতি করিয়া পুত্রমাতা মঙ্গলজলে স্নান করিলে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, চৈতন্যের পরজীবনের ভক্তগণ এই সময়েই মনোবলে তাঁহার অবতারভাবের কথা জানিতে পারিয়া স্ব স্ব রুচি অনুসারে নানা রূপ মহোৎসব করিয়াছিলেন। না পারিবেনই বা কেন? কারণ তাঁহারা সকলেই স্বর্গের দেবতা, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কলিযুগের যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও চৈতন্যচন্দ্রের লীলার সাহায্য করিবার জন্য মানব রূপে অবতীর্ণ

---

* পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্।
সামুদ্রিক।

হইয়াছিলেন। এইরূপে অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলেই গ্রহণের উপলক্ষ করিয়া নানা দানধ্যান ও নামকীর্ত্তন করিয়া গৌরচন্দ্রের জন্মমহোৎসব করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিশেষ লিপিচাতুর্য্য দেখা যায়। কারণ দেশের প্রথানুসারে সকলেই গ্রহণের সময় যথাসাধ্য দানাদি ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চৈতন্যভক্তগণ এই ঘটনাকে চৈতন্যের অবতারত্বস্থাপন জন্য অনুকূল ব্যাপার করিয়া লইয়া বিলক্ষণ ভাবুকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নচেৎ ইহার মূলে যে কোন সত্য আছে, তাহা অনুমান করা যায় না। কারণ, যদি অদ্বৈতাদি ভাবিভক্তগণ এই সময় হইতেই অবতারের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে গয়াগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা নিমাই পণ্ডিতকে কেন সেরূপ চক্ষে দেখিতে পান নাই, তাহা বুঝা যায় না।

জনক জননীর হৃদয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বালকচন্দ্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অঙ্গকান্তির গৌরত্ব নিবন্ধন স্ত্রীগণ শিশুটীকে গৌরাঙ্গ ও কখন গৌরচন্দ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; আর তাঁহারা হাতে তালি দিয়া হরিধ্বনি করিলে বালক হাসিত এবং ক্রন্দন আরম্ভ করিলে হরিনাম শুনিতে পাইলে শিশুর ক্রন্দন থামিত, এজন্য মহিলাগণ গৌরহরি নামেও অভিহিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এক দিন জনক জননী গৃহমধ্যে লঘুপদচিহ্ন সকল অঙ্কিত রহিয়াছে এবং তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র ও মীন চিহ্ন শোভা পাইতেছে দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মিশ্র একজন বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন; তিনি অনুমান করিলেন যে, ঘরে বালগোপাল দেববিগ্রহ রহিয়াছেন; বোধ হয় তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে ঐরূপ পদচিহ্ন ফেলিয়া থাকিবেন। এই সময়ে শচী দেবী পুত্রকে স্তনপান করাইতেছিলেন। তিনি পুত্রের পদতলে হঠাৎ ঐ সকল চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং জগন্নাথকে তাহা দেখাইলে তিনি নীলাম্বরকে ডাকিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্যায় বড় পারদর্শী ছিলেন; তিনি গণিয়া বলিলেন যে, নারায়ণের পদচিহ্নে চিহ্নিত এই পুত্র হইতে জগৎ উদ্ধার হইবে। এই বলিয়া শুভদিন দেখিয়া তিনি যথা বিধি বালকের নাম করণ করিলেন, এবং 'বিশ্বম্ভর' এই নাম রাখিলেন।

ক্রমে ক্রমে শচীনন্দন জানুচংক্রমণ ও পদচংক্রমণ করিতে শিখিলেন। এই সময়ে একদিন শচীদেবী খই ও সন্দেশে বাটী পূর্ণ করিয়া বালককে

খাইতে দিয়া আপনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; কিন্তু বালক খাদ্য-দ্রব্য ফেলাইয়া দিয়া মৃত্তিকা খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে শচী তাহা দেখিতে পাইয়া বালকের হস্ত হইতে মৃত্তিকা কাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! মাটী খাইতেছ কেন?" বালক যাহা উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া শচী অবাক্ হইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন—'মা! বিবেচনা করিয়া দেখ সকলই মাটীর বিকার মাত্র; খই, সন্দেশ, অন্নাদি যত কিছু আহারীয় দ্রব্য সকলই মৃত্তিকার অবয়বান্তর। তবে মাটী খাইতেছি বলিয়া কেন ক্ষুণ্ণ হইতেছ?" শচী আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'এ জ্ঞান-যোগ তোরে কে শিখাইল? মাটীর বিকার অন্নাদি খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, কিন্তু মাটী খাইলে রোগ জন্মে, শেষে শরীর নষ্ট হয়; আবার দেখ মৃত্তিকা বিকৃত হইলে যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাতে কত জল রাখা যায়; কিন্তু শুধু মৃত্তিকায় জল দিলে কর্দ্দম উৎপন্ন হয়।' তখন শচীকুমার বলিলেন, 'মা! আগে কেন একথা আমাকে শিখাইয়া দাও নাই; তাহা হইলে তো আর মাটী খাইতাম না।'

একদিন এক তৈর্থিকব্রাহ্মণ জগন্নাথগৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বালগোপালমন্ত্রে নাকি দীক্ষিত ছিলেন; পাক সমাপ্ত করিয়া যাই স্বাভীষ্টদেবে নিবেদন করিলেন, অমনি দুর্দ্দান্ত নিমাই কোথা হইতে আসিয়া স্তূপীকৃত অন্নের একগ্রাস খাইয়া ফেলিল। জগন্নাথ ও শচী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হায়! হায়! করতঃ দৌড়িয়া যাইয়া বালককে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয় বার পাক করিতে সম্মত করিলেন। এদিকে বালককে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। সেবারেও অন্ন প্রস্তুত হইলে ঠিক সেইরূপ হইল; কোন প্রকারে কেহ বালককে নিবারণ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে তৃতীয়বার পাক সমাপ্ত হইলে গৌরাঙ্গ প্রভু যোগনিদ্রায় পিতা মাতা প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়া গোপাল বেশে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বালক বিশ্বম্ভর একাকী গঙ্গা-তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দুই জন চোর বালকের গাত্রালঙ্কার অপ-হরণের বাসনায় তাঁহাকে মিঠাই সন্দেশ দিবার ও স্বীয় বাটীতে পৌছাইয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বৈক-

বাচার্য্যগণ এখানে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে. লোক দুইজন বিষ্ণু-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাদের গন্তব্যপথ হারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতেই আসিয়া উপনীত হইয়াছিল এবং বহির্ব্বাটীতে বালককে নামাইয়া দিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল।

জগদীশ ভাগবত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামে জগন্নাথের দুইজন আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন। একাদশী দিনে তাঁহারা নানা প্রকার দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করতঃ কৃষ্ণপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া আসিয়া নিমাই ব্যাধিছলনা করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন যে, পূজার অগ্রে ঐ সব নৈবেদ্য তাঁহাকে খাইতে না দিলে তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য হইবে না। বালকের রোদনে বাটীর সকলে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে, ঐ কথা প্রতিবেশীদ্বয়কে জানাইতে বাধ্য হইলেন। সরলমতি প্রতিবেশী দুই জন অগত্যা দেবতার অগ্রেই বালককে নৈবেদ্য দিয়া শান্ত করিলেন।

কথিত আছে এই সময়ে বালক নিমাই অতিশয় দুষ্ট স্বভাব ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন; পাড়ার বালকগণের অগ্রণী হইয়া, দলবদ্ধ হইয়া, তিনি নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতেন; কখন পাড়াপড়সীর ঘরের দ্রব্য চুরি করিয়া লইতেন, কখন দলের মধ্যে অবাধ্য বালককে প্রহার করিতেন, কখন ভাগীরথীতীরস্থ সৈকতভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে এক পদে দাঁড়াইয়া মার্কণ্ড খেলা খেলিতেন, কখন দলে দলে জল মধ্যে পড়িয়া সন্তরণ দিতেন ও অপর লোকের স্নানাহ্নিকে অশেষ প্রকারে বাধা দিতেন। শচী জগন্নাথ সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত রূপ নানা অভিযোগ শুনিতে পাইতেন।

"শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব !
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব।
ভালমতে না পারি করিতে গঙ্গাস্নান;
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান।
আরও বলে "কারে ধ্যান কর এই দেখ !
কলিযুগে মুক্তি নারায়ণ পরতেক।"
কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরি;
কেহ বলে, মোর লয়ে পলায় উত্তরী।

'কেহ বলে পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন'
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন;
আমি করি স্নান এথা বৈসে সে আসনে;
সব খাই পড়ি তবে করে পলায়নে।
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া,
ডুব দিয়া লয়ে যায় চরণে ধরিয়া।
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীথ পুঁথি।
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার,
কাণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার।
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কাঁদে চড়ে,
"মুঞিরে মহেশ" বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে।
স্নান করি উঠিলেই বালি দেয় অঙ্গে,
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে।
স্ত্রীবাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল,
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল।
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে,
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কি মতে?"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বম্ভর পাড়ার বালকের দলপতি হইয়া গঙ্গার ঘাটে স্নানোপলক্ষে যাইয়া অশেষবিধ দৌরাত্ম্য করিতেন। এই সময়ে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ফুলের সাজী হাতে লইয়া ও নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভাগীরথীজলে শিবপূজা ও ব্রতার্চ্চনা জন্য গমন করিত। কন্যাগণ ঘাটের ধারে সারি সারি বসিয়া মৃত্তিকা দ্বারা মহাদেব নির্ম্মাণ করতঃ পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিবেন; কোথা হইতে দুরন্ত নিমাই আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসিতেন, ও বলিতেন যে 'আমার পূজা কর, আমি তোমাদের উত্তম উত্তম বর দিব; তোমরা জান না গঙ্গা, দুর্গা ও মহাদেব সকলেই আমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য।' এই বলিয়া চন্দনের বাটী হইতে চন্দন লইয়া আপন কপালে দিতেন, ফুলের মালা লইয়া গলায় পরিতেন, এবং আল চাল, কলা, সন্দেশ ও উপকরণাদি লইয়া ভোজন করিতেন। যদি কন্যাগণ বলিত 'ছি নিমাই! তুমি আমাদের গ্রামসম্পর্কে ভাই হও,

আমাদের সহিত এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিও না।' তাহাতে বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিতেন, 'আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের এই বর দিতেছি যে, তোমাদের পরমসুন্দর, যুবা, রসিক ও ধনবান্ স্বামী হইবে এবং এক একজন সাত সাতটী পুত্র সন্তান প্রসব করিবে।' যদি কোন কন্যা তাঁহার অন্যায় লুণ্ঠন হইতে আপন নৈবেদ্য রক্ষা করিয়া পলায়ন করিত, তবে তাহার উপর বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিত না; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অভিসম্পাত করিতেন "তাহার বুড়া ভর্ত্তার সহিত বিবাহ হইবে, ও অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সাতটী সপত্নীর উপর পড়িবে।" অতিদার্ঢ্যতা সহকারে এই সকল উক্তি করাতে কন্যাগণ মনে করিত 'বুঝিবা ইহার কথা সত্য হইবে; হয় তো এ ছোঁড়া কি দৈববল পাইয়াছে; নতুবা এমন কথা কেন বলিবে।' এই বিবেচনায় কন্যাগণ বিশ্বম্ভরকে সন্তুষ্ট না করিয়া কোন ব্রতানুষ্ঠান করিত না। নিমাইর দুর্ব্যবহারে বালিকাগণ উত্যক্ত হইয়া সময়ে সময়ে শচীমাতার নিকটে যাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিত:—

"কোপ মনে সকলেতে বলেন বচন;
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ।
বসন করয়ে চুরি, বলে অতি মন্দ,
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব।
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল;
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল।
জলক্রীড়াতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল;
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে;
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।
প্রতি দিন এই মত করে ব্যবহার;
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার?
পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার;
সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার।
দুঃখে মোর বাপেরে বলিব যেই দিনে;
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা সনে।

'নিবারণ কর ঝাঁট আপন ছাওয়াল ;
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম নহিবেক ভাল।'

বিশ্বম্ভরের অশেষ দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে শুনিতে পিতা মাতা তিত-বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন শচীমাতা বালককে প্রহার করিবার মানসে ধরিতে গেলেন; বালক লাফাইয়া নিকটস্থ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপরে যাইয়া বসিয়া থাকিল; শচী বলিলেন, "অশুচি স্পর্শে তুমি অশুচি হইয়াছ; গঙ্গাস্নান না করিয়া আসিলে গৃহে প্রবেশ করিতে পাইবে না।' তচ্ছ্রবণে বালক উত্তর করিল "ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কোন স্থানই অস্পৃশ্য হইতে পারে না; ব্রহ্মের বর্ত্তমানতায় সকল স্থানই মহাতীর্থময়!" পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া পিতা মাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বহুযত্নে শিশুকে শান্ত করিয়া গৃহে লইলেন।

এই সময়ে শুভদিন দেখিয়া জগন্নাথ বিশ্বম্ভরের বিদ্যারম্ভ করিয়া দিলেন। অতিঅল্প দিনেই বালক বর্ণ পরিচয়, ফলা, বানান শিক্ষা করিয়া দিন দিন জ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পৌগণ্ডলীলা ও বিদ্যাবিলাস।

কিছু দিন পরে জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্বম্ভরের কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র দিন দিন বিদ্যা ও জ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ও সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়সকল পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বালচাঞ্চল্য ও দৌরাত্ম্যবুদ্ধির তিরোধান হওয়া দূরে থাকুক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধবয়সের সন্তান বলিয়া পিতা মাতা বড় একটা শাসন করিতেন না, অথবা করিলেও বালক তাহা শুনিত না; তবে অগ্রজ বিশ্বরূপকে বড় ভয় করিতেন। পিতা মাতার সম্মুখে বা

অন্যপাড়া প্রতিবাসীর বাটীতে তিনি দৌরাত্ম্য করিতেছেন, এমন সময় যদি বিশ্বরূপ সেখানে যাইতেন, বা কেহ তাঁর আগমনের কথা বলিত, অমনি সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইতেন।

একদিন মিশ্রবর জাহ্নবীজলে বিশ্বম্ভর দৌরাত্ম্য করিতেছেন শুনিতে পাইয়া ক্রোধভরে হাতে যষ্টি লইয়া শাসন করিতে চলিলেন। দূর হইতে চতুরচূড়ামণি নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া বালকগণের কাণে কাণে, তিনি স্নানে আইসেন নাই, এই কথা পিতার সমক্ষে বলিতে বলিয়া অন্যপথ দিয়া পলায়ন করিলেন। জগন্নাথ বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ব্বশিক্ষিত মতে উত্তর করিল, 'কই আজ তো নিমাই স্নানে আইসে নাই! এই দেখুন, আমরা সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।' ইহা শুনিয়া মিশ্র আরও কোপাবিষ্ট হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং কোথাও পুত্রের দেখা না পাইয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'ভয় পাইয়া নিমাই পলায়ন করিয়াছে; আপনি আজ যান, আর যদি চঞ্চলতা করে, তবে আমরা তাহাকে ধরিয়া দিব।' মিশ্র অগত্যা বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মিশ্র দেখিলেন, অন্যান্য দিনের ন্যায় বিশ্বম্ভর হস্তে লিখনসামগ্রী লইয়া পাঠশালা হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া জননীর নিকট তৈল চাহিতেছেন; তাঁহার অঙ্গে কালির বিন্দু সকল শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে ধূলা লাগিয়াছে, পূর্ব্বপরিধেয় বস্ত্র সেইরূপ রহিয়াছে এবং শরীরে স্নানচিহ্নমাত্র নাই। পিতা পুত্রকে স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "বিশ্বম্ভর! দেখ তোমার নামে প্রতিবাসীগণ কত দৌরাত্ম্যের কথা বলে; কেন তুমি লোকের প্রতি ওরূপ দুর্ব্ব্যবহার কর? আর কেনই বা দেবতাপূজার দ্রব্যাদি অপহরণ কর? দেবতা বলিয়া কি তোমার ভয় নাই?"

পুত্র উত্তর করিলেন, 'আমি তো আজ স্নানে যাই নাই; আমার সঙ্গী বালকগণ আগে গিয়া লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে। আমি না গেলেও যদি আমার নাম হয়, তবে আমি সত্য সত্যই অনাচার করিব; বিষ্ণু জানেন আমার ইহাতে দোষ নাই।'

ইহা আদুরে ছেলের বেদের কথা। সঙ্গীবালকগণ ও দর্শকমণ্ডলী

তাঁহার চতুরতার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল ;—'নিমাই আজ ভাল চতুরতা খেলিয়া মার খাওয়া এড়াইল।'

এই সময়ে পরিবার মধ্যে এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া পড়িল; কাল মেঘে সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন করিল। জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ পরিণয়ের কথা শুনিয়া গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন ও সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থূল বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই নিদারুণ ঘটনায় পিতা মাতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; বিশ্বম্ভরও ভ্রাতৃবিরহে অনেক ক্রন্দন করিলেন। কথিত আছে যে, তিনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণও বিশ্বরূপের বিরহে অনেক বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রতিবাসী আত্মীয়গণ নানাপ্রকারে শচী জগন্নাথকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "যে কুলে একটী পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে গোষ্ঠির সকলেই উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে ; তাহাতে খেদ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ বিশ্বম্ভরের ন্যায় যাহার পুত্র বিদ্যমান্‌, তাহার দুঃখের বিষয় কি ?" এই ঘটনা বিশ্বম্ভরের চরিত্রেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। ভ্রাতার সন্ন্যাসের পর নিমাইকে আর কেহ পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল দেখিতে পাইত না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বালচাপল্য ও ক্রীড়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীর ও শান্তভাবে সর্ব্বদা পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিতেন ও তাঁহাদের সেবা সুশ্রূষায় তৎপর থাকিতেন।

এক দিন গৌরচন্দ্র বিষ্ণুনৈবেদ্যের তাম্বুল চর্ব্বন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পিতামাতা আস্তে ব্যস্তে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে এক অদ্ভুত কাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "বিশ্বরূপ আসিয়া যেন আমাকে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার পিতামাতা অনাথ, বিশেষতঃ আমি বালক, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিব না ; গৃহস্থ থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিব। তখন বিশ্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া দিলেন।" আর এক দিন মাতাকে একাদশী তিথিতে অন্ন-ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মানুষের চিরদিন কখন সমান যায় না, সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর

সুখ, জগতের নিয়ম। অল্পে অল্পে শচী জগন্নাথের পুত্রবিরহশোক মন্দীভূত হইয়া আসিল। এ দিকে বিশ্বম্ভরও অধিক মনোযোগের সহিত অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি এত সুতীক্ষ্ণ ছিল যে, একবার যে সূত্র পড়িতেন বা ব্যাখ্যা শুনিতেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা ও মেধা-শক্তির কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবাসীগণ সকলেই একবাক্যে পিতা মাতার নিকট গৌরের অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তির প্রশংসা করিতেন।

প্রশংসাবাদ শ্রবণে জননীর মনে আনন্দ ধরিত না। কোন্ জননীর তাহা না হয়? কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ইহা শুনিয়া অতি ভীত ও শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে এই ভয় হইল যে, বিশ্বরূপ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বম্ভরও কি তাই করিবে? এই মনোভাব তিনি একদিন সহধর্ম্মিণীকে জানাইলেন।

জগন্নাথ বলিলেন, 'শাস্ত্রজ্ঞান মানুষের চক্ষু খুলিয়া দেয়; এ সংসার অনিত্য, এখানকার সকলই ছায়াবাজীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এক ঈশ্বরই সত্য বস্তু, শাস্ত্রপাঠে ইহা সুস্পষ্ট জানা যায়। বিশ্বরূপ এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বম্ভরও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে চলিল, আমার ভয় হয় সেও পাছে সংসারের অনিত্যতা বুঝিলে আমাদের ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই পুত্র আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব। এ চলিয়া গেলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। সেজন্য আমি বলি নিমাইয়ের আর অধ্যয়নে কাজ নাই, মূর্খ হইয়া সে আমার ঘরে থাকুক।'

শচীদেবী স্বামী অপেক্ষা অনেক উদারভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—'মূর্খ হয়ে পুত্র বেঁচে থাকা অপেক্ষা, না থাকা ভাল। মূর্খ পুত্রকে কে মেয়ে দিবে?'

অবশেষে পিতার মতই প্রবল হইল। জগন্নাথ বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, সেই দিন হইতে তাঁহার পাঠ বন্ধ, তিনি আর পড়িতে পাইবেন না। গৌরচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পড়া বন্ধ করিলেন; পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু পাঠবন্ধ করায় হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকার জন্য নিমাইয়ের দুষ্ট সরস্বতী আবার স্কন্ধে চাপিল। আবার তিনি অশেষ দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ

করিলেন; এবার কিছু দুষ্টামির মাত্রাও বাড়াইয়া দিলেন। সম্মুখে যাহা দেখিতেন, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন; পূর্ব্বে কেবল দিবাভাগে ক্রীড়াদি করিতেন, এখন রাত্রিতেও আর বাটীতে থাকিতেন না। পাড়ার দুষ্ট বালক জুটাইয়া কত রকমের নূতন নূতন খেলা খেলিতে লাগিলেন। দুইটী বালক একত্রিত হইয়া কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বৃষের ন্যায় হইত ও অন্ধকার রাত্রে লোকের কদলী বাগানে বা কাহারও বাড়ীতে যাইয়া গাছ-পালা ভাঙ্গিত। গৃহস্বামী গরু বিবেচনায় লগুড় হস্তে তাড়াইতে আসিলেই বালকদ্বয় খিল খিল করিয়া হাসিয়া পলায়ন করিত। আবার গৃহস্থ ঘরে কপাট দিয়া শয়ন করিয়া আছে, কোন বালক বাহির দিক্ দিয়া শৃঙ্খল টানিয়া বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া আসিত; তাহাদের শৌচ প্রস্রাব করা দায় হইত। একদিন জগন্নাথ কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন, নিমাই পাড়ার বালকগণে পরিবৃত হইয়া খেলিতে খেলিতে বাটীর নিকটস্থ গর্ত্ত মধ্যে উচ্ছিষ্ট হাণ্ডীর উপর যাইয়া বসিলেন ও কালী লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। জননী এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া সেখানে যাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'উচ্ছিষ্ট হাণ্ডীস্পর্শে মানুষ যে অশুচি হয়, এ জ্ঞানও কি তোমার এতদিনে জন্মিল না?' গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন:—

"যে ব্যক্তি মূর্খ, সে ভদ্রাভদ্র ও শুদ্ধাশুদ্ধ কিরূপে জানিবে? আমাকে তো তোমরা পড়িতে দিলে না, আমি কেমন করিয়া এ সব জ্ঞান লাভ করিব?'

শচী তাঁহাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে বলিলে বিশ্বম্ভর নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন 'যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না দাও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আর গৃহে যাইব না।'

ইহা শুনিয়া প্রতিবাসীগণ সকলেই শচী জগন্নাথকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "লোকে কত যত্ন করিয়া আপন পুত্রকে পড়ায়, আর এ বালক পড়িবার জন্য কত যত্নবান্। ছেলে মূর্খ করিতে আপনাদের এমন কুবুদ্ধি কে দিয়াছে? বালকের তো কিছুমাত্র দোষ দিতে পারি না।"

তখন সকলে গৌরাঙ্গকে সান্ত্বনা করিয়া স্নান করাইলেন এবং জগন্নাথ আসিলে সকলে অনুরোধ করিয়া ও বুঝাইয়া পুনরায় বালকের পাঠারম্ভ করাইয়া দিলেন। নিমাই মহা উৎসাহ সহকারে পুনর্ব্বার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে উপনয়নের বয়স নিরীক্ষণ করিয়া মিশ্র মহাশয় শুভদিন দেখিয়া বালকের যজ্ঞোপবীত দিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে একটী মহোৎসব হইল। গৌরের চূড়াকরণের সময় হইতেই আর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কোন কথা শুনা যায় না। বোধ হয়, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকিবে। যাহা হউক উপনয়নের পর বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি ঘরে বসিয়া পড়িতেন, এক্ষণে গোষ্ঠি মধ্যে যাইয়া পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবদ্বীপের গঙ্গাদাস পণ্ডিত একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার টোলে অনেক শিষ্য পড়িত। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ টোলে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মিশ্র মহাশয় পুত্র সঙ্গে পণ্ডিতজীর নিকটে গমন করিলেন ও পুত্রকে টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গাদাস নিমাইয়ের আশ্চর্য্য মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং সকল শিষ্যের শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলেন। বালকেরা কেহই তাঁহার সঙ্গে ফাঁকিতে আঁটিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে গৌরচন্দ্র সকল শিষ্যের চালক হইয়া উঠিলেন। এই টোলে তাঁহার ভাবিধর্ম্মবন্ধু মুরারিগুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি পড়িতেন। তাঁহাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গের এইখান হইতেই বন্ধুত্ব জন্মে। তখন নবদ্বীপে এই নিয়ম ছিল যে, পাঠান্তে টোলের পড়ুয়াগণ দল বাঁধিয়া স্নান করিতে যাইত এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর তর্ক বিতর্ক চলিত। গৌরাঙ্গ-প্রমুখ গঙ্গাদাসের ছাত্রগণকে আর কোন টোলের ছাত্রেরা বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। নিমাই এক ফাঁকির বিবিধরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকলকে ঠকাইয়া দিতেন। প্রথমে একরূপ অর্থ করিয়া বুঝাইয়া, আবার সেই অর্থ খণ্ডন করত অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে বিপক্ষ বালকেরা বড়ই অপমানিত হইত। দুষ্ট নিমাই ইহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; নানারূপ ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা তাহাদিগের সহিত কলহ করিতেন; তাহাদের গায়ে বালি জল দিতেন ও বিবিধ প্রকারে নির্যাতন করিতেন। ফলতঃ তাঁহার দলস্থ পড়ুয়াদিগকে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

এখন গৌরচন্দ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; স্নানান্তে বাটীতে আসিয়া বিষ্ণুপূজা করিতেন, পরে আহারাদি করিয়া

নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তক লইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন এবং স্বহস্তে পুস্তকাদি লিখিতেন ও টীপ্পনী দিতেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের এইরূপ বিদ্যামত্তা ও বিদ্যোপার্জ্জনে গাঢ় নিপুণতা দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে একটা আতঙ্ক জন্মাইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া অলক্ষিত ভাবে ঐ ভাবচ্ছায়া তাঁহার মনে পড়িত; অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি মন হইতে তাহা দূর করিতে পারিতেন না। ইহার মধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সাশ্রু নয়নে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন নিমাই শিখা মুণ্ডন করিয়া অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছেন, ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নয়নের জলে ভাসিতেছেন, অদ্বৈতাদি সকলে যেন নিমাইকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন ও নিমাই যেন নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। শচী স্বামীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন বিশ্বম্ভর যেরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে পুঁথি ছাড়িয়া তিনি যে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, তাহা সম্ভবপর নয়।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি বা কাণভট্ট শিরোমণি ও স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি এক জন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। বিদ্যারম্ভকালে তিনিই বলিয়াছিলেন যে আগে 'খ' কি অন্য বর্ণ না বলিয়া 'ক' কার উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? রঘুনাথ যখন পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, সেই সময় তিনি যে বাটীতে থাকিতেন, সেই গৃহের স্বামী নবদ্বীপের প্রথম নৈয়ায়িক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম বিশারদ তাঁহাকে একদিন তামাকু খাইবার জন্য আগুণ আনিতে বলিয়া ছিলেন। রন্ধন শালায় ভট্টাচার্য্য-পত্নী পাক করিতেছিলেন, বালক রঘুনাথ তাঁহার নিকট অগ্নি চাহিলে, তিনি হাতায় পূর্ণ প্রজ্বলিত অঙ্গার দিতে গেলেন। বালকের হাতে কোন পাত্র ছিলনা; সে আপন প্রত্যুৎপন্নমতিবলে অমনি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এক অঞ্জলি ধূলি লইয়া তদুপরি অগ্নি দিতে বলিল। ভট্টাচার্য্য বালকের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে

তাহাকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। কথিত আছে এই রঘুনাথ শিরোমণি একদিন এক জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বাঁশ তলায় একটী মাদুর পাতিয়া তদ্গত চিত্তে পুঁথি দেখিতেছিলেন। পিঠে কাকে মলত্যাগ করিয়াছে, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। গৌরচন্দ্র বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে স্নান করিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে আপন আর্দ্রবস্ত্রের জল ২। ৪ ফোঁটা রঘুনাথের পৃষ্ঠে দিলে তাঁহার চৈতন্য হইল ও তিনি গৌরাঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কি হে নিমাই! ব্যাপারটা কি?'

নিমাই উত্তর করিলেন 'পিঠে যে কাকে বাহ্যে করে দিয়েছে?'

রঘু। পড়া শুনা করিতে হইলে একটু মনোযোগ না দিলে হবে কেন? তোমার মত ভেসে ভেসে বেড়ালে কি পড়া হয়?

বিশ্বম্ভরও একটু অহঙ্কারব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন 'তোমার চিন্তার বিষয়টা জানিতে পারি না কি?

রঘু। তুমি ইহার কি বুঝিবে?

নিমাই। বলই না কেন, শুনিতে হানি কি?

রঘুনাথ তখন সেই প্রশ্নটী ব্যাখ্যা করিলেন ও তাহাতে যে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, তাহাও বলিলেন। আবার ঐ পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসাও বলিয়া দিলেন। এইরূপ সপ্তম মীমাংসা পর্য্যন্ত বলিয়া যেখানে সন্দেহ ছিল, তাহা বিবৃত করত গর্ব্বের সহিত বলিলেন "কি মীমাংসা কর, দেখিব?" বিশ্বম্ভর অম্লানবদনে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর দিলে রঘুনাথ অবাক্ হইয়া গেলেন। তদবধি তিনি বিশ্বম্ভরের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইতেন।*

এখন হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নিমাইয়ের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি হইতে লাগিল। তিনি এখন কেবল যে পড়িতেন, তাহা নহে; টোলে অন্যান্য ছাত্রদিগকে পড়াইতেও লাগিলেন। মুরারি গুপ্ত তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট পাঠ লইতে লজ্জা বোধ করিতেন; সে জন্য গৌরাঙ্গ গুপ্তকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন 'ওহে বৈদ্যরাজ!

---

* এই গল্পটী কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই; নবদ্বীপের কোন শিক্ষিত বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম।

তুমি কেন পড়িতে আসিয়াছ? লতা পাতা লইয়া বসী বড়ী কর গে। ব্যাকরণ শাস্ত্র বড় বিষম ব্যাপার; ইহাতে কফ পিত্ত অজীর্ণের ব্যবস্থা নাই।'

বাক্যযন্ত্রণায় মুরারি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার নিকট পাঠ চাহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অবস্থায় পরিবার মধ্যে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, যদ্দ্বারা বিশ্বম্ভরের ভাবি জীবনের গতি আর এক রূপ আকার ধারণ করিল। এই বৃত্তান্ত পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃবিয়োগ।

পুত্র ও পত্নীকে অকূল শোক সাগরে ভাসাইয়া জগন্নাথমিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃবিয়োগে বিশ্বম্ভর বিস্তর শোক দুঃখ করিলেন; পতিহীনা হওয়ায় শচীদেবীর দুঃখের সীমা থাকিল না। প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব আসিয়া অশেষ প্রকারে মাতা পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশ্বম্ভর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় গৃহস্থালি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পতিবিয়োগে শচীদেবী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। পিতৃহীন বালকের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের শোকসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত; গৌরের নিঃসহায় অবস্থা মনে করিয়া কতই কাঁদিতেন, এবং দিবারাত্রি অনন্যমনা হইয়া পুত্রসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন; এক দণ্ড পুত্র মুখ না দেখিতে পাইলে মূর্চ্ছা যাইতেন। স্বর্গীয় পতির প্রতি শচীদেবীর প্রগাঢ় ভক্তি ও অকৃত্রিম সরল প্রণয় ছিল। এক্ষণে সমস্ত প্রেম পুত্রেতে অর্পিত হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক পুত্র বাৎসল্য সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইল। এক্ষণে বিশ্বম্ভরই তাঁহার জীবনসাগরের একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্র; তাঁহার মুখ দেখিয়াই তিনি কথঞ্চিত জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভরও পূর্ব্ব ঔদ্ধত্য ও অধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিতচিত্তে মাতৃসেবায় তৎপর হইলেন। কত সময়ে একত্রে বসিয়া পুত্র মাতাকে কত আশ্বাসের মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইতেন; এবং কত প্রকারে প্রবোধ দিতেন।

"শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি;
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি।"

জগতে যদি এইরূপ অকৃত্রিম প্রেম ও আশ্বাসের মিষ্টকথা না থাকিত; তবে কে এই অশেষ দুঃখময় সংসারে রোগশোক সহ্য করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইত?

জগন্নাথের পরলোক গমনে বিশ্বম্ভর ও শচীর ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্বন্ধে কষ্ট উপস্থিত হইল। হইবারই তো কথা। তাঁহাদের স্থায়ী ভূসম্পত্তি আদি কিছুই ছিল না; এক মাত্র জগন্নাথ যাজনাদি ক্রিয়া দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে সংসারের যে অর্থ-কষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশ্বম্ভর এ পর্য্যন্ত কখন কিছু উপার্জ্জন করেন নাই; এবং ধনার্জ্জনাদি যে করিতে হইবে, সে দিকে তাঁহার চিন্তাও ছিল না। ঘরে কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহার জীবনযাপনের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা না পাইলে রক্ষা থাকিত না। পিতৃ শোকে অভি-ভূত হইয়া কতক দিন পর্য্যন্ত শান্ত ও স্থির ছিলেন; এক্ষণে কালসহকারে যতই শোকের তীব্রতা হ্রাস হইতে লাগিল; ততই তাঁহার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপিয়া উঠিল। পিতৃবিয়োগে মাতার অযথা আদর ও প্রশ্রয়, অগ্নিতে দাহ্যমান বস্তু সংযোগের ন্যায় তাঁহার দুষ্ট বুদ্ধির উত্তেজক হইতে লাগিল। পুত্রবৎসলা শচী পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের অযথা প্রার্থনা সকল প্রাণপণ চেষ্টায় পূর্ণ করিতেন; তথাচ কোন সময়ে কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে দুর্দ্দান্ত নিমাই ক্রোধে অন্ধ হইয়া ঘর দুয়ার সকলই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। এক্ষণে তিনি পরিণত বয়স্ক; তথাচ এই কুস্বভাবের হস্ত হইতে কিছুতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এখানে তাঁহার রাগোদ্রেকের যে একটী অদ্ভুত আখ্যায়িকা দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারি-বেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ স্বভাব হইয়াছিল। একদিন বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নানে যাইবেন বলিয়া মাতার নিকট তৈল, আমলকি এবং বিষ্ণু পূজার জন্য পুষ্প চন্দন ও মাল্য চাহিলেন। শচী তৈলাদি সমুদায় অর্পণ করিয়া বলিলেন "বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, মালাকরের বাটী হইতে মাল্য আনিয়া দিতেছি।" 'আনিয়া দিতেছি' শব্দ শুনিয়া বিশ্বম্ভর ক্রোধে অধীর হইলেন এবং ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'এখন তুমি মালা আনিতে যাইবে?' বলিয়া জননীকে তিরস্কার করিতে করিতে লগুড় হস্তে গৃহ

মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং গঙ্গাজল রাখার যত কলসী ও ভাঁড় ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ; তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, চাউল, ডাইল, ধান, লবণ, বড়ী ও কার্পাস আদি ছড়াইয়া ফেলিলেন ; যে সকল শিকা টাঙ্গান ছিল তাহা এবং বস্ত্রাদি যাহা কিছু পাইলেন, সব ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। যখন ঘরের মধ্যে অন্য কোন জিনিষ পাইলেন না, তখন গৃহের উপর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় দুই হস্তে লগুড় প্রহার করিয়া ঘর দুয়ার ভাঙ্গিতে লাগিলেন ; তৎপরে গৃহ প্রাঙ্গনে যে সকল বাস্তবৃক্ষ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন ; এবং তাহাতেও ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত না হওয়ায় অবশেষে দুই হাতে মৃত্তিকার উপর ঠেঙ্গা মারিতে লাগিলেন। কেহ ভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া নিষেধ করিতে সাহসী হইল না। শচীমাতা মহাভীম মূর্ত্তি পুত্রের ঈদৃশ ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া ভয়ে স্থানান্তরে লুক্কায়িত হইলেন। সুতরাং বিনা বাধায় বিশ্বম্ভর যাবতীয় গৃহদ্রব্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিলেন। কিন্তু এই সকল দুষ্কার্য্যের মধ্যে বিশ্বম্ভরের অনুকূলে বলিবার একটী কথা আছে ; অর্থাৎ তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় জননীকে কখন প্রহার করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনাখ্যায়ক অনেক প্রশংসাবাদ লিখিয়াছেন——

> 'ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম সনাতন ;
> জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন।
> এতাদৃশ ক্রোধাবেশে আছেন ব্যাপিয়া ;
> তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া।' চৈঃ ভাঃ।

এইরূপে সমস্তদ্রব্য সামগ্রী অপচয় করিয়া বিশ্বম্ভর যখন আর কিছু পাইলেন না, তখন ক্রোধাবেশে অঙ্গনে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ; এবং ক্ষণকাল মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে শচীদেবী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া মালাকরের বাটী হইতে সকল অনর্থের মূল সেই মালা আনয়ন করিয়া স্নানের ও পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া ধীরে ধীরে পুত্রের অঙ্গে হস্তামর্শ করিতে লাগিলেন ; এবং গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া সুমধুর মিষ্টবাক্যে পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ;—

> 'উঠ উঠ বাপ মোর হের মালা ধর ;
> আপন ইচ্ছায় গিয়া বিষ্ণুপূজা কর।

'ভাল হৈল যত বাপ! ফেলিলে ভাঙ্গিয়া;
যাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া।' চৈঃ ভাঃ

ধন্য অপত্যস্নেহ! ধন্য মাতৃপ্রেম! তুমিই জগতে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার! তুমি না আসিলে কি জীবপ্রবাহ রক্ষা হইত? মাতৃস্নেহের প্রতিশোধ পুত্র কি চিরজীবনে দিতে পারে?

যাঁহারা চৈতন্যচরিত্রের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, অন্যান্য অসামান্য দৈবগুণাবলীর মধ্যে ক্রোধ তাঁহার জীবনের একটী কলঙ্ক চিহ্ন স্বরূপ ছিল; কোন প্রকারেই তিনি এই দুর্জ্জয় ও নিষ্ঠুর রিপুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইতে পারিতেন না। বাল্যকালে মাতার ও গৃহসামগ্রীর উপর তাঁহার ক্রোধের সুতীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত, যৌবনসময়ে ইহারই বশে গুরু লঘুজ্ঞান ও পাত্রাপাত্র ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধ অদ্বৈতের মুখে জ্ঞানপক্ষে বাশিষ্ঠব্যাখ্যান শুনিয়া ভয়ানক প্রহার করিয়াছিলেন এবং সময়ান্তরে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়া যাইতেছিলেন এবং শেষবয়সে যখন ভগবৎপ্রেমে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন, তখনও সময়ে সময়ে এই ক্রোধের আবেশ দেখা যাইত। সে যাহা হউক জননীর সুমধুর প্রবোধবাক্য শুনিয়া গৌরচন্দ্র লজ্জিতান্তঃকরণে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। এদিকে শচীমাতা সমস্ত ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়া রন্ধন সমাধা করিলেন; ও বিশ্বম্ভর স্নান করিয়া আসিলে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া মিষ্ট বাক্যে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন:—"বাপ বিশ্বম্ভর! দেখ এত অপচয় কি করিতে আছে? ঘর দুয়ার সকলই তোমার; নিজের জিনিষ কি এত নষ্ট করিতে আছে? এই এখনই পড়িতে যাইবে, কাল কি খাইবে, এমন সম্বল ঘরে নাই।"

জননীর মিষ্টভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া গৌরসুন্দর মহালজ্জিত হইলেন এবং আপনার দুর্দমনীয় ক্রোধের বিষয় স্মরণ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন। আর জননীকে বলিলেন 'টাকা কড়ির জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না; ভগবান্ কোন মতে চালাইয়া দিবেন।' বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ এই স্থানে গৌরের অলৌকিকত্বের পরিচয় দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে গৃহের দ্রব্য অপচয় করায় নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া বিশ্বম্ভর সেই দিন অপরাহ্ণে অধ্যয়ন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জাহ্নবীতীরে ক্ষণকাল একাকী অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া নিভৃতে

জননীর হস্তে দুই তোলা সুবর্ণ দিয়া গৃহসামগ্রীর অভাব পরিপূর্ণ করিতে বলিলেন। এখন হইতে এইরূপে যখন ঘরে অনাটন দেখিতেন, তখনই কিছু কিছু স্বর্ণ আনিয়া মাতার হস্তে দিতেন। ইহাতে জননীর মনে উৎকট চিন্তার উদয় হইত। শচী ভাবিতেন 'বিশ্বম্ভর কোথা হইতে বারে বারে সোনা আনিতেছে? ধার করিয়া আনে, বা কোন মন্ত্রবলে সুবর্ণ প্রস্তুত করিয়া দেয়? অথবা কি কোন গুপ্ত খনি পাইয়াছে?' কি জানি কৃত্রিম সোনা হইলে ধরা পড়িয়া কোন প্রমাদ ঘটে এই সঙ্কোচে দশ পাঁচ জন আত্মীয় স্থানে ভাল করিয়া না দেখাইয়া শচী তাহা ভাঙ্গাইতে দিতেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পড়িতে বিশ্বম্ভরের অসাধারণ মেধাশক্তি ও শাস্ত্র দক্ষতার কথা নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল; এবং তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। টোলের মধ্যে তিনিই সকল পড়ুয়াকে চালাইতেন; সকলের পাঠব্যাখ্যা করিয়া দিতেন, এবং ফাঁকির সিদ্ধান্তও খণ্ডন করিতেন। এখন গঙ্গাদাসকে আর বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত না। তিনি বিশ্বম্ভরকে পুত্র নির্ব্বি-শেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্বম্ভরও একটী স্বতন্ত্র টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে বড় চণ্ডীমণ্ডপগৃহে তাঁহার টোল হইতে লাগিল। তিনি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া টোলে পড়াইতে যাইতেন; শিষ্যসমবেত হইয়া মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান করিতেন; স্নান ও আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় টোলে যাইতেন, এবং অপরাহ্নে ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত হইয়া নগর

ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নালোকে শিষ্যপরিবৃত হইয়া কখন জাহ্নবীতীরে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রালাপ হইত; কত প্রকার দম্ভ সহকারে নিমাই পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতেন; এবং বিপক্ষ-পক্ষ দেখিলে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইয়া দিতেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল; দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তিনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপক মধ্যে পরিগণিত হইলেন। প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র এখন তাঁহার টোলে পড়ে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় এক্ষণে তাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্র সাবকাশ থাকিত না।

এই সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া নবদ্বীপে বিদ্যাধ্যয়ন করিত, এবং গঙ্গাবাস উপলক্ষেও অনেক দেশীয় লোক এখানে অবস্থিতি করিত। এইরূপে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক লোক তখন নবদ্বীপে বাস করিতেছিল। মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপের অন্যতর টোলে অধ্যয়ন করিতেন। অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে মুকুন্দ অতি সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। তিনি নিয়মিত সময়ে টোলে অধ্যয়ন করিয়া অবকাশ কাল অদ্বৈতপ্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে পরমার্থ-চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। একদিন নিমাই পণ্ডিত সশিষ্যে রাজপথে গমন করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে মুকুন্দকে দেখিয়া ডাকিলেন। মুকুন্দ পাশ কাটাইয়া অন্যপথে চলিয়া গেলে গৌরাঙ্গ বলিলেন "এ বেটা আমার ফাঁকির ভয়ে অন্য দিকে পলায়ন করিল। উহারা বৈষ্ণবের শাস্ত্র ও পরমার্থ তত্ত্ব আলোচনা করে; আমার ঐ সকলের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই; আমি কেবল শাস্ত্র চর্চ্চা করি; তাহা এ বেটার ভাল লাগিবে না; সেজন্য আমাকে এড়াইয়া গেল। আচ্ছা থাক্ দেখা যাবে।"

অন্য দিন মুকুন্দের দেখা পাইয়া গৌরসুন্দর তাঁহার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়া পলাও কেন? অদ্য বিচার না করিলে ছাড়িয়া দিব না।"

মুকুন্দ মনে করিলেন 'এ ব্যক্তি ব্যাকরণের অধ্যাপক; অলঙ্কার জানে না; অতএব ইহাকে অলঙ্কারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরাজয় করিব।' এই ভাবিয়া তিনি কঠিন অলঙ্কারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন শেষ না হইতে হইতে বিশ্বম্ভর অম্লানবদনে তাহার যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলেন এবং অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মুকুন্দকে নিরুত্তর

করিয়া দিলেন। অবশেষে ঈষৎ হাস্য করিয়া নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দকে বলিলেন 'আজি ঘরে গিয়ে এ বিষয় চিন্তা কর; কল্য আসিয়া আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিও।' ইহা শুনিয়া মুকুন্দ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেনঃ—'মানুষের এমন অদ্ভুত পাণ্ডিত্য তো কখন দেখি নাই। এমন শাস্ত্র নাই যাহাতে ইহার অধিকার নাই। এমন লোক যদি ভক্ত হয়, তবে এক মুহূর্ত্তও ইহার সঙ্গ ছাড়া হই না।'

আর এক দিন মাধব মিশ্রের পুত্র ও তাঁহার ভাবী ধর্ম্মবন্ধু গদাধরকে পথে দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে গদাধর! ভাল তুমি ত ন্যায়শাস্ত্র পড়, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি?"

গদাধর উত্তর করিলেন 'কি প্রশ্ন?'

বিশ্বম্ভর। মুক্তি কাহাকে বলে?

গদাধর। আত্যন্তিক দুঃখনাশের নাম মুক্তি।

তখন গৌরচন্দ্র তাঁহার সিদ্ধান্তে শতদোষ দিয়া মুক্তি পদের অন্য ব্যাখ্যা স্থাপন করিলেন। ফলে এই সময়ে নগরে নগরে বেড়াইয়া লোকের প্রতি ফাঁকি জিজ্ঞাসা করা তাঁহার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীবাস অদ্বৈত প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে দেখিলেও তিনি ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহারা গৌরাঙ্গের পরম সুন্দরমূর্ত্তি ও অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান মধ্যে বিনয়ের অভাব দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন।

এই সময়ে একদিন জগন্নাথ নন্দন বায়ুরোগের প্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া বাটীর অঙ্গনে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন; ক্ষণে ক্ষণে অলৌকিক শব্দ করিয়া উঠেন, ক্ষণে হুঙ্কার গর্জ্জন করেন, কখন বিকটহাস্য করেন, আবার স্তম্ভীকৃত হইয়া নিমগ্নভাবে থাকেন এবং কখন বা প্রচণ্ড রুদ্র মূর্ত্তিতে সম্মুখস্থিত আত্মীয়দিগকে মারিতে যান।

শচীদেবী আস্তে ব্যস্তে প্রতিবাসী বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া এই আকস্মিক দুর্ঘটনা অবগত করাইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভৃতি আত্মীয়গণ আসিয়া নানা রূপ প্রতিকার করিতে লাগিলেন; বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন ও অন্যান্য সুশ্রূষা হইতে লাগিল। এই পীড়ার সময়ে গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন "আমি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি; তোমরা আমাকে চিন না।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ অনু-

মান করিতে লাগিলেন যে, দানব ও ডাকিনী অধিষ্ঠান হইয়াছে; তাহাতে প্রলাপ বকিতেছে; বিজ্ঞ লোকেরা স্থির করিলেন যে, বায়ু ব্যাধি হইয়াছে। কিছুতেই উপশম হইল না দেখিয়া অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে একটী দ্রোণ তৈলে পরিপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখা হইল। এইরূপ কিছু দিন করিতে করিতে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথমপরিণয় ও ঈশ্বর পুরীর আগমন।

পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর যখন গঙ্গার ঘাটে বালিকাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া তাহাদের পূজার সমগ্রী কাড়িয়া খাইতেন, সেই সময়ে একদিন নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম্নী এক বালিকা দেবতাপূজার জন্য গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ইনি বাস্তবিক বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, লীলার সাহায্য জন্য মানবীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, লক্ষ্মীকে দেখিয়া জগন্নাথতনয় সাভিলাষ মনে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া কহিলেন "আমাকে পূজা কর, আমি তোমাকে ঈপ্সিত বর দিব।" কথিত আছে যে, এই সময়ে উভয়ের মনের সাহজিক প্রীতি উদিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীদেবী পূজার ছলে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তিনি আস্তে আস্তে চন্দন টুকু গৌরের মুখকমলে মাখাইয়া দিলেন, ফুলের মালা গাছটী গলায় দিয়া দিলেন এবং হাতে সন্দেশাদি উপকরণ খাইতে দিয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। এই প্রস্তাবের মূলে কত টুকু সত্য আছে, জানি না; কিন্তু ইহাতে যে সরল ও অকৃত্রিম বাল্য প্রেমের একটী সুন্দর ছবি প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার মধুরতা আস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রকারান্তরে বৈষ্ণবকবিগণ এই প্রস্তাবে গৌরচন্দ্রের ভাবী পরিণয়ের একটু অলৌকিকত্ব ও চমৎকারিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তখন দেশমধ্যে মনোনয়ন কাহাকে বলে, জানা ছিল না; সচরাচর পিতা মাতা বরকন্যা

মনোনীত করিয়াই বিবাহ দিতেন; কিন্তু মহাপুরুষ বিশ্বম্ভরের বিবাহ সেরূপে হইতে পারে না, তাই এই অলৌকিক চমৎকারিত্বের অবতারণা। ইহা গৌরের বাল্যজীবনের কথা। তাহার পর কতকাল চলিয়া গিয়াছে, জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিয়াছেন, শচীর সংসারে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বিশ্বম্ভর বয়স্থ হইয়া এখন অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন বনমালী আচার্য্য নামক ব্রাহ্মণের সহিত গৌরচন্দ্র ভ্রমণ করিতে-ছিলেন; এমন সময়ে বল্লভাচার্য্য দুহিতা লক্ষ্মীদেবীকে দেখিতে পাইলেন; এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধ ভাবোদ্গমের পরিচয় দিতে লাগিলেন। চতুর বনমালী তাহা বুঝিতে পারিয়া সময়া-ন্তরে শচী দেবীর নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনার পুত্র বিবাহ-যোগ্য বয়স্ক হইয়াছেন; তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন না কেন? নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্য কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই করণীয় ঘর; আর তাঁহার দুহিতা লক্ষ্মীও রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর সমান; আপনার বিশ্বম্ভরের উপযুক্ত কন্যা। যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেই।"

শচী উত্তর করিলেন—'আমার বালক পিতৃহীন ও অতিশিশু; বিশেষতঃ তাহার এখনও পাঠ সাঙ্গ হয় নাই। পড়া শুনা শেষ হউক ও বাঁচিয়া থাকুক তবে বিবাহের বিষয় চিন্তা করিব।'

শচীর উত্তরে ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; পথি-মধ্যে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?'

বনমালী উত্তর করিল 'আর কোথায়? তোমাদের বাটীতে তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে? তা তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।'

গৌরচন্দ্র ইহা শুনিয়া মৌন হইয়া থাকিলেন এবং ঈষদ্ হাস্য করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত জননীকে বলিলেন যে "বনমালী ঘটক কি বলিতে আসিয়াছিল? তাহাকে সম্ভাষণ করেন্ নাই, সে ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।"

শচী পুত্রের এই ইঙ্গিত বাক্যে তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া গোপনে বনমালীকে ডাকাইলেন ও বল্লভাচার্য্যের দুহিতার সহিত পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ সুস্থির করিতে অনুমতি দিলেন। বিপ্রও তৎক্ষণাৎ বল্লভের

নিকট আসিয়া সমস্ত বিবৃত করিল এবং গৌরাঙ্গের রূপ গুণের কথা বলিয়া বলিল যে 'এরূপ পাত্রে কন্যা দান করা সৌভাগ্যের বিষয়।'

বল্লভাচার্য্য বনমালীর প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিছু দিতে পারিব না; কেবল পাঁচটী হরিতকী দিয়া কন্যাদান করিব।' এই উক্তি তাঁর বিনয়ের কথা, কারণ ইহার পর দেখা যাইবে যে, তিনি কন্যাকে অষ্টাঙ্গেবিভূষিতা করিয়া সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বনমালী এই শুভ সম্বাদ অচিরে শচীকে অবগত করিলেন এবং শুভ দিন দেখিয়া উভয় পক্ষ বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে বল্লভাচার্য্য বিশ্বম্ভরকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুখী হইলেন। কথিত আছে, বিবাহের দিনে যখন চারি দিকে আনন্দ কোলাহল হইতেছিল, শচীদেবী তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীকে মনে করিয়া ক্রন্দন করিয়া ছিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বম্ভরের উল্লসিতাননেও বিষাদের কালিমা পড়িয়াছিল। যাহা হউক, অধিকক্ষণ সে বিষাদ স্থায়ী হয় নাই। আনন্দ উৎসব মধ্যে বিশ্বম্ভরের প্রথমপরিণয় সম্পন্ন হইল। পুত্রের সহিত বধূকে দেখিয়া বিশ্বম্ভরজননীর আনন্দের সীমা থাকিল না। এই সময়ে তিনি গৃহমধ্যে কত কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইতেন; কখন দেখিতেন যেন এক দিব্য জ্যোতির শিখা বিশ্বম্ভরের মস্তক ও বদন মণ্ডলে বিরাজ করিতেছে; আবার কখন বরবধূ উভয়ের অঙ্গ হইতে কমল-গন্ধ নিঃসারিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেন। সরলমতি শচী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে, এই কন্যা লক্ষ্মী আশ্রিতা; ইহাঁর আগমনেই এই সব শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

এই সময়ে চারিদিকে বিষ্ণুভক্তি শূন্য লোক সকল কেবল বাহিরের ক্রিয়া কলাপে ও মিথ্যা জাঁকজমকে রত রহিয়াছে দেখিয়া অদ্বৈতের বৈষ্ণব-মণ্ডলী বড়ই মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহাদের আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহারা মনে করিয়া ছিলেন যে, বিশ্বরূপ যেরূপ ভক্তিপরায়ণ শিষ্টশান্ত সাধু মহাত্মা ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ বিশ্বম্ভরও সেইরূপ হইবেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের জ্ঞানগরিমা ও গর্ব্বিত ব্যবহারে তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যথিত হইতে হইত; এবং কবে কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া জগতের দুঃখ দূর করিবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু ভক্তবর অদ্বৈতাচার্য্য এক দিনের জন্যও নিরাশ হন নাই; তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে,

যখনই যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখনই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করিয়া সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়াছেন। এবারেও অচিরে তাহাই হইবে। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই শিষ্যমণ্ডলীকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতেন;—

"আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব;
এথাই পাইবা সবে কৃষ্ণ অনুভব।
করাইব সবে কৃষ্ণ নয়ন গোচর;
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর।"

তখনও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই ভগবৎ শক্তির স্ফুলিঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; ও সে দিন অতি নিকটে যে দিনের জন্য তাঁহারা আশা নেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন।

প্রত্যহ অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ করা বিশ্বম্ভরের অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া নবদ্বীপের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া নিত্য নূতন পল্লীতে যাইয়া অশেষ প্রকারে হাস্য কৌতুক করিতেন; কোন দিন তন্তুবায় পল্লীতে যাইয়া বিনামূল্যে উত্তম উত্তম বস্ত্র আনিতেন; কখন গোয়ালাদিগের পাড়ায় গমন করিয়া দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর ভোজন করিতেন, গোপগণ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকিত ও আপনাদের পক্ক অন্ন খাইতে অনুরোধ করিত; কখন আবার শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, মালাকার ও সর্ব্বজ্ঞদের বাটীতে যাইয়া বিবিধ আমোদকৌতুক করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা তরকারী বিক্রেতা শ্রীধরের সহিতই অধিক হাস্য পরিহাস হইত। শ্রীধরের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঈশ্বরপুরীর আগমন।

এই মহাত্মার জন্মস্থান কুমারহট্টে; ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে ইনি এই সময়ে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য একান্ত মনে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন সম্মুখে এক তেজঃপুঞ্জ সৌম্য পুরুষ উপবিষ্ট। পুরী কৃষ্ণপ্রেমরসে সর্ব্বদাই বিহ্বল ও প্রশান্তচিত্ত। তাঁহার বেশ দেখিলে তাঁহাকে কেহ সাধুপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিত না। কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট কিছু লুকায়িত

থাকিবার নহে। অদ্বৈতাচার্য্য পুরীর ভাবগতিক দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আগ্রহ সহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; ও অবশেষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'আপনি কে? মনে হয় বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হইবেন।' ঈশ্বরপুরী উত্তর করিলেন, 'না! আমি অধম শূদ্র জাতি; তোমার চরণ দর্শনে আসিয়াছি।'

তখন মুকুন্দ দত্ত অতি সুমধুর স্বরে ও প্রেমের সহিত হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী তাহা শুনিতে শুনিতে অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়া পৃথিবীতে ঢলিয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। পুরীর নয়ন জলে অদ্বৈতের পরিধেয় বসন সিক্ত হইল এবং তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। পরে ঈশ্বরপুরীর পরিচয় পাইয়া অদ্বৈতের ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-দলের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে পুরীর বাসা নির্দ্ধারিত হইল; তথায় তিনি কয়েক মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মহাপণ্ডিত ছিলেন জানিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে সংসার-বিরক্ত পরমভাগবত দেখিয়া পুরী স্বরচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন। একদিন বিশ্বম্ভর নগরভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে পথমধ্যে পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনার ভাবী অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্ব্বিত মস্তক আপনা হইতেই যেন তাঁহার চরণতলে অবনত হইল। পুরী পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, ইঁহার নাম নিমাই পণ্ডিত, ইনি ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক। 'তুমিই সেই' বলিয়া পুরী তাঁহাকে সম্ভাষণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বম্ভরও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ভগবানের গূঢ়কৌশলে এইরূপে ভাবী গুরুশিষ্যে অলক্ষিতভাবে পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলনে যে কি উপাদেয় ফল ফলিবে, তাহা তখন না তাঁহারা, না পৃথিবী, জানিতে পারিয়াছিল। এই হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপনাসমাপনান্তে বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করিতে যাইতেন। যাঁহার জ্ঞান গর্ব্বের নিকট সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত, যাঁহার উন্নতমস্তক আর কাহারও নিকট অবনত হয় নাই, তিনি কেন মেষশিশুর ন্যায় শান্তভাবে একজন উদাসীন

সন্ন্যাসীকে এত ভক্তি করিতেছেন, কে বুঝিবে? আবার যাঁহার দম্ভপূর্ণ-বাক্যের তেজে সকলেই শশব্যস্ত হইত, তিনি পুরীর সহিত কি ভাবে আলাপ করিতেছেন, দেখা যাউক।

পুরী বলিলেন 'তুমি মহাপণ্ডিত; আমি কৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ করিয়াছি; তুমি ইহা পাঠ করিয়া ইহাতে যে দোষ থাকে নিঃসঙ্কোচে বলিবে। আমি অসন্তুষ্ট হইব বলিয়া ভয় করিও না।'

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "আপনি ভক্ত, ভক্তবাক্যে ভগবদ্ বর্ণন অতিমধুর। ইহাতে যে দোষ দেখে সে মহাপাপী। আপনার প্রেমের বর্ণনায় দোষ দিতে পারে এমন সাহসিক ব্যক্তি কে আছে?"

ঈশ্বরপুরী বিশ্বম্ভরের এই বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যদি আমার কবিতায় দোষ থাকে, তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে।" গৌর-চন্দ্র অগত্যা হাসিতে হাসিতে একটী কবিতার ধাতুপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ ধাতু আত্মনে পদ নহে, আপনি আত্মনেপদে প্রয়োগ করিয়া-ছেন কেন?'

ঈশ্বরপুরীও বিদ্যার বিচার করিতে ভাল বাসিতেন; গৌরচন্দ্র ঐ কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পুরী মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক ঐ ধাতু পরস্মৈপদী; কিন্তু আত্মনেপদেও তিনি লাগাইতে পারেন। পুনরায় বিশ্বম্ভরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ কথা বলিলেন। যদিও তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত হেতু ছিল, তথাচ গৌরাঙ্গ তাহাতে আর কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ঈশ্বর পুরী প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৈশোর লীলা—দিগ্বিজয়ীজয়।

যৌবনসমাগমে বিশ্বম্ভর দিন দিন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতে লাগিলেন। একে তিনি পরমসুন্দর পুরুষ, যৌবনারম্ভে তাঁহার শ্রী যে শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন এক রকম লাবণ্যময় মাধুর্য্য মাখান ছিল যাহাতে দর্শকের প্রাণমন আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে

পারিত না। এই সময়ের তাঁহার অঙ্গমাধুর্য্য লোচন দাস ঠাকুর স্বীয় জগদ্বিখ্যাত কবিতায় এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

'অমিয়া মাখিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহাতে পড়িল গোরা দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িল গো,
এক কৈল সুধুই সুলেহ।
অখণ্ডপীযূষ ধারা কেবা আউটীয়া গো
সোণার বরণ কৈল চিনি;
সে চিনি মাখিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো,
হেন বাঁসো গোরা অঙ্গখানি।
বীজুরী বাঁটিয়া কেবা পাখানি মাজিল গো,
কত চাঁদে মাজিল মুখানি;
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা চিত্র নিরমিল গো,
অপরূপ বাহুর বলনী।
এমন বিনোদিয়া কোথাও না দেখি গো,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে;
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া বিকল গো,
রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে?
মদন বাঁটিয়া কেবা বদন মাজিল গো,
বিনি ভাবে মো মন কান্দিয়া;
ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো,
কেবা দিল চন্দনের রেখা।' চৈতন্যমঙ্গল।

যৌবনের জোয়ার আসিয়া অঙ্গে অঙ্গে যেমন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিল, সেইরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকলও বিকশিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বের গর্ব্বিত ভাব, ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে মাধুর্য্যপূর্ণ বিনয় আত্মাকে অধিকার করিল; তিনি কথা কহিলে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যাইত। চিত্তবিনোদনকারী হাসি হাসিয়া যখন তিনি শাস্ত্রবিচার করিতেন, তখন বিপক্ষপক্ষ, পরাজিত হইয়াও তাঁহার প্রতি কিছু মাত্র বিরক্ত হইত না; বরং তাঁহার মধুর আলাপে ও ভদ্রতা ব্যঞ্জক বিনয়ে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইয়া যাইত।

এই কালে নবদ্বীপনগরে একজন মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিবাস কাশ্মীর দেশে, মধ্বাচার্য্য মঠের শিষ্য; নাম কেশব কাশ্মীরী। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক, ও হস্তী, অশ্ব, দোলা প্রভৃতি বহুতর যান থাকিত। যখন দলবল লইয়া তিনি গমন করিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত যেন একজন রাজা, দেশ জয়ের জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। কথিত আছে যে পণ্ডিতজী স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-বলে দিল্লী, কাশী, গুজরাট, ত্রিহুত, লাহোর, কাঞ্চী, উৎকল, তৈলঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র লইয়া নবদ্বীপজয় করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মহাগর্ব্বিত; ঔদ্ধত্য সহকারে প্রচার করিয়া দিলেন যে, হয় তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করা হউক, নচেৎ সমস্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজয় স্বীকার করিয়া সকলের স্বাক্ষর যুক্ত তাঁহাকে এক জয়পত্র দিউন। লোকে বলিত যে, দিগ্বিজয়ী তপস্যাবলে বাগ্দেবীকে বশীভূত করিয়া ঈদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। ফলে যাহাই হউক, তাঁহার বিদ্যার প্রভাবে কেহ বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

দিগ্বিজয়ীর আগমন বার্ত্তা নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার হইলে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সশঙ্কচিত্তে কালাতি-পাত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা হইল যে, কি জানি যদি তাঁহাদের পরাজয় হয়, তবে নবদ্বীপের চিরগৌরব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সমস্ত বঙ্গদেশের মুখ হেঁট হইবে। এই ভয়ে কেহই দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হইতে চাহিলেন না।

নিমাইপণ্ডিত নিজ টোলে, ছাত্রবৃন্দপরিবৃত হইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, এমত সময়ে তাঁহার কোন কোন শিষ্য আসিয়া দিগ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন যে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীর বরে সকল দেশ জয় করিয়া সম্প্রতি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া আপনার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চাহিতেছে; হয় তাহাকে বিচারে পরাজিত করুন, না হয় পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।

এই কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র মধুর হাসি হাসিয়া ভাবব্যঞ্জকস্বরে ছাত্র-দিগকে উত্তর করিলেন:—

'ওহে ভাই! বলি শুন; ভগবান্ কাহারও অহঙ্কার রাখেন না। দর্পহারী

গোবিন্দ গর্ব্বিত ব্যক্তির গর্ব্ব নাশ করিবেনই করিবেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ লোকের নম্রভাব ধারণ করাই স্বাভাবিক। যদি তাহার বিদ্যার অহঙ্কার হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাহা চূর্ণ হইবে।'

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যাসময়ে সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে চলিলেন; গঙ্গাকে প্রণাম ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্যামল দুর্ব্বাক্ষেত্রে মণ্ডলী করিয়া বসিলেন; এবং শাস্ত্রালাপ, ধর্ম্মকথা প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোচনায় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নির্ম্মল রজনীতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণ প্রবাহিত হইয়া নিদাঘের অঙ্গগ্লানি দূর করিতেছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উত্থিত হইয়া ভাগীরথীর অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল, এবং চন্দ্রকিরণ সংযোগে গঙ্গাজলকণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এমন সুখের সময়ে গৌরচন্দ্র কত সুখেই শিষ্যগণ সঙ্গে আমোদ কৌতুক ও ঘনিষ্টতা করিতে-ছিলেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রগণ যে প্রগাঢ়রূপে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ গৌরাঙ্গ সুন্দরের মধ্যে কি এক আশ্চর্য্য দৈবভাব ছিল, জানি না, যাহার বলে বাল্যকালে বাল্যক্রীড়া-কৌতুকে সহচর বালকগণকে; মধ্যাবস্থায়, অধ্যাপনা সময়ে ছাত্রবৃন্দকে; আর শেষসময়ে ধর্ম্মপ্রচারকালে ধর্ম্মবন্ধুদিগকে; তিনি একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জন্য প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। এক্ষণে কালেজ স্কুলে যেমন বিদ্যালয়ের বাহির হইলে আর গুরুশিষ্যে সম্পর্ক থাকে না; তখনকার নিয়ম সেরূপ ছিল না। শিষ্যগণ গুরুগৃহেই প্রায় বাস করিত ও সর্ব্বদা তাঁহার শাসনাধীনে থাকিত। গৌরাঙ্গের নিয়ম প্রচলিত নিয়ম অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ছিল। তিনি সখ্যভাবে শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হইতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত বন্ধু ও গুরুর কার্য্য করিতেন; কাজেই ছাত্র সকল তাঁহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিত না। যাহা হউক, এই সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে গৌরাঙ্গের সভা দেখিতে পাইলেন; এবং অনুসন্ধানে নিমাই পণ্ডিতের সভা জানিয়া আস্তে আস্তে সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গৌরচন্দ্রের সভাতে উপবেশন করিলে, নিমাইপণ্ডিত অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র ব্যাকরণের অধ্যাপনা করেন, ব্যাকরণ বালকের পাঠ্যশাস্ত্র, অথচ তিনি নিজে একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ইহা মনে করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কিছু অবজ্ঞার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

দিগ্বিজয়ী বলিতে লাগিলেন—'তোমার নাম নিমাইপণ্ডিত? শুনিলাম তুমি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাক। হাঁ! বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার খুব প্রশংসা করিয়া থাকে।'

গৌরচন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'ব্যাকরণ পড়াই বলিয়া অভিমান করি বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অতি অল্পই বুঝিতে পারি।'

দিগ্বিজয়ী। না! না! তোমার শিষ্যদিগের ফাঁকির সিদ্ধান্ত আমি শুনিয়াছি, তাহারা অতি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে। তুমি কিছু শাস্ত্রালাপ কর।

নিমাই। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, আমি নবীন ছাত্র বইত নই; আপনার নিকট মুখ খুলি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই; শুনিয়াছি আপনি মহা কবি; আপনার পাণ্ডিত্য কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

দিগ্বিজয়ী। আচ্ছা, কোন্ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করিব বল?

নিমাই। কৃপা করিয়া কিছু গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া উপস্থিত কবি দিগ্বিজয়ী সগর্ব্বে জাহ্নবীমাহাত্ম্য সূচক কবিতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন; এবং এক ঘটিকার মধ্যে শিলাবৃষ্টির ন্যায় এক শত কবিতা আওড়াইয়া গেলেন। সভাস্থ শিষ্যমণ্ডলী শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। গৌরচন্দ্র অশেষপ্রকারে কবিকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"আপনার প্রতিভাময়ী কবিতা ব্যাখ্যা করা আমাদের সাধ্য নহে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি ইহার দুই একটী কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।"

দিগ্বিজয়ী উত্তর করিলেন, "কোন্ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা শুনিতে চাও?"

তখন নিমাই পণ্ডিত অম্লানবদনে আওড়াইতে লাগিলেন;—

"মহত্বং গঙ্গায়া সততমিদমাভাতিনিতরাং; যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা; দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা; ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।"

"গঙ্গার মহিমা সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে; কারণ ইনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবাহেতু সুভগা; দ্বিতীয়া লক্ষীর ন্যায়, সুর ও নরগণ ইহাঁর চরণ পূজা করিয়া থাকে; এবং ইনি শিবের জটাজুটে বিহার করেন বলিয়া আশ্চর্য্যগুণশালিনী।"

গৌর বলিলেন, 'এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করুন্'। দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোকগুলি আওড়াইয়া গেলাম; ইহার মধ্যে তুমি কিরূপে তাহা কণ্ঠস্থ করিলে?'

গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন—'তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? কেহ বা দেবতাপ্রসাদে প্রতিভাশালী কবি হয়; আর কেহ বা শ্রুতিধর হইয়া থাকে।' তখন কবিবর প্রহৃষ্টমনে কবিতাটী ব্যাখ্যা করিলে গৌরচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, ইহাতে কোন দোষ গুণ আছে কি না?"

দিগ্বিজয়ী বলিলেন 'কবিতায় দোষ মাত্র নাই; উপমালঙ্কার ও কিছু অনুপ্রাস আছে।'

নিমাই পণ্ডিত কহিলেন 'যদি অসন্তুষ্ট না হন ও বালচপলতা মার্জ্জনা করেন, তবে আপনার এই কবিতায় কি দোষ ও গুণ আছে তাহার সম্বন্ধে আমি কিছু বলি। আপনি প্রতিভাপ্রভাবে এই কবিতা রচনা করিলেন, ইহার সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য।'

গৌরের ঈদৃশ প্রগল্‌ভ বাক্যে, ব্রাহ্মণ ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'যা বলিলে তাই বেদ বাক্য আর কি? তুমি ব্যাকরণী পণ্ডিত হয়ে কবিতার অলঙ্কার বিচারে কি জন্য সাহস করিতেছ?'

নিমাই। 'সেই জন্যই তো আপনাকে দোষগুণ বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলিতেছি; অলঙ্কার না পড়িয়া থাকিলেও অনেক শুনিয়াছি। তাহাতেই বলিতেছি, এ কবিতায় গুণ দোষ উভয়ই আছে।'

দিগ্বিজয়ী। আচ্ছা বল দেখি, কি কি দোষ গুণ আছে?

নিমাই। আপনি রাগ করিবেন না; আমি বলিয়া যাই, শ্রবণ করুন্। এই কবিতায় পাঁচ স্থানে পাঁচটী অলঙ্কার দোষ হইয়াছে; দুই স্থলে অবিমৃষ্য বিধেয়াংশ, একস্থানে বিরুদ্ধমতি, ও দুই স্থানে ভগ্নক্রম, দোষ লক্ষিত হইতেছে।

দিগ্বিজয়ী। (বিরক্তির সহিত) দেখাইয়া দাও।

নিমাই। দেখুন গঙ্গার মহত্ত্ববর্ণনাই আপনার মূল বিধেয়; কিন্তু

তাহার অনুবাদ 'ইদম্' শব্দ পরে দেওয়াতে অর্থ অপরিষ্কার হইয়াছে; 'ইদং মহত্ত্বং' বলায় অবিমৃষ্যবিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী। তারপর।

নিমাই। তারপর "দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীঃ" প্রয়োগও ঐ রূপ। সমাসের মধ্যে 'শ্রী' শব্দ দেওয়ায় অর্থ অস্পষ্ট হইয়াছে। 'ভবানীভর্ত্তুঃ' প্রয়োগ বিরুদ্ধমতি দোষযুক্ত। 'ভবানী' শব্দের অর্থই শিবপত্নী; তাঁহার ভর্ত্তা বলিলে দ্বিতীয়ভর্ত্তা বুঝাইতে পারে। 'ব্রাহ্মণপত্নী ভর্ত্তা' বলিলে যেরূপ জ্ঞান হয়, এও তদ্রূপ। আর 'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য সাঙ্গ হইলে তাহার পর 'অদ্ভুতগুণা' বিশেষণ দেওয়ায় এবং প্রথম পাদে 'ত', তৃতীয় পাদে 'র' চতুর্থ পাদে 'ভ' এর অনুপ্রাস আছে, অথচ দ্বিতীয় পাদে তদ্রূপ কিছুই নাই; ইহাতে ভগ্নক্রম দোষ হইয়াছে। এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে সত্য, কিন্তু শ্বিত্ররোগীর পরম সুন্দর শরীরও যেমন কুৎসিত হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ এই সব দোষে শ্লোকের সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

দিগ্বিজয়ী। পাঁচটী অলঙ্কার সম্বন্ধে কি বল?

নিমাই। অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটী শব্দালঙ্কার আর তিনটী অর্থালঙ্কার। প্রথমচরণে পাঁচটী 'ত' কার, তৃতীয়চরণে পাঁচটী 'র' কার ও চতুর্থপাদে ৪টী 'ভ' কার থাকায় অনুপ্রাস; আর একার্থবোধক 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মীঃ' শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় পুনরুক্তিবদাভাস, এই দুইটী শব্দালঙ্কার দেখা যায়। অর্থালঙ্কারের মধ্যে 'লক্ষ্মীরিব' উপমা ও বিষ্ণুচরণোৎপত্তিহেতু গঙ্গার মহত্ত্ব বর্ণনায় অনুমান অলঙ্কার দেখা যায়। তদ্ভিন্ন আপনার কবিতায় আর একটী মহাচমৎকার অলঙ্কার আছে। জল হইতে কমলোৎপত্তিই প্রসিদ্ধ; কমল হইতে কখন জল জন্মে না। কিন্তু এখানে বিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে গঙ্গার জন্ম বলাতে বিরোধালঙ্কার হইয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে; সুতরাং আপাততঃ বিরোধের ন্যায় লক্ষিত হইলেও ইহাতে বিরোধ নাই। এই অলঙ্কারটী অতি সুন্দর হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রের এই সকল সারগর্ভ ব্যাখ্যা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না এবং মাথা হেঁট করিয়া নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। গৌরের শিষ্যবৃন্দ হাসিয়া উঠাতে গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বিনম্র ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়! আপনি অদ্বিতীয়

কবি ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া এরূপ অপ্রতিভ হইতেছেন কেন? প্রতিভার কবিতায় কাহার না দোষ হইয়া থাকে? কালীদাস, জয়দেব, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিদিগের কবিতাতেও ভূরি ভূরি দোষ দেখা যায়। সে হিসাবে আপনার কবিতায় ত অতি অল্পই ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। দোষগুণে কিছু আইসে না; আপনি যে বলিতে না বলিতে এত কবিতা রচনা করিতে পারেন, তাহাই অতীব প্রশংসনীয়। আমি বালক, আপনার পড়ুয়ার সমান হইবারও যোগ্য নাই। আমার বালচাপল্য মার্জ্জনা করিবেন।'

তখন দিগ্বিজয়ী কবি অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও অপমানিত হইয়া বলিলেন, 'ওহে নিমাই পণ্ডিত! ধন্য তোমার বুদ্ধি; অলঙ্কার না পড়িয়াও তুমি কি প্রকারে এই সব অর্থ করিতে সক্ষম হইলে?'

নিমাই পণ্ডিত একটু কৌতুক করিবার জন্য বলিলেন, 'মহাশয়! শাস্ত্রাদি কিছুই জানি না, মা সরস্বতী যাহা বলান তাহাই বলিয়া থাকি।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিতে লাগিলেন, 'তবে বুঝি সরস্বতী আমাকে বিরূপ হইয়া নিমাইয়ের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন; যাহা হউক, আজ রাত্রিতে সকল কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কেন তিনি বালক দ্বারা আমার এত অপমান করিলেন?' কথিত আছে সেই রাত্রিতেই বীণাপাণি স্বপ্নযোগে তাঁহাকে নিমাইয়ের ঈশ্বরত্বের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তিনি গৌরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশে গমন।

দিগ্বিজয়ীজয়ের পর নিমাই পণ্ডিতের যশে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন; বড় বড় বিষয়ী লোক তাঁহাকে দেখিয়া দোলা হইতে নামিয়া অশেষ প্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন; সর্ব্বত্র তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল; এবং ধনাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এখন হইতে যাহার বাটীতে

যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তাহার ভোজ্যবস্ত্র দ্রব্যাদির এক এক অংশ তাঁহার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিত।

শিশুকাল হইতেই গৌরের হৃদয় মহা উদার; দুঃখীকে প্রেম করিতে তাঁহার মত কেহ জানিত না। যেমন এক দিক্ দিয়া তাঁহার ধনাগম হইতে লাগিল, তেমনি অন্য দিকে অজস্র ব্যয় হইতে লাগিল। সঞ্চয় কাহাকে বলে তাহা তিনি তখন জানিতেন না; এবং অর্থ লইয়া যে সাংসারিক সুখ-ভোগ করিতে হয়, তাহা তাঁহার শাস্ত্রে লেখে নাই। এখন হইতে তিনি দুঃখী দরিদ্র দেখিলেই অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতে লাগিলেন; এবং সন্ন্যাসী উদাসীন অতিথিদিগের জন্য বাটীতে এক সদাব্রত খুলিয়া দিলেন। সংসারাসক্তি প্রথমজীবনেও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পর জীবনে যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনকার ত কথাই নাই। এখন যে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রম করিতেছেন, এখনও এক দিনের জন্য সংসার চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিতে পারে নাই। প্রেমই তদীয় জীবনের মহামন্ত্র; প্রেমে আরম্ভ এবং প্রেমেই শেষ। তখন নবদ্বীপে উদাসীন সন্ন্যাসী পরমহংস সর্ব্বদাই আগমন করিত এবং দুঃখী দরিদ্রেরও অপ্রতুল ছিল না। টোলে অধ্যাপনা করিতে করিতে এই সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি মহা সমাদরে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিষ্যদ্বারা জননীকে আহার-সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন ২০।২৫ জন নিরাশ্রয় ও সাধুভক্ত লোক তাঁহার বাটীতে আহার পাইতেন। দ্রব্যাদির আয়োজনের ভার জননীর উপর ছিল। তিনি সে সমস্ত আহরণ করিয়া নব বধূকে রন্ধন করিতে দিতেন। লক্ষ্মীদেবী অল্পবয়সেই অতি সুন্দর পাক করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সে সমস্ত রন্ধন করিলে নিমাই পণ্ডিত অভ্যাগতদিগকে লইয়া জাহ্নবীজলে মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিয়া পরম সুখে ভোজন করিতে আসিতেন। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্তাদির দ্বারা গৃহস্থদিগকে গৃহীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠান করিতেন।

লক্ষ্মীদেবীও তখনকার বঙ্গীয় বধূকুলের আদর্শ ছিলেন। তখন তাঁহার নবীন যৌবন, সে সময়ে সামান্য স্ত্রীদিগের কত আমোদ ও বিলাসের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর তাহা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি কায়-

মনোবাক্যে শ্বশ্রূ ও স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভুলিয়া গিয়া, শ্বশ্রূর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইতেন। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহসংস্কারাদি করিতেন; তৎপরে স্নানান্তে বাটীর বিগ্রহসেবার ও স্বামী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পূজার আয়োজনাদি করিয়া রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; এবং সকলকে আহারাদি করাইয়া ও আপনি ভোজন করিয়া গৃহকার্য্য সমাপনান্তে স্বামীর পাদ সম্বাহন ও ক্ষণকাল স্বামী-সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। নিমাই পণ্ডিতের নিয়ম ছিল আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় টোলে অধ্যাপনা করিতে যাওয়া। এই অবসর সময়ে তিনি ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মধুরালাপ করিতেন। তখনকার দেশের প্রথানুসারে দিবাভাগে স্বামী স্ত্রীতে একত্র থাকা দূষণীয় হইলেও উদারমতি শচীর গৃহে সেরূপ কঠোর শাসন ছিল না। বরং পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্রিত দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

এই সময়ে গৌরচন্দ্রের পূর্ব্বদেশ গমনের ইচ্ছা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে যে ইচ্ছা, সেই কাজ। তাঁহার জীবনে এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে, যাহা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া একবার বুঝিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই পশ্চাৎ-পদ হইতেন না। পূর্ব্বাঞ্চল গমনে তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, ভাল করিয়া জানা যায় না; তবে পরবর্ত্তী কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যে, শিক্ষা বিস্তার করাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। জননীর আজ্ঞা লইয়া ও ভার্য্যাকে মাতৃ সেবার জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া, কতকগুলি প্রিয়শিষ্য সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বাহির হইলেন; এবং কিয়দ্দিনান্তর পদ্মানদীর তীরে আসিয়া উপনীত হই-লেন। পদ্মানদীর কোন্ ভাগে গমন করিয়া ছিলেন ও কোন্ কোন্ দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহা জানা যায় যে, কয়েক মাস ধরিয়া ঐ দেশে অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। তৎকালে তাঁহার যশঃসৌরভ সমস্ত বাঙ্গলা দেশে বিকীর্ণ হইয়া-ছিল; তাই তাঁহার আগমনবার্ত্তা রাষ্ট্র হইবামাত্র বহুসংখ্যক পাঠার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে লাগিল। কথিত আছে এই সকল লোক তাঁহার কৃত টিপ্পনীর সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেছিল, ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহাকে স্বদেশে পাইয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনিও টোল করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

নিমাই পণ্ডিতের প্রণীত কোন টিপ্পনী এক্ষণে দেখা যায় না; কিন্তু এতদ্বারা জানা যাইতেছে তিনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে অবস্থিতি কালে তপন মিশ্র নামে এক নিরীহ সারগ্রাহী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে তপনমিশ্র অনেক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভের প্রকৃত পথ কি ও ঈশ্বরতত্বই বা কাহাকে বলে? তৎসম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার প্রকৃত উপায় জানিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের নিকটে যাইলে তাঁহার সকল সংশয় অপনোদন হইবে। স্বপ্নের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকটে আগমন করিয়া আত্ম বিবরণ নিবেদন করিলে গৌরচন্দ্র বলিলেন যে "প্রতিযুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান্ যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন; সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর সেবা ও কলিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন, এইরূপে যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত কুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন; নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম হইবে; তখন আপনি অনায়াসে ঈশ্বরতত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বর তত্ব কি? তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না; আপনা আপনি অনুভব করিতে হয়।" কথিত আছে যে, গৌরের এই উপদেশ বাক্যে ব্রাহ্মণের চক্ষুরুন্মীলিত হইল। তখন সে তাঁহার সহিত থাকিবার জন্য ইচ্ছা জানাইলে গৌরাঙ্গদেব তাঁহাকে বারাণসী গমন করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, 'ভবিষ্যতে ঐ নগরীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।" তপনমিশ্র তদনুসারে বারাণসী নগরীতে চলিয়া গেলেন। চৈতন্যজীবনের পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা যাইবে যে, সন্ন্যাসের পর যখন তিনি কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন দুই মাস কাল এই তপনের গৃহে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন এবং এ ব্যক্তি তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা পাঠে স্বভাবতঃই মনোমধ্যে কয়েকটী কথা উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তখন পর্য্যন্ত ত গৌরচন্দ্র ধর্ম্মোপদেষ্টার ভার গ্রহণ করেন নাই; তবে কিরূপে তপনমিশ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়? দ্বিতীয়তঃ তিনি কি তখন জানিতেন যে, পর জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে তপনের গৃহে অবস্থিতি করিবেন? যদি, তাহা জানিতেন,

তবে ইহার পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করা সম্ভব হয় কি না? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার ইচ্ছাই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সে সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারি না। তবে আমরা এসম্বন্ধে কি বলিব? আমরা কি বলিব যে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত জানিয়া তপনমিশ্রকে কাশী যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন? বড় কঠিন সমস্যা। তবে যদি উপাখ্যানটীকে অত্যুক্তিতে অনুরঞ্জিত বলা যায়, তাহা হইলে মীমাংসার বিষয় অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। তপনমিশ্রের সহিত পরিচয় ও তাঁহার উপদেশে তপনের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়া ও বৈরাগ্যের উত্তেজনায় কাশী গমন করা, ইহার কিছুই অসম্ভব নহে। তবে গৌরাঙ্গ যে স্বীয় ভবিষ্যৎসন্ন্যাস জানিয়া তাঁহাকে কাশী যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন;—

"প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি;
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী?"

গৌরচন্দ্র পরম সুখে পূর্ব্বাঞ্চলে বসতি করিতেছেন, এদিকে নবদ্বীপে তাঁহার গৃহে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার বাটীত্যাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে সর্পাঘাতে তাঁহার পত্নীর প্রাণবিয়োগ হইল; বিকাশোন্মুখ কুসুম কলিকাতেই শুকাইয়া গেল। শচীর গৃহ বিষাদের অন্ধকারে আবৃত হইল। প্রাণের সদৃশ প্রিয়তমা বধূর বিয়োগে শচীমাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং তাঁহার কাতরক্রন্দনে কঠিন পাষাণও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বোধ হয়, সন্ন্যাসে গেলে পতির বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিশ্বজননী আপনার প্রিয়কন্যাকে অমৃতময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং অপ্রিয় সংবাদ দিয়া গৌরচন্দ্রকে ব্যথিত করা অবৈধ বোধে কোন সমাচার পাঠাইলেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্পদংশনে লক্ষ্মীর পরলোক যাত্রা স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিয়া বলেন যে, স্বামীবিরহই ভুজঙ্গ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল।

কিয়দ্দিন পরে গৌরচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে

বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে নানা প্রকার ধন সামগ্রী উপঢৌকন দিতে লাগি-লেন। তিনি সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বোধ হয়, এই তাঁহার জীবনের শেষ উপার্জ্জন।

বহু শিষ্য ও ধন সম্পত্তিতে পরিবৃত হইয়া নিমাই পণ্ডিত স্বভবনে উপ-নীত হইলেন। তখন তাঁহার উৎসাহে হৃদয়পূর্ণ এবং অনেক দিনের পর জননী ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় প্রাণ আশান্বিত। কিন্তু হায়! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আশা ভীষণ নিরাশায় পরিণত হইবে। বাটী আসিয়া নিমাই জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তে অর্থ সামগ্রী প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমতী শচী ঠাকুরাণী হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তিনি যাহাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য পত্নীবিয়োগ সংবাদ জানিতে না পারেন, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। গৌরচন্দ্র আহারান্তে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া আত্মীয়দিগের নিকট বঙ্গদেশের কথা বলিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গালের কথা অনুকরণ করিয়া কতরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ কেহই অপ্রিয় সংবাদ বলিতে সাহসী হইলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী অতি বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়া আছেন। বহু দিনের পর বাটী আসিয়াছেন, ইহাতে জননীর মনে কত আনন্দ হইবে; তাহার পরিবর্ত্তে তিনি বিমর্ষ চিত্তে রহিয়াছেন দেখিয়া গৌরের মনে কতকটা সন্দেহ হইল। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক প্রতিবেশী তাঁহাকে পত্নীর বিয়োগ সংবাদ বুলিয়া ফেলিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহি-লেন; নীরবে অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কিছু অভিভূত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু পরক্ষণেই জননীর কাতর ক্রন্দন শ্রবণ ও নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পুত্রের মধুর সান্ত্বনায় শচীদেবী ক্রমে ক্রমে শোক সংবরণ করিতে পারিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় বিবাহ।

রঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর গৌরচন্দ্র পুনরায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার টোল বসিত; বঙ্গদেশে অনুপস্থিতি সময়ে টোলের কার্য্য বন্ধ ছিল। তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র পাঠার্থীগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার বিদ্যা-চর্চ্চায় সঞ্জয়ের বাড়ী গরগরম হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, পত্নী বিয়োগের শোকের তীব্রতা ততই হ্রাস হইতে চলিল, শাণিত ক্ষুর ধারে মর্চ্চে পড়িয়া গেল। অবশেষে হৃদয়ের অন্তরন্তলে শোকের এক কাল আবরণ পড়িয়া থাকিল; স্মৃতির আকাশে একটী বিষাদের রেখা মাত্র থাকিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নিমাই পণ্ডিত গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি তাঁহার পড়ুয়াদিগের মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি ও কপালে তিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের করণীয় অনুষ্ঠান করিতে না দেখিলে অথবা দুর্নীতিপরায়ণতা লক্ষ্য করিলে, পরিহাস ও উপদেশচ্ছলে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহার জীবনের এই এক বিশেষ ভাব দেখা যায় যে, শেষ জীবনে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাগবর্ত্মে ধর্ম্ম সাধন করাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ইত্যাদি মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনধিকারী ব্যক্তিদিগকে কখন বেদবিহিত আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম শূন্য হইতে উপদেশ দিতেন না; বরং তাহাদিগের বিশ্বাসানুসারেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। যেখানে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, প্রচলিত মত পরিত্যাগ করিয়া উপদিষ্ট ব্যক্তি উচ্চতর ও পবিত্রতর সাধনাঙ্গে উঠিতে পারিবে না, সেখানে তাহার বিশ্বাসের উপর আঘাত করিয়া তাহাকে নাস্তিকতার সন্দেহ দোলায় নিক্ষেপ করা তাঁহার মতে অতীব দূষণীয় ছিল। এ সম্বন্ধে এক্ষণকার প্রচারপ্রণালী অপেক্ষা তাঁহার পথ অতি পরিষ্কার ও সমুন্নত বলিয়া বোধ হয়। উপদিষ্টের বর্ত্তমান বিশ্বাসের ভিতর দিয়া তিনি আস্তে আস্তে এমন কৌশলে তাহাকে উপরের সিঁড়িতে লইয়া যাইতেন যে, অবশেষে শিষ্যের বুঝা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত কেমন করিয়া তাহার জীবনে এত সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

প্রাণের প্রিয়তম ভার্য্যার পরলোকগমনেই হউক বা দুরতিক্রমনীয় স্বভাবের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারায় জন্যই হউক, এ বয়সেও গৌর-

চন্দ্রের বাল্যচপলতা আবার দেখা দিতে লাগিল ; একটু একটু করিয়া দুষ্ট সরস্বতী স্কন্ধে ভর করিতে লাগিল। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া টোলে যাইতেন, মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই আবার বিদ্যালয়ে যাইতেন, এবং নিশীথ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন ; ইহার মধ্যে সায়াহ্নে কেবল একবার সশিষ্যে গঙ্গাতীরে ও নগরীর পথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। সে সময়ে নানারূপ হাস্য পরিহাসে সময় অতিবাহিত হইত। এমন লোক ছিল না যে তাঁহার বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ না হইত। কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সমাদর ছিল। পথে ঘাটে মহিলাদিগকে দেখিলেই তিনি সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে গৌরচন্দ্র বাঙ্গালের কথা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপে বাঙ্গালের অভাব ছিল না ; সুতরাং পথে ঘাটে বাঙ্গাল দেখিলে আর রক্ষা থাকিত না। বাঙ্গালের কথা ও স্বর অনুকরণ করিয়া বিবিধ ভঙ্গীসহকারে বিদ্রূপ তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। কোন কোন দিন শ্রীহট্টবাসীদিগের সহিত ভয়ানক ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়া যাইত।

গৌরচন্দ্র বলিতেন 'অয়! অয়! তুমি না শ্রীঅট্টবাসী?' তাহারা উত্তর করিত 'অয়! অয়! তুমি নি কোন্ দেহী কওতো? তোমার হৌব্দপুরুষ যে শ্রীঅট্টবাসী।' তাহাদের প্রচুর ক্রোধোদ্রেক না হইলে গৌর ছাড়িতেন না। তাহারা গালি দিতে দিতে পাছে পাছে ছুটিত ; গৌরচন্দ্র পলাইয়া যাইতেন। কখন বা ধরিতে পারিলে তাঁহার কোঁচা ধরিয়া টানিয়া বাঙ্গালগণ শীকৃদারদিগের দেওয়ানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। তখন পাঁচজন মধ্যে পড়িয়া মিটাইয়া দিত।

অনেক দিন হইতে শচীমাতা পুত্রের পুনঃ দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এক্ষণে তনয়ের দিন দিন চঞ্চলতা বৃদ্ধি দেখিয়া ঐ চিন্তা তাঁহার মনে আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন নববধূর মুখ দেখিলে নিমাই হয়ত চাপল্য পরিহার পূর্ব্বক সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু নবদ্বীপে পুত্রের উপযুক্ত কন্যা দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল "সনাতন রাজপণ্ডিতের একটী সর্ব্বগুণযুক্ত মেয়ে আছে ; মেয়েটীকে তিনি বাল্যকালে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতে দেখিতেন। কন্যাটী যেমন সুশ্রী, তেমনি নম্র ও মধুর-

প্রকৃতি, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া; সেই মেয়েটীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটনা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।" সনাতন পণ্ডিত নবদ্বীপের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ব্যক্তি, অতি সচ্চরিত্র, উদার সরলস্বভাব এবং সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। তাঁহার বিষ্ণুভক্তি ও আতিথেয়তা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার পদবী রাজ-পণ্ডিত। কি কারণে ঐ পদবী হয়, জানা যায় না; তবে তিনি যে একজন গণ্য মান্য ও ধন সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শচীদেবী পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া কাশীনাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিলেন ও তাহার প্রমুখাৎ সনাতন পণ্ডিতের নিকট আপন প্রস্তাব বলিয়া পাঠাইলেন। মিশ্র মহাশয় পণ্ডিতজীর সভায় গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে রাজপণ্ডিত আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্বম্ভরকে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাশী-নাথ এই শুভ সম্বাদ শচীকে অবগত করিলে, তিনি আত্মীয়স্বজন লইয়া মহা আনন্দের সহিত বিবাহের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মীয় দিগের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে একজন ধনী ছিলেন; তিনি বিশ্বম্ভরের পরম হিতকারী বন্ধু ও হিতৈষী। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন "ইহার সমস্ত ব্যয়ভার আমি একা নির্ব্বাহ করিব; আর এ বিবাহ সামান্য বামুনে রকমে দেওয়া হইবে না; রাজপুত্রের পরিণয়ের ন্যায় ঘটা করিতে হইবে।" মুকুন্দসঞ্জয়ও এই প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। অধ্যাপকের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণে সকল শিষ্যেরাই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলে গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ প্রথম বিবাহ হইতে যে শতগুণে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ দিকে কন্যাপক্ষেও সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনাদি হইতে লাগিল। সনাতনপণ্ডিত একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ রাজকীয় সমারোহে সম্পন্ন হইবে না কেন? এইরূপে সমস্ত আয়োজনাদি সমাধা হইলে, বিবাহ সম্বন্ধ একদিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় যায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাজপণ্ডিতগণক ডাকা-ইয়া বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিবার জন্য আদেশ দিলেন। গণক কহিল 'পথে আসিতে আসিতে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিলে তিনি কাহার বিবাহ? কি বৃত্তান্ত?

বলিয়া, কথা উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে আপনার যে অভিরুচি হয় করুন্।"

গণকের মুখে এই কথা শুনিয়া সনাতন পণ্ডিত দুঃখে, অভিমানে ও ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, যখন গৌরাঙ্গ তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বড় একটা উৎসুক নহেন; তখন তিনি যাচিয়া কন্যা দান করিবেন না।

লোচনদাস লিখিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভরকে সনাতনের ঈশ্বর জ্ঞান ছিল; সে জন্য যখন তিনি শুনিলেন যে, বিশ্বম্ভর তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে তাদৃশ সমুৎসুক নহেন, তখন তাঁহার দুঃখের পরিসীমা থাকিল না। তিনি দিবা রাত্রি "গৌরাঙ্গ ধন হইতে বঞ্চিত হইলাম" বলিয়া ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন ও বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এই চিত্রটী অতিরঞ্জিত। কারণ তখন পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ জীবনে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যে তাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে। বিশেষতঃ এ বিবাহের প্রস্তাব কিছু কন্যাপক্ষ হইতে উঠে নাই। গৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী আচরণও এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে লোচন দাস একজন গৌরভক্ত; চৈতন্যাবতারে তাঁহার অটল বিশ্বাস; চৈতন্যচরিতে তাঁহার গাঢ় প্রেমভাব। সেই ভাবাবেগের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের প্রতি কথায়, প্রতি বর্ণনায় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তদীয় মনের উচ্ছ্বসিত ভাবের ঢেউ সনাতন পণ্ডিতের কার্য্যে ও কথায় যাইয়া লাগা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

গণকের বাক্যে এতদূর হইয়া উঠিয়াছে জানিতে পারিয়া বিশ্বম্ভর অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন; এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক প্রিয় ও বিশ্বাসী বয়স্যকে নিভৃতে ডাকিয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন এবং নিম্ন লিখিত উপদেশ দিয়া তাঁহার ভাবী শ্বশুরের নিকট পাঠাইলেন। গৌর বলিয়া দিলেন "তুমি কোন ব্যপদেশে পণ্ডিতের সভায় যাও, আমি যে তোমাকে পাঠাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি বলিতে পার যে গণকের সঙ্গে আমি কৌতুক করিয়াছি মাত্র; ইহাতে তাঁহারা কেন কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছেন? আমার কথায় তাঁদের প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছে তাহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমার মা যা করেছেন,

তাহাতে আর আমার কি কথা আছে? মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার সাধ্যাতীত।”

গৌরাঙ্গের বয়স্যের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজপণ্ডিতের সকল সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি মহানন্দে ও উৎসাহে বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য করিলেন। বর ও কন্যা উভয়ের বাটীতেই মহা ধূম পড়িয়া গেল। প্রথমে অধিবাস। অধিবাসদিনে বাটীতে বড় চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইল; চারি দিকে কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন ও আম্রশাখায় বেষ্টন করা হইল। মেয়েরা আঙ্গিনাতে আলিপনা দিয়া অনুরঞ্জিত করিলেন এবং মঙ্গল কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈষ্ণব প্রভৃতিকে অধিবাসের পানগুপারী লওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল।

অপরাহ্ন অধিবাসের নিয়মিত সময়। একে একে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; ভাটগণ রায়বার গাইতে লাগিল ও পুরস্ত্রীরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। সভার মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র সমাসীন হইলে পান গুপারী বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণের অন্ত নাই; সুতরাং কত লোক আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা হইল না। বিতরণ পদ্ধতিও মন্দ নয়; প্রত্যেকের কপালে চন্দন ও মস্তকে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া এক এক বাটা পান দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ জাতি চিরকালই লোভী; অনেকে একবার লইয়া বেশ-বদলাইয়া প্রতারণাপূর্ব্বক বহুবার লইতে লাগিল। উদারস্বভাব গৌরচন্দ্র এই উৎপাত লক্ষ্য করিয়া তাহা নিবারণের একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া বন্ধুগণকে বলিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন জনের পরিমাণ দেওয়া হউক। এই উপায় অবলম্বন করাতে শঠতা প্রতারণা তো তিরোহিত হইল; বরং সকলে একবাক্যে জয় জয়ধ্বনি করিয়া গৌরের প্রভূত গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

তৎপরে রাজপণ্ডিত আত্মীয় ও বিপ্রবর্গে পরিবৃত হইয়া নৃত্যগীত ও অধিবাসসামগ্রী সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে উপনীত হইলেন ও বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া গৌরের অঙ্গে গন্ধ স্পর্শ করাইয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বম্ভরের আত্মীয়গণও এইরূপে কন্যার আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলে সেদিনকার উৎসব শেষ হইল।

অধিবাসের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই স্ত্রীগণ নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে জল সহিয়া আসিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বিশ্বম্ভর আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়াগঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিতে বসিলেন। এ দিকে গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, নারীদিগকে তৈল হরিদ্রাদি বিতরণ প্রভৃতি স্ত্রীআচার সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অপরাহ্নে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দিগকে সামাজিক মান ও অবস্থানুসারে ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি দান করা হইল। বেলা অবসন্ন হইলে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল ও বরের বেশবিন্যাস হইতে লাগিল।

পুরস্ত্রীগণ গৌরের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চন্দন তিলক দিলেন। শিরে সুন্দর মুকুট, গলায় সুগন্ধি পুষ্পের মালা রাজি, নয়নে কজ্জল, পরিধেয় পীতবর্ণের পট্ট বস্ত্র, শ্রুতিমূলে স্বর্ণ কুণ্ডল এবং হস্তে দর্পণ শোভা পাইতে লাগিল।

এক প্রহর বেলা থাকিতে বিবাহযাত্রা বাহির হইল। জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের পদধূলি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিচিত্র দোলায় চড়িয়া বিবাহ বিজয় করিলেন ও এক প্রহরকাল নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া গোধূলি সময় কন্যালয়ে উপস্থিত হইবেন, পরামর্শ হইল। প্রথমে ভাগীরথীতীরে যাইয়া গঙ্গাদর্শন ও প্রণামান্তে নগরের পথে পথে বিবাহ যাত্রা মহা ধূমধামে বেড়াইতে লাগিল। সাজ সজ্জা ও বাদ্য ভাণ্ডের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস এইরূপে করিয়াছেনঃ—

'বুদ্ধিমন্ত খানের আদেশে পরম সুন্দর দোলা সজ্জিত হইয়া আনীত হইলে বিশ্বম্ভর তদুপরি আসীন হইলেন; ব্রাহ্মণগণ সুমঙ্গল বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন, ভাটগণ রায়বার পড়িতে লাগিল, আগে আগে বুদ্ধিমন্তের পদাতিক ও পাটোয়ারগণ দোসারি হইয়া চলিল, তাহার পশ্চাতে নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া কতক লোক, তাহার পশ্চাতে বিদূষক, ভাঁড় ও নর্ত্তকীগণ নাচিতে নাচিতে চলিল, তাহার পর জয় ঢাক, বীর ঢাক, মৃদঙ্গ কাহাল, দামামা, দগড় বংশী করতাল, বরগো শিঙ্গা ও পঞ্চশব্দী বেণু শ্রেণীবদ্ধক্রমে বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকরেরা চলিল এবং তাহার মধ্যে প্রায় সহস্র বালক নাচিতে নাচিতে চলিল। বিবাহযাত্রা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া গেল ও বলিতে লাগিল 'এই নবদ্বীপে আমরা

অনেক জাঁকজমকের বিবাহ দেখিয়াছি বটে; কিন্তু এমন অমানুষী বিবাহ-শোভা তো কখন দেখি নাই'। যাহাদের ঘরে রূপবতী কন্যা ছিল; তাহারা এমন বরে সম্প্রদান করিতে পারিল না বলিয়া বিমর্ষ হইল।

এই সব বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও অসম্ভব নহে। তবে কথা হইতেছে যে দুই বৎসর পরে এমন সাধের পরিণীতা ভার্য্যাকে যিনি পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের বেশে পথে পথে হরিনাম বিলাইয়া বেড়াইবেন, তাঁহার পক্ষে কি এমন ঘটা করিয়া বিবাহ করা সাজে? সাজে বৈ কি? নইলে মনুষ্যের অদূরদর্শিতা থাকে কোথায়? গৌরচন্দ্র অসাধারণ মানুষ হইলেও মানুষ; ভগবৎপ্রেরিত হইলেও মানবীয় দুর্ব্বলতার অধীন; তাই এই অপরিণামদর্শিতা। প্রিয় পাঠক! ইহাকে লোকশিক্ষার্থ অমানুষী লীলা বলিতে চাও বল; কিন্তু তাহাতে মানবত্ব ডুবে না। ভগবত্বে মানবত্ব অসম্ভব; মানবত্বে ভগবত্বই তত্ত্বকথা।

ঠিক্ গোধূলি সময়ে বৈবাহিকদল রাজপণ্ডিতের বাটীতে প্রবেশ করিল। তখন উভয় দলের বাদ্যতরঙ্গে, লোককোলাহলে ও আলোক মালায় উৎসব প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল। কন্যাকর্ত্তা স্বদলে সমবেত হইয়া জামাতাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ক্রমে বরণ, স্ত্রী আচার, সাতপাক, মালাবদল ও সম্প্রদান সকলই সম্পন্ন হইল। লোকের হৈ হৈ চৈ চৈ, স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি, উভয় দলের হাস্য পরিহাস, শঙ্খাদির মাঙ্গল্য রবে মিশিয়া অন্তঃপুরের গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সে রাত্রি সেই ভাবেই কাটিয়া গেল। বাসরশয্যায় পাড়ার মেয়েদের সরল ও কুটিল নানা রকমের তামাসা, ও গণ্ডগোলে নবদম্পতীর নিদ্রা মাত্র হইল না। প্রাতে কুশণ্ডিকাদি সমাপ্ত হইলে পণ্ডিতজী পরমসন্তোষে বরযাত্রীদিগকে ভোজন করাইলেন ও ধেনু, ভূমি, ধনরত্ন ও দাসদাসী প্রভৃতি যৌতুক দিয়া অপরাহ্নে কন্যাজামাতাকে বিদায় দিলেন। পূর্ব্ব দিনের ন্যায় স্বদলে সমস্ত নগরী প্রদক্ষিণ করিয়া গৌরচন্দ্র সন্ধ্যারাত্রিতে নবোঢ়া বধূ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহা দেখিয়া জননীর আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল।

'শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বম্ভর,
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে;

আনন্দে বিহ্বল হিয়া, এয়োগণ মাঝে গিয়া,
বধূকোলে শচীর নাচনে।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গয়াগমন।

কথিত আছে, এই সময়ে ধর্ম্মশূন্য জগৎ দর্শন করিয়া নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদল সর্ব্বদাই দুঃখানুভব করিতেন; এবং জীবের দুঃখ দর্শনে রোদন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে এমন কয়জন আছে? সকলেই আপন আপন সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত। তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দেখিলে লোকে বিদ্রূপ করিত, সঙ্কীর্ত্তনে ও ভজনে বাধা দিত, নানারূপে অত্যাচার করিত ও শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়া দিত। করুণহৃদয় বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া কায়মনোবাক্যে জীবনিস্তারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অসহায়ের সহায় যিনি, তিনি এই সময়ে একটী সরল প্রেমিক ও অকপট ভক্ত জুটাইয়া দিয়া ভক্ত মণ্ডলীর উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। যে প্রকারে হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তদলে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

লোকে বলে পাতাচাপা কপাল, আর পাথরচাপা কপাল। পাথর চাপা কপালে পাথরও উঠে না, কপালও ফলে না। গৌরের কপাল পাতাচাপা; একটু বাতাসে পাতাটী উড়ে যাওয়া মাত্র কপাল ফলে গেল। স্নিগ্ধ কোমল জলগর্ভা নির্ঝরিণীর মুখ দুই চারিটী তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত ছিল, কোথা হইতে একটু নির্ম্মল দক্ষিণা বাতাস বহিল, তৃণ কয়টী সরিয়া গেল, আর প্রমুক্ত মুখ দিয়া শীতল নির্ম্মল জল অনর্গলধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ গৌরের ধর্ম্ম জীবনবিকাশের গয়াগমন উপলক্ষ মাত্র। বিধাতা তাঁহার হৃদয়প্রস্রবণে প্রেমভক্তিরসের সুধারাশি স্বহস্তে পূরিয়া দিয়া উপরে শাস্ত্রজ্ঞানের একখানি শরাব আঁটিয়া দিয়া ছিলেন। আবরণখানি সরিয়া যাওয়ায় তাহার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত বেগে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিল; জাতিকুল ধনমানের পর্ব্বত তাহাকে কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে পারিল না।

দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পিতৃকৃত্য করিবার জন্য জননীর আজ্ঞা লইয়া গৌরচন্দ্র গয়ায় চলিলেন ; সঙ্গে অনেকগুলি শিষ্য ও কোন কোন আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন। সঙ্গীদিগের সঙ্গে নানারূপ শাস্ত্র ও ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে শচীনন্দন বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিলেন। নানা দেশের নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে তাঁহার উদারচিত্ত আরও উদারতা লাভ করিল, মন যেন অনন্তের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং তিনি অননুভূত নির্ম্মলসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তাঁহার প্রাণে যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাহা তিনিও তখন বুঝিতে পারেন নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, উষাগমের ন্যায় শুভ ঘটনার পূর্ব্বাভাস প্রাণের অভ্যন্তরে দেখা দেয় ; এখন বিশ্বম্ভরের জীবনাকাশে সেই আভাস লক্ষিত হইতেছিল। এক জায়গায় পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটী কুরঙ্গ মিথুনের দাম্পত্য ক্রীড়া দর্শনে গৌরচন্দ্র সঙ্গীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ—'দেখ ভাই ! কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদি রিপুগণের শাসনে পশুরা নিরন্তর উন্মত্ত। পশুদিগের মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, মানুষেও তাহাই আছে ; তবে মানুষের বিশেষত্ব এই যে তাহার কৃষ্ণজ্ঞান আছে। শ্রীকৃষ্ণ না ভজিলে মানুষ এই পশু হইতেও অধম'। গয়াপথের আর একটী বৃত্তান্ত উল্লেখ করা উচিত। চির নামে নদীতে স্নানাবগাহন করিয়া যাত্রীদল মন্দার পর্ব্বতে উঠিয়া মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে নামিয়া বিগ্রহ পূজক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। সে দেশের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার এদেশের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাহা দেখিয়া সমভিব্যাহারী যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৃহস্বামীকে অবজ্ঞাকরিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ তাহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার প্রাণে মানুষের বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তের অপমান সহ্য হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। সঙ্গের শিষ্যগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার রোগ শুশ্রূষা ও ঔষধপ্রয়োগ করিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই ব্যাধির হ্রাস হইল না। তখন রোগী আপনার চিকিৎসা আপনিই করিলেন। কথিত আছে যে, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের পাদোদক লইয়া পান করায় তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলেন। যাঁহারা সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থই এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। তাঁহারা

আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিলে গৌরসুন্দর এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন ;—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ;
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

অর্থ—তোমরা বামনাইর বড়াই করিও না ; ভক্তিবিহীন বামুনও চণ্ডাল ; আর ভক্তিমান্ চণ্ডালও পূজনীয়।

কিছুদিনান্তে যাত্রীদল গয়াধামে উপনীত হইল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রীগণ চক্রবেড়ের মধ্যে গিয়া বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করিলেন। গয়ালী পাণ্ডাগণ পাদচিহ্নের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল ; গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবোচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল ; কত ভাবলহরীই যে প্রাণে উঠিতে লাগিল, তাহা বর্ণনায় শেষ হয় না। তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই ভাবময় ; এতদিন কেবল পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বরে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। শুভক্ষণে আবরণ উন্মুক্ত হওয়ায় হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহার পর দেখা যাইবে যে, অল্পমাত্র উদ্দীপনাতেই তদীয় ভাবাবলি অসমোর্দ্ধভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। গয়া পথে সেই উদ্দীপনার আরম্ভ ; গয়াক্ষেত্রে তাহার গাঢ়তা এবং শেষে তাহার অদম্য উচ্ছ্বাস। ইহাই তাঁহার জীবনের উজ্জ্বল ছবি ও এই প্রগল্‌ভা ভক্তি শিখাইতেই তাঁহার মর্ত্ত্যে অবতরণ।

বিধাতার গূঢ় বিধান অতি বিচিত্র ! যে যা চায়, সে তা পায়, কথার সার্থকতা যদি কোনখানে থাকে, তবে তাহা সাধু জীবনেই লক্ষিত হইবে। হরিচরণ পাইবার লালসায় ধ্রুব ব্যাকুল হইয়া বাহির হইলেন, অমনি সদুপদেষ্টা নারদের সাক্ষাৎকার লাভ হইল ; দেবনন্দন ঈশা পিতার অন্বেষণে ব্যাকুল ; অবগাহক যোহন হাজীর। গোরাচাঁদের প্রাণে ভগবতৃষ্ণা যেই প্রবল হইল, অমনি সদ্‌গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে হঠাৎ তাঁহার পুনর্ম্মিলন হইল।

"দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে ;
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে।"

সেই নবদ্বীপে সাক্ষাৎ, তাহার পর এই দেখা হইল। তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা—আকাশ পাতাল ভেদ ভাবিয়া গৌরচন্দ্র কিছু লজ্জিত

হইলেন। পুরীকে প্রণাম করিলে পুরীগোঁসাই গাঢ়প্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও উভয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শচীনন্দন পুরীকে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "আমার গয়ায় আসা সার্থক হইল; কথিত আছে যাহার নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া যায়, সেই উদ্ধার হয়; কিন্তু আপনাকে দেখিলে কোটি কোটি পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। আপনি সকল তীর্থের সারতীর্থ; আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করান্।"

ঈশ্বর পুরীও গৌরের পাণ্ডিত্য ও গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন "ওহে নিমাই পণ্ডিত! আমি সত্য বলিতেছি যে তোমাকে দেখিলে আমার পরমানন্দ লাভ হয়; আমার বোধ হয় তোমাতে ঈশ্বরাংশ আছে; নইলে তোমাকে দেখিলে কৃষ্ণদর্শনের সুখ হইবে কেন?" এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেনঃ—হাঁ 'আপনার বড়ভাগ্য বলিতে হইবে।'

ইহার পর কিছু সময়ের জন্য উভয়ে বিদায় লইলে গৌরচন্দ্র লৌকিক কার্য্য করিতে লাগিলেন; ফল্গুতীর্থে বালীর পিণ্ডদান, গিরি শৃঙ্গে প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধ, রামগয়া, যুধিষ্ঠিরগয়া, ভীমগয়া, ষোড়শীগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্ম-গয়া প্রভৃতি স্থানে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে গয়াশিরে পিণ্ডদান ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ বাসায় আসিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঢুলিতে ঢুলিতে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরসুন্দর রন্ধনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরম সম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া পুরীকে বসাইলেন। পুরী গোঁসাই প্রস্তুতান্ন দেখিয়া বলিলেনঃ—'আমি ভাল সময়ে আসিয়াছি।' গৌরচন্দ্র পুরীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেনঃ—

'আমার ভাগ্যে যদি আসিয়াছেন, তবে এই অন্ন ভোজন করুন।' পুরী বলিলেন "তুমি কি খাইবে?" গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন "আমি আবার রাঁধিব?"

পুরী। "আর পাকের প্রয়োজন কি? যে অন্ন আছে তাহা দুই জনে ভাগ করিয়া খাই না কেন?"

গৌরাঙ্গ। "তা হবে না! আপনাকে সব অন্ন খাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়াদিয়া সমস্ত অন্নব্যঞ্জন স্বহস্তে পরিবেশন করতঃ ঈশ্বর পুরীকে ভোজন করাইলেন ও আপনার জন্য পুনঃ

পাক করিয়া লইলেন এবং ভোজনান্তে মাল্য চন্দন দিয়া পুরীর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যদিনে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বরপুরীকে নিভৃতস্থানে পাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গোঁসাই উত্তর করিলেনঃ—

"পুরী বলে মন্ত্র বলিয়া কোন্ কথা ?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।"

তৎপরে ঈশ্বর পুরীর নিকট গৌরচন্দ্র দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষাগ্রহণ সাধারণ লোকের ন্যায় নহে। প্রথমে যত দিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতার উদয় হয় নাই, তত দিন তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তাও করেন্ নাই; ব্যাকুলতা আসিলে আত্মার বলাবল ও আভ্যন্তরীণ স্পৃহা পরীক্ষা করিয়া গুরুপ্রকৃতি নির্ণয় করিয়া লইলেন এবং শ্রদ্ধাভক্তির উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিলেন। দীক্ষান্তে নবশিষ্য অভীষ্টদেবকে নিবেদন করিলেনঃ—'এই দেহ প্রাণ মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি প্রসন্ন হউন্; আমি যেন অচিরে কৃষ্ণ প্রেমসাগরে ভাসিতে পারি'।

তখন গুরুশিষ্যে প্রেমে পুলকিত হইয়া পরস্পর গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। উভয়ের পুলকাশ্রুতে উভয়ের শরীর অভিসিঞ্চিত হইল; মহাভাবের পূর্ব্বাবস্থা দেখা গেল।

এখন হইতে দিন দিন গৌরের ধর্ম্মরাজ্যের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল; দিন দিন ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতে চলিল। পূর্ব্বের বিদ্যা গৌরব ও দাম্ভিকতা কোথায় পলায়ন করিল? ভগবৎ প্রেম সাগরে তিনি ভাসিতে লাগিলেন। সে নিমাই পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার সম্বন্ধে দিন দিন সকলই নূতন ও আশ্চর্য্য দেখা যাইতে লাগিল। বিধাতার করুণাহস্ত তাঁহার আত্মাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নবভাবে গঠন করিয়া জগতে হরিভক্তি ও হরিলীলা প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিল। ইহারই নাম নবজীবন লাভ। দীক্ষাগ্রহণের পর কতক দিন তিনি গয়াতে ছিলেন; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। "কোথা যাই? কোথা যাইলে তাঁহাকে পাই? কেমন করিয়াই বা প্রাণের তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়?" নিরন্তর কেবল তিনি এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, আলাপে, কিছুতেই স্বাস্থ্য নাই। কি যেন পাইতে চাই, পাই না; কিসের জন্য যেন প্রাণে ফাঁক ফাঁক লাগে; এই যেন ধরি ধরি, আবার ধরা দেয় না; কি যেন দেখি

দেখি, আর দেখিতে পাই না। এই ভাবে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অপ্রেমিক ব্যক্তির পক্ষে ঐ অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যাহার অন্তরে এই স্বর্গীয় ব্যাকুলতা বিঁধিয়াছে, কেবল সেই ইহার বিক্রম বুঝিতে পারে। সময়ান্তরে তিনিই এ কথা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ;— "এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে" ইত্যাদি। এক্ষণকার অবস্থা বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন :—একদিন নিভৃতে বসিয়া গৌরচন্দ্র নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে প্রাণে মহা ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিয়া অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন ; "কৃষ্ণরে ! বাপরে ! আমার জীবন শ্রীহরি ! আমার প্রাণ মন চুরি করিয়া কোথায় গেলে বাপ ? হায় ! আমি ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম।"

তাঁহার সঙ্গী শিষ্যগণ তাঁহাকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া দেশে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ ! তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে ফিরিব না। আমার প্রাণনাথকে যেখানে যাইলে পাইব, সেই দেশে চলিয়া যাইব।" গভীর রজনী যোগে সমভিব্যাহারী লোকদিগকে না বলিয়া তিনি মথুরায় যাইবেন বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন এবং "কৃষ্ণরে! বাপরে! কোথায় পাইব?" বলিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কথিত আছে যে যাইতে যাইতে তিনি প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইলেন, কে যেন মধুর অস্ফুট শব্দে বলিতে লাগিল—"এক্ষণে মথুরায় যাইবার সময় হয় নাই ; সময় হইলে যাইও। এখন নবদ্বীপে প্রতিনিবৃত্ত হও; তোমাকে সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিতে হইবে ; জগৎবাসীকে প্রেমভক্তি বিলাইতে হইবে; হরিপ্রেমে বঙ্গদেশ ডুবাইতে হইবে ; এ সব কাজ না করিয়া তোমার সংসার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র অনেক শান্তি লাভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গয়া হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এইখানে তাঁহার জীবন-ভাগবতের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নবজীবন লাভ করিয়া নবপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি যে নবলীলা আরম্ভ করিলেন তাহা পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন মানুষ।

গৌরচন্দ্র গয়া হইতে নবজীবন লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে মানুষ নাই, সে চেহারা নাই। স্বর্গের নূতন আলোকের জ্যোতিঃ পড়িয়া সকলই নূতন হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডিত্য গর্ব্ব ও চঞ্চলতার স্থান ব্যাকুলতা ও বিনয় অধিকার করিয়াছে; অনুরাগে ডগমগ ও প্রেমাবেগে গরগর হইয়া যখন নদীয়ার রাজপথ দিয়া তিনি স্বভবন-অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া নবদ্বীপবাসী অবাক্ হইয়া গেল। আত্মীয়গণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে তিনি জননীর পদধূলি লইয়া সকলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিলেন। পুত্রের পুনর্ম্মিলনে শচীর মনে আনন্দ সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিভৃত হৃদয়কন্দরে প্রেমোল্লাস উচ্ছ্বসিত হইল। গৌরের শ্বশুরগৃহেও উৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহাদের ভালবাসার পাত্র আর ক্ষুদ্র পরিবারে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না, অনন্তবিশ্বরাজ্যপানে ছুটিতেছে। যাহা হউক, গৌরচন্দ্র কোন মতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "নিমাই! তোমার অনুপস্থিতিকালে তোমার পড়ুয়াবর্গ আর কাহারও নিকট পাঠ লইতে চাহে নাই; অন্যের নিকট পড়িয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না'; তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় তাহারা সতৃষ্ণ রহিয়াছে; কল্য হইতে তুমি আবার অধ্যাপনা আরম্ভ কর।" গৌরচন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অধ্যাপনার স্থান মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে আসিলেন। সেখানে তাঁহার শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; এবং পুনরায় টোলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ২।৪টী বিষ্ণুভক্ত বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া গৌরচন্দ্র গোপনে তাঁহাদের নিকট গয়ায় যে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন; বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল দিয়া অজস্র অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অলৌকিক ভাবাবেশে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য হওয়ায় তিনি আর কিছুই বলিতে

পারিলেন না। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি এই মাত্র বলিলেন "বন্ধুগণ! আজ এই পর্য্যন্ত; কাল অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরস্থ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া আমার মনের সকল দুঃখ বলিব। তোমরা উপস্থিত থাকিও।"

এই অলৌকিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া বন্ধুগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন "ইহার তো এরূপ ভাব আর কখন দেখি নাই, তবে কি কৃষ্ণ ইঁহাকে কৃপা করিয়াছেন? অথবা গয়াপথে ইনি বা ঈশ্বরের কি ঐশ্বর্য্য দেখিয়া থাকিবেন? সরলমতি শচী দেবী পুত্রের ঈদৃশ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কত কি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। যখন উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া পুত্র কাঁদিয়া উঠিতেন, তখন মায়ের প্রাণে ভয় ও আতঙ্কের সীমা থাকিত না। কখন তিনি গোবিন্দের নিকট পুত্রের শুভকামনায় প্রার্থনা করিতেন; কখনও বা স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং পাড়াপ্রতিবাসী ও আত্মীয় স্বজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন।

তখনকার বৈষ্ণবমণ্ডলী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে প্রতিদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে সম্মিলিত হইতেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় এক ঝাড় বৃহৎ কুন্দফুলের গাছ ছিল; তাহার চারিদিক্ বেড়িয়া বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে ফুল তুলিতেন ও নানা প্রকার ধর্ম্মালাপে আনন্দানুভব করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্থানীয় সংবাদ ও অন্যান্য নানা রূপ কথাবার্ত্তারও আলোচনা চলিত এবং ভক্তি-শূন্য দেশ দেখিয়া কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশও করিতেন। যে দিন নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে বাটীতে পৌঁছিলেন, তার পর দিনে বৈষ্ণবেরা ফুল তুলিতেছেন, এমন সময় শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্বদিন যে যে লোকের সমক্ষে গৌরচন্দ্র শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর বাটীতে আপন দুঃখের কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীমান পণ্ডিত একজন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এই শুভসংবাদ বলিবার জন্য আজ তাঁর হাস্যমুখ। সকলে তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমান কথাটির একটু গুমর বাড়াইয়া বলিলেন, "অবশ্য কারণ আছে।"

বৈষ্ণবগণ ব্যাকুলতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি কারণ?'

শ্রীমান বলিতে লাগিলেন "বড় অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা! নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে পরম বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বদিনের ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

শ্রীমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। উদারমতি শ্রীবাস পণ্ডিত সর্ব্বাগ্রে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে "কৃষ্ণ আমাদের দলপুষ্টি করুন"। তখন সকলে আনন্দোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

এদিকে নির্দ্ধারিত সময়ে শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বদিনের কথানুসারে একে একে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে আসিয়া একত্রিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিতকে আসিতে না বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোদুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্য অতীব উৎসুক চিত্তে ব্রহ্মচারীর গৃহের প্রকোষ্ঠান্তরে লুকাইয়া থাকিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব; ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করেন। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া তিনি জাহ্নবীতীরে এক নিভৃত স্থানে কুটীর রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদলের তিনি একজন সভ্য এবং বিশ্বম্ভরের সুপরিচিত। তাঁহারই গৃহে গৌরাঙ্গের এই প্রথম সঙ্গত হইল। বন্ধুগণ সকলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শচীনন্দন ভক্তি উদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আসিয়া দেখা দিলেন এবং 'ঈশ্বরকে পাইয়া হারাইলাম', বলিয়া পাগলের ন্যায় ঘরের স্তম্ভ ধরিয়া আলুলায়িত কেশে কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

এইরূপ গভীরব্যাকুলতাসহকারে যখন শচীনন্দন কাঁদিতেছিলেন ও পুনঃ পুনঃ অনুতাপ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন শুক্লাম্বরের গৃহ প্রেমময় হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কিছু সুস্থ হইয়া তিনি শুক্লাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘরের ভিতর কে?' শুক্লাম্বর বলিল, 'গদাধর'। গদাধরের নাম শ্রবণে বিশ্বম্ভরের অনুতাপানল আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রাণে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পাঠক মহাশয় জানেন যে, গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপের মাধব মিশ্রের পুত্র ও গৌরাঙ্গের একজন বাল্যসখা। ইনি আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধশান্তরূপে ভগবদারাধনা করিতেছিলেন। কুঠরী হইতে গদাধর! বাহিরে আসিলে বিশ্বম্ভর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"গদাধর তুমিই ধন্য; বালককাল হইতে দৃঢ়তা সহকারে তুমি ভগবদর্চ্চনা করিয়া আসিতেছো। হায়! আমার দুর্ল্লভ মানব-

জন্ম বৃথা চলিয়া গেল। যদি বা শুভক্ষণে গয়ার পবিত্র ধামে অমূল্য নিধি পাইয়াছিলাম; তাহাও নিজদোষে হারাইয়া ফেলিলাম।

এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক বন্ধুর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং ব্যাকুলভাবে সকলকে বলিতে লাগিলেন—'তোমরা আমাকে কৃষ্ণ দিয়া আমার দুঃখ খণ্ডন কর।' তাঁহার তৎকালের ভাব দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমবেত বন্ধুগণ সকলেই কাঁদিয়া অস্থির হইলেন এবং সেই স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া কতই বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিবা-বসান হইলে সভাভঙ্গ হইল। গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ বৈষ্ণবসমাজে যাইয়া সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে নানা জনে নানারূপ অনুমান করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "ভগবান্ বা অবতীর্ণ হইলেন ?" কোন উদ্ধত ভক্ত মনের উৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন "নিমাই পণ্ডিত ভাল হইলে আগে পাষণ্ডী বেটাদের মুণ্ড ছিঁড়িব।" একজন সুবোধ ভক্ত উত্তর করিলেন, "আরে ভাই! এত ব্যস্ত কেন ? ধীর চিত্তে অপেক্ষা কর; প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন কি না, দুদিন পরে অবশ্যই জানা যাইবে ?" তাঁহাদের মধ্যে একজন সুচতুর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "সাধু সঙ্গের কি মহিমা! ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ হইতেই নিমাইয়ের ধর্ম্মজীবনে এই মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এইরূপে আনন্দকোলাহলে ভক্তগণ বিতর্ক করিতে করিতে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলসূচক ধ্বনি করিলেন, আর সকলে সমস্বরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন :—

"সবে মিলি লাগিলা করিতে আশীর্ব্বাদ,
হউক! হউক! সত্য কৃষ্ণের প্রকাশ।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শচী দেবীর দিন দিন উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সরলমতি শচী এ সকল ব্যাপারের কিছুই বুঝেন না। স্নেহময়ী জননীর প্রাণ কেবল পুত্রস্নেহই জানে। তিনি মনে করিলেন যে, নিমাইয়ের কোন উৎকট ব্যাধি হইয়াছে; শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াও যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন নানারূপ খেদ করিতে লাগিলেন।

বধূর মুখ দেখিলে পুত্রের মন ভাল হইবে, বিবেচনায় শচীমাতা বিষ্ণু-প্রিয়াকে আনিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। অবোধ মায়ের প্রাণ ইহা বুঝিল না যে, বধূতে এ প্রেম চরিতার্থ হইবার নয়। এ যে বিশ্বজনীন প্রেমের তৃষ্ণা! বিন্দুতে এ তৃষ্ণা যাইবে কেন ? প্রেমসিন্ধুর তৃষ্ণা কি বিন্দুতে

যায়? যে প্রেমের জন্ত নারদ শুক পাগল, এ যে সেই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, শচী তাহা বুঝিলেন না। যাঁহাকে কত জাঁকজমক করিয়া দুই বৎসর আগে বিবাহ করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ তাঁহাকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না। ছি! ইন্দ্রিয় সুখ! না, তাহা হইবে না। এই ভাবিয়া বিশ্বম্ভর বধূর পানে না তাকাইয়া, যেরূপ ভক্তিশ্লোক পড়িতেছিলেন, পড়িতে লাগিলেন, এবং কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একবার তিনি এমন ভাবে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন যে, তাহা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ভীতা হইয়া পলাইয়া গেলেন; শচীও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ফলে এই সময়ে তাঁহার অনুতাপের চরম দশা উপস্থিত; রাত্রিতে নিদ্রা নাই, প্রাণে সর্ব্বদাই হুতাশ ও "কিসে পাব? কবে পাব?" এই চিন্তা সার হইল। অপরিচিত লোক দেখিলে কিন্তু তিনি ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়া শিষ্টের ন্যায় তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন। তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তাঁহার পরিবর্ত্তনের অবস্থা বুঝা ভার হইত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপনা শেষ।

গুরুর অনুরোধে ও পূর্ব্বকৃত স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার্থে, ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এবারে আর সে মন নাই, সে আসক্তি নাই; প্রাণ, মন, আসক্তি, সকলই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং যাহা পড়াইতে যান, কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছু আইসে না। চিরপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যগণ হরিনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পুঁথির ডোর খুলিতে লাগিল; এই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে কতবার প্রবেশ করিয়াছে; তখন ইহাতে কোনই ভাবান্তর হইত না। এবারে কাণের শক্তি ফিরিয়া গিয়াছে; তাই শ্রবণমাত্রেই ভাবাবেশ ও মত্ততা; বাহ্যজ্ঞান নাই। যে যে প্রশ্ন করে ও তিনি যাহার যে পাঠ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতেই হরিনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণ নামই সত্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ নামেরই মহিমা শুনা যায়। শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। ব্রহ্মা, শিব যত দেবগণ, তাঁহারই কিঙ্কর। কৃষ্ণ নাম বিনা যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা

করে, সে অসত্য বলে। বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রের উপদেশ কৃষ্ণপদে ভক্তি করা। মূর্খ অধ্যাপকগণ মায়ামুগ্ধ হইয়া শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভাই সব! কৃষ্ণ জগতের জীবন! করুণার সাগর! সেবক বৎসল! তাঁর নাম ছেড়ে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়িলে কোন ফল নাই; সে পড়া দুর্গতির কারণ মাত্র। অধম জনও তাঁহার নাম লইয়া উদ্ধার হয়। তোমরা এ কথায় সন্দেহ করিও না। কৃষ্ণ ভজন ভিন্ন অধ্যাপনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া গর্দ্দভের ন্যায় শাস্ত্রের বোঝা বহিয়া মরিলে কি হইবে? অতএব আমার কথা শুন, কৃষ্ণমহোৎসবে মাতিয়া জীবন ধন্য কর।' এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "যাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে ছলনা-রূপিণী পূতনা উদ্ধার হইয়াছে, পাপাবতার অঘাসুর আদি পরাজিত হই-য়াছে, যাঁহার নামে জগৎ পবিত্র হয় ও সন্তাপিত জীবের দুঃখ দূর হয়; যাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তনে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিহ্বল ও যাঁহার প্রভাবে মহা-পাপী অজামিল পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে; হায়! জীব বৃথা ধনকুলবিদ্যামদে মত্ত হইয়া তাঁহার আস্বাদ বুঝিল না; কেবল অমঙ্গলময় গীত বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। ভাই সকল! আমার কথা শুন! আর কেন বৃথা সময় নষ্ট কর। অমূল্য ধন কৃষ্ণপদারবিন্দ ভজন করিয়া কৃতার্থ হও।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের নবজীবন লাভের বিষয় কিছুই জানিত না; অকস্মাৎ তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্য-দিগকে বলিলেন, "এতক্ষণ আমি কি বলিতেছিলাম?" পড়ুয়াগণ বলিয়া উঠিল—"আজ আমরা আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। সকল পাঠেতেই আজ আপনি কেবল কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিলেন।"

বিশ্বম্ভর ভাবব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা! আজ তবে পুঁথি বন্ধ কর; চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাওয়া যাক্; অন্য সময়ে আবার পাঠ ব্যাখ্যা করা যাইবে।"

সে দিনকার পড়ান এই পর্য্যন্ত। গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্যগণ চলিয়া গেলে বিশ্বম্ভর যথাবিধি পূজা অর্চ্চনার পর মাতৃসন্নিধানে ভোজন করিতে বসিলেন। পুত্রের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য জননী জিজ্ঞাসা করিলেন;—"বাছা নিমাই! আজ কি পুঁথি পড়াইলে? কাহারও সঙ্গে ত কোন্দল কর নাই?" পুত্র উত্তর করিলেন,—"আজ কেবল কৃষ্ণনাম পড়ান হইল।

মা! শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলই সত্য; কৃষ্ণনামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তনই সত্য; কৃষ্ণ-সেবকই ধন্য। সেই সত্য শাস্ত্র, যাহা কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেয়; তদ্‌ভিন্ন শাস্ত্রপাঠ পাষণ্ডত্ব লাভের কারণ। চণ্ডালও চণ্ডাল থাকে না, ঐ পবিত্রনাম করিলে; দ্বিজও দ্বিজ থাকে না, ঐ নাম ছেড়ে অসৎ পথে চলিলে।" বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বম্ভর জননীকে ভগবদ্ভক্তিই মানবজীবনের সার, এই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা! শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ কর; কৃষ্ণভক্তের জীবনই ধন্য! কালচক্রেও কৃষ্ণদাসের কিছুই করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসে জীবের যে দুর্গতি, তাহা ত জান; এই দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় একমাত্র হরিভক্তি। অতএব হরিপদাম্বুজ আশ্রয় কর।"

"জগতের পিতা কৃষ্ণ; যে না ভজে বাপ!
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ!"

পরদিন প্রাতে শচীনন্দন আবার বিদ্যামন্দিরে যাইয়া বসিলেন; পড়ুয়াগণ আসিয়া আবার পাঠ চাহিতে লাগিল। কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—"সিদ্ধবর্ণ সমন্বয় কি?" গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য; উত্তর করিলেন "সকল বর্ণে নারায়ণই সিদ্ধ।"

শিষ্য। "কিরূপে বর্ণ সিদ্ধ হইল?"

উত্তর। "শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাত হেতু।"

শিষ্য। "আপনি কি বলিতেছেন? বুঝিতে পারিলাম না।"

উত্তর। "সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ কর; আদি, মধ্য, অন্তে, সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই বুঝা যাইতেছে।"

ঈদৃশ প্রলাপবাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল ও পরস্পর বলা বলি করিতে লাগিল "পণ্ডিতের বিষম বায়ু রোগ উপস্থিত; নৈলে এমন প্রলাপ বকিবেন কেন?" হায় রে! সংসার তুই না পারিস্ এমন কাজ নাই। তোর চখে সোণা রাং, আর রাং সোণা। তা না হইলে কি আর দেবনন্দন ঈশার ক্রুশে প্রাণ যায়? হরিদাস ঠাকুর বাইশ বাজারে প্রহারিত হন? লোকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় শাক্যকে গ্রামে গ্রামে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায় এবং গৌরাঙ্গকে পাগল সাজায়? সাবাস তোর বুদ্ধি! তোর বুদ্ধি তোতেই থাক্; ভগবান্ উহা হইতে আমাদের দূরে রাখুন। এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া গৌরের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—

"পণ্ডিত মহাশয়! আপনি আজ কি আবল তাবল বকিতেছেন? আমরা শাস্ত্রার্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। গৌরাঙ্গ একটু অপ্রতিভের ন্যায় উত্তর করিলেন "কেন আমিতো ঠিক ব্যাখ্যা করিতেছি; তবে তোমরা যদি বুঝিতে না পার, এখন থাকুক। বিকালে আসিও, ইহার মধ্যে আমিও পুঁথি দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।" শিষ্যগণ পুঁথিতে ডোর দিয়া উঠিয়া গেল, এবং দলবদ্ধ হইয়া বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া উপদেশ চাহিল।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদাস ওঝা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন;— "বিকালে তোমরা বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিও, আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, যেন পূর্ব্বের ন্যায় ভাল করিয়া অধ্যাপনা করেন।" ছাত্রেরা নিমাইকে গুরুর ইচ্ছা জানাইলে, তিনি অপরাহ্নে গঙ্গাদাসের গৃহে আসিয়া অধ্যাপকের চরণবন্দনা করিলেন। গঙ্গাদাস শাদাশিদে লোক; সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থের কর্ত্তব্যসকল সাধন করিতেন; এবং তাহার মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানও ছিল। কিন্তু নিমাইকে যে সাপে দংশন করিয়াছে, তাহার তিনি ওঝা নহেন; সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি খুলে নাই; সুতরাং যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সংসারের মুরুব্বিপক্ষ চিরকালই ঐরূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছে; তিনি বলিলেন:—"বৎস বিশ্বম্ভর! দেখ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া অধ্যাপনা করা অল্পভাগ্যের বিষয় নয়। যার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, যার কোন কুলে কখন মূর্খ নাই, তার কি অধ্যাপনায় ঔদাস্য সাজে? তুমিতো পরম পণ্ডিত; আচ্ছা বল দেখি? যদি অধ্যাপনা ছাড়িলে ভক্ত হওয়া যায়, তাহা হলে তোমার বাপ মাতামহকে কি ভক্ত বলিবে না? তাঁহারা তো কখন অধ্যাপনা ছাড়েন নাই। অধ্যয়নই ধর্ম্মের জীবন। অতএব কথা মান; টোলে যাইয়া পূর্ব্ববৎ অধ্যয়ন করাও। অবান্তর অর্থ করিও না, আমার মাথার দিব্য।"

গুরুর উত্তেজনায় ও উপদেশে আবার একবার বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বভাব উদয় হইল। বিদ্যাগৌরবে নবজীবনের প্রেমজ্যোতিঃ একবার মাত্র আচ্ছন্ন হইল; কালো মেঘে প্রাতঃসূর্য্য কিরণ একবার ঢাকা পড়িল। তিনি অহঙ্কারব্যঞ্জক বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করিলেন "দেব! আপনার শ্রীচরণকৃপায় এই নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত দেখি না, যে আমার সঙ্গে বিচারে আঁটিয়া উঠিবে; আমি যে

ব্যাখ্যা করিব, দেখি দেখি কে আসিয়া তাহা দূষিতে পারে? আপনার আজ্ঞায় শিষ্যবৃন্দ লইয়া এই আমি অধ্যাপনায় চলিলাম।” এই বলিয়া গুরুর পদধূলি লইয়া নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে চলিলেন। গুরুর আনন্দের সীমা রহিল না; শিষ্যবৃন্দ উৎসাহধ্বনিতে চারি দিক পূর্ণ করিল। গঙ্গাদাস! সাবধান, এ পড়ান তো পড়ান নয়, এ যে নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখার আলো, অস্তমিত সূর্য্যের প্রখর কিরণ। যে হৃদয় অনন্তের দিকে ছুটিয়াছে, তোমার সাধ্য কি যে, তাহার আবেগ ফিরাও? ভাই শিষ্যবৃন্দ! তোমাদেরও বলি, এই বার মরণ খাওয়া খাইয়া লও; যত দূর পার পাঠ চাহিয়া লও; আর কিন্তু হবে না।

শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় গর্ব্বের সহিত পড়াইতে লাগিলেন। ছাত্রদের আনন্দের সীমা নাই; যাহার যত সন্দেহ ছিল ও নূতন পাঠ লওয়ার প্রয়োজন হইল, সকলই সম্পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের মুখশ্রীতে পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য আবার দেখা দিল। ছাত্রেরা মনে করিল, অধ্যাপকের বায়ুরোগ আরোগ্য হইয়াছে। সকলের পাঠ দেওয়া সমাপ্ত হইলে, গৌরচন্দ্র প্রচলিত বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—“যাদের সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাই, কলিযুগে তাদেরই ভট্টাচার্য্য উপাধি; যাদের শব্দ জ্ঞান নাই, তাহারা তর্ক করিয়া মরে। আচ্ছা আমার খণ্ডন ও স্থাপন, দেখি কাহার সাধ্য অন্যথা করুক?”

ও কি ও! বিদ্যাগৌরবের মধ্যে ও কি হলো! সর্ব্বনাশ! নিমাই পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেন, কেন? শিষ্যেরা অবাক্ হইয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল। অবশেষে মূর্চ্ছার কারণ বাহির হইয়া পড়িল। যে দরজায় বসিয়া নিমাই পণ্ডিত পড়াইতেছিলেন, রাস্তার অপর পার্শ্বে আর এক দরজায় রত্নগর্ভ আচার্য্য নামে একজন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ একাকী বসিয়া সুমধুরস্বরে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার উচ্চারিত ভক্তিরসাত্মক শ্লোকের আভাস বিশ্বম্ভরের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আর যাবে কোথায়! প্রচ্ছন্ন অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; কৃপাবাতাসে দম্ভের মেঘ কাটিয়া গেল; আর মহাভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নিমাই! তুমি যে প্রভুর ফাঁদে পড়িয়াছ, আর কি তোমার স্বাধীনতা আছে? বৃথা অধ্যাপনার চেষ্টা। যাহা করিতে প্রেরিত হইয়াছ, তাহা না করিয়া কি তুমি থাকিতে পার? ধন্য প্রভু! তোমার

লীলা বুঝে কে ? মূর্চ্ছাভঙ্গে গৌরচন্দ্র কতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণসুখসাগরে নিমগ্ন থাকিলেন ; রত্নগর্ভও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। পুলক, অশ্রু, কম্পে গৌরাঙ্গ বিভোর হইয়া গেলেন। পথে রথের লোক জুটিল। একটা মহাব্যাপার হইয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গৌরচন্দ্র শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম ?" তাহারা উত্তর না করায়, তিনি সকল বুঝিলেন ও তাহাদিগকে লইয়া ভ্রমণার্থে জাহ্নবীতীরে চলিলেন।

বার বার তিনবার। পড়ুয়াগণ আজ্ দেখিয়াই পড়া ছাড়িবে। প্রাতেঃ তাহারা আসিলে গৌরচন্দ্র পড়াইতে বসিলেন। পূর্ব্বদিনের ভাবে তখনও বিভোর। ইহার মধ্যে একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল "ধাতুর সংজ্ঞা কি ?" নিমাই উত্তর করিলেন "হরিশক্তিতেই ধাতুর প্রকাশ; জগতে যত নর নারী, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র দেখিতেছো, যাহারা যৌবনগর্ব্বে বা ধনগর্ব্বে স্ব স্ব দেহ মাল্য চন্দনে সুশোভিত করে ; তাহাদের ধাতু গেলে কি অবস্থা হয় ভাবিয়া দেখ দেখি, কোথায় সে অঙ্গ সৌন্দর্য্য চলিয়া যায় ? কারও দেহ ভস্ম হইয়া যায়, কাহাকেও মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে, কাহারও শরীর শৃগাল কুকুরের উদরপূরণ করে। যাহাকে ভাল বাসি, ভক্তি করি, সে আর কিছু নয়, জীবন্ত হরিশক্তি ধাতুরূপে আবির্ভূত। এখন মহাপূজ্য জ্ঞানে যাঁহাকে প্রণাম করি, ধাতু গেলে তাঁহার স্পর্শে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়। যে বাপের প্রতি পুত্রের কতই সম্মানভক্তি, সে বাপের ধাতু গেলে পুত্র তার মুখে আগুণ দেয়। বিদ্যাবান্ অধ্যাপক কি ইহা বুঝে ? কিন্তু এ কথা ঠিক কি না তোমরা বুঝিয়া দেখ। এমন পবিত্র পূজ্য যে হরিশক্তি, তাঁকে কি তোমরা ভক্তি করিবে না ? বলিতে বলিতে উৎসাহে তাঁর প্রাণ নাচিয়া উঠিল ; তিনি বিহ্বল হইয়া দশমুখে ভগবানের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন, এবং ব্যাকুলতা ও আগ্রহ সহকারে শিষ্যদিগকে হরিপাদপদ্ম পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিরূপে ধাতু ব্যাখ্যা করিলাম ?" শিষ্যগণ উত্তর করিল, "যাহা বলিলেন তাহার একটুও মিথ্যা নয়। কিন্তু আমাদের যে উদ্দেশে পড়া, তাহার অর্থ উহা নয়।"

নিমাই। "আচ্ছা ! তোমরা কি মনে কর, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে ?

শিষ্য। "এক হরিভক্তি ও হরিনাম ভিন্ন আপনার মুখে আসিতেছে

না। ইহাতে যা মনে করুন।" এই বলিয়া গয়া হইতে আগমনের পর তাঁহার যে যে ভাব তাহারা দেখিয়াছিল, সকল বিবৃত করিল। গৌরচন্দ্র শিষ্যদিগের কথা শুনিয়া বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য। আমি দিবারজনী সর্ব্বত্র কেবল শ্রীহরির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতেছি; সমস্ত জগতে তাঁহার পবিত্র মন্দির লক্ষিত হইতেছে; শ্রবণবিবরেও তাঁহার নাম ভিন্ন আর কিছু প্রবেশ করে না। সেই জন্য সকল কথাতেই হরিনাম বাহির হইয়া যায়। এ কথা আর কে বিশ্বাস করিবে? তোমাদের কাছে না বলিলে নয়, তাই বলিলাম। অতএব ভাই সকল! আমাকে ক্ষমা কর; আমা হইতে আর অধ্যাপনা চলিবে না। তোমরা অন্যত্র যাইয়া আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ কর।" এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে পুস্তকে ডোর দিলেন।

শিষ্যগণ তখন গৌরের অবস্থা কিছু বুঝিতে পারিল এবং সজলনয়নে বলিতে লাগিল "পণ্ডিত! আমরা আপনার কাছে যাহা পড়িলাম, তাহাই ভাল; অন্য ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিতে ইচ্ছা নাই, আর পড়িবারও খেদ নাই।" বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "যদি তোমাদের ইহাই অভিলাষ, তবে আর পড়ায় কাজ নাই; এসো সকলে এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি। তাঁহার কৃপায় আমাদের সকল শাস্ত্রের জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইবে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ।

টোল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার ছাত্রদিগকে লইয়াই গৌরচন্দ্র প্রথম সঙ্কীর্ত্তনদল গঠন করিলেন। মৃদঙ্গ নাই, করতাল নাই, রাগরাগিণী-সংযুক্ত সুর তাল নাই, কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হইয়া ব্যাকুলতা সহকারে হাতে তালি দিয়া আঙ্গিনায় বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যে কীর্ত্তনের মধুরলহরী কিছুদিন পরে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল; যাহার তরঙ্গাঘাতে কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম্মজগতে সাধনভজনের এক অমূল্য সামগ্রী হইয়া আজ পর্য্যন্ত কত পাপীকে পুণ্যপথে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার

প্রথম প্রকাশ এইরূপে হইল। জগতের যত কিছু মহদ্বিষয় এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতে মাধ্যাকর্ষণ, বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার প্রভৃতি সকলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

পরমার্থ সাধনে সঙ্কীর্ত্তন যে একটী প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে প্রাণের সুকোমল ভাবকুসুম যখন প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, যিনি তাহা সাধনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, তদ্দ্বারা শিব সুন্দর রূপ বিদ্ধ হয় কি না। গৌরের দেহ মন প্রাণ সকলই ভাবময়; মহাপ্রেমের উৎস তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত; ভগবানের শিবসুন্দররূপে তিনি একান্ত মগ্ন; সুতরাং তদীয় সাধনপথে সঙ্কীর্ত্তন যে প্রধান সহায় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এক সময়ে সঙ্কীর্ত্তন মাহাত্ম্য তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং, ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং, প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।'
সর্ব্বাত্মস্নপনং, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়; সংসারদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; ইহার কৌমুদী আলোকে শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত হয়; ইহাদ্বারা (অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া) বিদ্যাবধূ সঞ্জীবিত হয়; আনন্দজলধি সম্বর্দ্ধিত হয়; ইহার প্রতিপদ অমৃতের পূর্ণ আস্বাদযুক্ত; এবং ইহা প্রাণ-মন প্রভৃতি সর্ব্বাত্মার তৃপ্তিকারী।

যে সকল ছাত্র পাঠ ছাড়িয়া গৌরের সঙ্গে ভগবদারাধনা করিতে ইচ্ছুক হইল, তিনি তাহাদিগকে সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। সঙ্কীর্ত্তন কাহাকে বলে ও কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহারা তাহার কিছুই জানিত না। গৌরচন্দ্র নিজে পদ বাঁধিয়া, ধুয়া গাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহারা প্রথমে যে পদ গাইতেন, সেটী এই;—

"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধু-সূদন॥"

হাতে তালি দিয়া দশিষ্যে এই পদের ধুয়া গাইতে গাইতে বিশ্বম্ভর নৃত্য

করিতে লাগিলেন; কখন হুঙ্কার ও উচ্চহাস্য করেন ও কখন মগ্ন অবস্থায় থাকেন। কখন কখন প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি আছাড় খাইয়া পড়িতেন, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইত; তথাচ বাহ্যজ্ঞান হইত না। চীৎকার ও গণ্ডগোল শুনিয়া প্রতিবাসী ও পথের লোক আসিয়া জুটিত; এ সব রঙ্গের তাহারা কিছুই বুঝিত না; সুতরাং অবাক্ হইয়া দেখিত ও যাহার যাহা মনে আসিত, বলিত। অদ্বৈতের বৈষ্ণবদলেরও ২।৪ জন লোক কীর্ত্তনের সময় আসিতেন; তাঁহারা এই ভাবের ভাবুক, সুতরাং অন্য লোকের মত তাঁহারা বাজে কথা বলিতেন না। বিশ্বম্ভরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও প্রেমদর্শনে তাঁহাদের মনে কত চিন্তারই উদয় হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া অদ্বৈতের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অচিরাৎ ভগবৎশক্তি অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের দমন করিবে ও ধর্ম্ম সংস্কার করিবে। নিমাই পণ্ডিতের জীবনের এই পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের ঐ বিশ্বাস একটু একটু করিয়া উদ্দীপিত হইতে লাগিল।

মানবাত্মায় অবতীর্ণ ভগবচ্ছক্তির বিকাশই অবতার; গৌরের হৃদয়ে সেই শক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল; এতদিন বিদ্যার মেঘে ঢাকা ছিল; এখন দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। মানবাত্মা দুই প্রকার উপায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম। এক আপনার মধ্যে, দ্বিতীয় সৃষ্টির মধ্যে। আমি যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি এবং আমার মধ্যে যে সকল স্বর্গের ভাব উপলব্ধি করিতেছি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করাই নিরালম্ব জ্ঞান। তুমি বলিতে পার, ঈশ্বর নাই বা তাঁহাকে জানা যায় না; তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানী ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। আমাকে নানা যুক্তিকৌশলে ফেলিয়া তোমার মত বুঝাইয়া দিলে। কিন্তু আমার প্রাণ তাহা মানিল না, আমি যে তাঁহাকে হস্তামলকবৎ স্পর্শ করিয়াছি; প্রাণের প্রাণ বলিয়া অনুভব করিয়াছি এবং রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু বলিয়া আস্বাদ করিয়াছি। সুতরাং তোমার কথায় ভুলিব কিরূপে? কিন্তু এই জ্ঞান আপনা আপনি সকলের অন্তঃকরণে সকল সময়ে বিকশিত হয় না; আর যদিও অল্প কিছু হয়, তাহা সংসারের পাপ-প্রলোভন কাটিয়া উঠিয়া সর্ব্বাবস্থায় মানুষকে কল্যাণের পথে, পরিত্রাণের পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হয় না। হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ রোপিত আছে, তাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ, জল, বায়ু না দিলে অঙ্কুরিত হয় না। কুসুমকলিকা গাছে আছে; কিন্তু বসন্ত মারুত না লাগিলে ফুটে না। তাই

বাহিরের আলোক প্রয়োজন, স্বাবলম্ব জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান সৃষ্টিরাজ্য হইতে লাভ করিতে হয়। তাহা আবার দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জড় জগতের মধ্য দিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ব্বত, কানন, মেঘ, গাছ, পাতা, নদী, পুষ্প, বায়ু, জল, প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু নানা দেশে, নানা ভাবে ও নানা উপায়ে এই জ্ঞান মানবাত্মায় ঢালিয়া দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী হইতে মানবমণ্ডলী পর্য্যন্ত সকলই অন্য প্রকারে, অন্য ভাষায় সেই জ্ঞান পুষ্টির সাহায্য করিতেছে। এই উভয়বিধ পদার্থ সকলই সেই বিশ্ব গুরুর ভাষারূপে তাঁহারই ভাব প্রকাশ করিতেছে; স্বয়ং কেহই গুরু নয়, কিন্তু মহাগুরুর মহামন্ত্র। এই প্রভেদ টুকু স্মরণ না রাখাতেই জগতে গুরুবাদের মধ্যে মহাপাপ, অবতার-বাদের মধ্যে নরপূজা প্রবেশ করিয়াছে। গাছ, পাথর, জীব, জন্তু, মানুষ গুরু ও দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহাহউক, জগতের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই বিশাল জ্ঞানরাশিও মানবাত্মার পরিত্রাণের পক্ষে সকল সময়ে যথেষ্ট হয় নাই, পাপের প্রবলশক্তির নিকট এই সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানও পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। সেজন্য করুণাময় বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধিতে মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ আলোক আসিয়াছে, আসিতেছে ও চিরকালই আসিবে। সেই আলোক মানবাত্মার ভিতর দিয়া আসিয়া অধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, ধর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিতেছে ও বিশেষ বিশেষ জাতির দুরবস্থা মোচন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। যে সকল পাত্র অবলম্বন করিয়া এই আলোক আসিয়া থাকে, পৃথিবীর ভাষায় তাঁহারা মহাপুরুষ, প্রেরিত বা অবতার প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। শব্দে কিছু যায় আইসে না, বস্তু ঠিক থাকিলেই হইল।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়, সম্ভবামি যুগে যুগে।"

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—তবে কি অনন্ত নিত্য সর্ব্বজ্ঞ প্রভু, জরা মরণশীল' ক্ষুদ্র মানবশরীর ধারণ করেন? না, তাহা অসম্ভব। 'সম্ভূত' হওয়ার অর্থ 'প্রকাশিত'। যে আধার অবলম্বন করিয়া তিনি প্রকাশিত হন্, তাহা অথচ হইতে তাঁহার 'তিনিত্ব' সম্পূর্ণ পৃথক্। সমস্ত সৃষ্টিতেই তিনি প্রকাশিত; সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্।

'আমি ত জগতে বসি, জগত আমাতে;
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।' চৈঃ চঃ

ঈশা, মুষা, শাক্য, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ব্যক্তিত্ব যাহা, তাহা হইতে অবতীর্ণ ভগবত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটী আধার, অপরটী আধেয়, একটী উপায় আর একটী প্রাপ্য। গৌরের আভ্যন্তরীণ প্রেম যতই বিকসিত হইতে লাগিল, তদীয় শিষ্যগণ ততই উপকৃত হইতে লাগিলেন; চারিদিকের অজ্ঞানান্ধকার কাটিয়া গিয়া ততই প্রেম চন্দ্রমার আলোকে নবদ্বীপ আলোকিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল, কুসুমকোরকে কীট প্রবেশ করিল। গৌরের ব্যক্তিত্ব হইতে ভগবত্ত্ব পৃথক করিতে না পারায় শিষ্যগণ গোলে পড়িলেন; বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিনাশের বীজ লুক্কায়িত রহিল। যাহা হউক, এইরূপে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন প্রচার হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্ত সেবা।

এই সময়ে বিশ্বম্ভর সাধুসেবা করিতে যত্নবান্ হইলেন। নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগের আচার ব্যবহার তাঁহার নিকট কিছু অবিদিত ছিল না; সুতরাং তাঁহাদিগকে তিনি ভক্তি করিতে পারিলেন না। তবে যাহাদিগকে তিনি পূর্ব্বে পরিহাস ব্যঙ্গ করিতেন, অদ্বৈতের দলভুক্ত সেই বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বাপরই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা শাস্ত্র ব্যুৎপত্তিতে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও সরল বিশ্বাসী, ভক্তিমান্ ও প্রেমপিপাসু ছিলেন; গয়া হইতে আগমনের পর তাঁহাদিগের প্রতি গৌরচন্দ্রের শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হইল। তখন তিনি এই সকল লোকের সহবাসে থাকিবার জন্য ও তাঁহাদিগকে সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইয়া শ্রীবাসাদিকে দেখিলেই ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন; তাঁহারাও 'কৃষ্ণে মতি হউক' বলিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। কাহারও পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন, কাহারও আর্দ্র বস্ত্র নিঙড়াইয়া দিতেন, কাহারও দেবার্চ্চনার ফুলের

সাজি বহিয়া যাইতেন। ধন্য প্রেম! ধন্য তোমার মহিমা! সত্য সত্যই তুমি পাষাণ গলাইয়া জল করিতে পার। পূর্ব্বে যাঁহার ঔদ্ধত্যে বৈষ্ণবগণ অস্থির হইতেন, তোমার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আজ্ সেই নিমাই কি করিতেছে? আরও কত কাণ্ড হইবে, তাহা কে জানে? নিমাই বয়ঃকনিষ্ঠ; বৈষ্ণবেরা বর্ষীয়ান্ এবং তখনও তাঁহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয় নাই; সুতরাং নিঃশঙ্কে তাঁহারা তদীয় সেবা গ্রহণ করিতেন এবং নানারূপে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

বিশ্বম্ভর অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনি এখন ভক্তি পথ অবলম্বন করিতেছেন, ইহাতে বৈষ্ণবদিগের প্রাণে মহানন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহতী আশাতরু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নবদ্বীপে পাষণ্ডীর সংখ্যা বড় কম নয়। পাষণ্ডীদিগের উৎপাতে ও বিদ্রূপে তাঁহারা জর্জ্জরিত। এখন বিশ্বম্ভরের দ্বারা তাহারা পরাজিত ও ভক্তি-পথে নীত হইতে পারিবে, এই আশায় তাঁহারা আরও উল্লসিত হইলেন। নিমাইয়ের সেবাতে তুষ্ট হইয়া অন্যান্য আশীর্ব্বাদের মধ্যে তাহাদের এ বিষয়ের আশীর্ব্বাদও শুনা যাইতে লাগিল:—'বৎস বিশ্বম্ভর! শ্রীকৃষ্ণচরণে তোমার মতি হউক। দেখ কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা বুদ্ধিতে কোন ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ জগত্ জীবন ও জগতের পিতা। তাঁহার সেবাতেই যথার্থ শ্রেয়ঃ লাভ হয়। এই নবদ্বীপে তো কত অধ্যাপক আছেন, কত তপস্বী, সন্ন্যাসী, গৃহী আছেন, কই কাহারও মুখে তো হরিভক্তির একটী কথাও শুনা যায় না? সকলই বকধার্ম্মিক, সকলেরই ভণ্ডামী। চারিদিক ভক্তিশূন্য দেখিয়া আমাদের প্রাণ যে কি সন্তাপিত হইয়াছে, তাহা গোবিন্দই জানেন। কিন্তু এক্ষণে আশা করি যখন ভগবান তোমাকে এ পথে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোদুঃখ দূর হইবে, পাষণ্ডী উদ্ধার হইবে। যেমন তুমি বিদ্যাবলে সকল পণ্ডিতকে জয় করিয়াছ, তেমনি প্রেমবলে পাষণ্ডী দিগকে গলাইয়া দিবে। তুমি চিরজীবী হও, তোমা হইতে কৃষ্ণশক্তি প্রকাশিত হউক, জীবনিস্তার হউক, জগত তরিয়া যাউক।'

ভক্তের আশীর্ব্বাদ শুনিয়া গৌরের সুখের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মধুর স্বরে কত কথাই বলিলেন:—'ভক্তের আশীর্ব্বাদে সকল সিদ্ধ হয়; আপনারা যখন প্রসন্ন হইলেন, তখন অবশ্যই আমি কৃষ্ণভক্তি পাইব; ভক্তাধীন ভগবান্ অবশ্যই ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।'

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকারগণ এই সকল ব্যবহারের সহিত গৌরের পূর্ণ ব্রহ্মত্বের

অসংলগ্ন দেখিয়া কৌশল করিয়া উভয় দিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'ভক্তাধীন ভগবান্' এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আপনাদের মত রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবান্ সম্পন্ন করিয়া থাকেন; গৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্; অতএব তিনি আপন কিঙ্করের সেবা করিলেন। দ্বিতীয় তর্ক এই যে গৌররূপে ভগবান্ ভক্তাবতার হইয়াছেন; নিজে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই এ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধু সেবা ও সাধু সম্মাননা, ভক্তি সাধনের প্রধান অঙ্গ। সেই উপদেশ দিবার জন্যই গৌরচন্দ্র এইরূপ বৈষ্ণবসেবা করিয়াছিলেন। আর বৈষ্ণবদিগের প্রোক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথিত হইয়াছে যে তখনও গৌর আপনার ঈশ্বর স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই; তাই বৈষ্ণবগণ চিনিতে না পারিয়া সামান্য মানবের ন্যায় তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদাদি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতমিলন।

অদ্বৈতের নিকট বিশ্বম্ভর চিরপরিচিত; তবে আবার অদ্বৈতমিলন কি? বাহিরের পরিচয়ে মিল হয় না; প্রাণে প্রাণে মিলই মিল। আমরা জগতের অনেক লোককে চিনি; কিন্তু সে চেনায় কি কিছু ফল হয়? যখন দুইটী আত্মা এক প্রাণে, এক ভাবে, এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনন্তের দিকে ছুটে, তখনই প্রকৃত রূপে মিলন হয়। অদ্বৈতমিলনের প্রসঙ্গেও তাহাই বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বম্ভরের অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে গীতাভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। বিশ্বম্ভর তখন ৭।৮ বছরের বালক, হেলিতে দুলিতে মাতৃআজ্ঞায় কখন কখন অগ্রজকে ডাকিতে যাইতেন; অদ্বৈত তখন হইতেই বালকের মনোহর কান্তি ও স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তদবধি তিনি বিশ্বম্ভরের প্রতি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার পরে বিশ্বম্ভরের বিদ্যাবিলাস ও ভক্তিহীন শাস্ত্র জ্ঞান এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের সময় তাঁহার সহিত বড় একটা মাখামাখি ছিল না। এখন মণ্ডলীর লোকমুখে

নিমাইয়ের অপূর্ব্ব ভক্তিলাভের কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বড় সুখী হইলেন। চারি দিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য ধর্ম্মহীন লোক দেখিয়া অদ্বৈত প্রাণের দুঃখে কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না, ভগবান্‌কে অবতীর্ণ করাইবার জন্য সর্ব্বদা সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং অবশিষ্ট সময় ২।৪ জন সমদুঃখী বৈষ্ণব লইয়া ভক্তিআলোচনায় সময় যাপন করিতেন। এমন সময়ে এক দিন তাঁহার দলস্থ বন্ধুগণ আসিয়া বিশ্বম্ভরের পরিবর্ত্তিত জীবনে আশ্চর্য্য মহাভাবের লক্ষণ সকল যাহা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন অদ্বৈতও পূর্ব্বরাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'গীতার এক স্থানের একটী পাঠ ও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনোদুঃখে উপবাস করিয়া আমি কাল রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিলাম; এমন সময়ে একজন আসিয়া যেন আমাকে সেই অর্থ বলিয়া দিয়া উঠিয়া পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিলেন যে "আর দুঃখ করিও না; যাঁহাকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য এত সাধ্যসাধনা করিতেছিলে, সেই প্রভু আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বর্গের দুর্ল্লভ ভক্তি দেশে প্রচারিত হইবে, কোটি কোটি নরনারী উদ্ধার হইয়া যাইবে, আর এই শ্রীবাসের গৃহে সকল বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে ও নৃত্যগীতে মগ্ন হইয়া থাকিবে।" আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চক্ষু মিলিয়া সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। দেখিলাম বিশ্বম্ভর দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তি অমনি অন্তর্ধান হইয়া গেল।' এই বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন ;—

"কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা হয়েন কাহাতে ?"

অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন 'বিশ্বম্ভরের যেরূপ রূপ ও আকৃতি, যেরূপ ভদ্র বংশে তাঁহার জন্ম ও অশেষ শাস্ত্রে তিনি যেমন পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণভক্তি হওয়াই ত উচিত, আজ আমি তোমাদের কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। তাঁহার যে এরূপ স্বভাব হইয়াছে, এ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। যে বস্তুর জন্য আমি লালায়িত, যদি সত্য সত্য তিনি সেই বস্তু হন; তবে অধিক দিন আর অপ্রকাশ থাকিবে না। অবশ্যই এক দিন সকলেই বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া অদ্বৈত রায় 'হরি

হরি!' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন; আর ভক্তগণ 'জয় জয়' রবে প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিনের কথা এই পর্য্যন্ত।

বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে, অদ্বৈত প্রভু স্নানান্তে তুলসী সেচন করিতেছেন ও মনের অনুরাগে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন; কখন দুই নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে; কখন অট্ট হাসি হাসিতেছেন; কখন ভীমরবে হুঙ্কার করিতেছেন এবং পাষণ্ডীউদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে বিশ্বম্ভর প্রিয়বয়স্য গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতভবনে যাইয়া উপনীত হইলেন। দূর হইতে আচার্য্যের তাৎকালিকের ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া গৌর প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কথিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তিযোগে ও মনোবলে বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি নানা উপচারে মূর্চ্ছাবস্থায় পূজা করিয়াছিলেন; এবং "নমোঃ ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায়চ; জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার চরণ যুগলে' প্রণত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই রহস্য বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া চৈতন্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। নিকটে গদাধর দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি অদ্বৈতের ঈদৃশ অসঙ্গত আচরণ দেখিয়া জিহ্বা কামড়াইয়া বৃদ্ধ আচার্য্যকে বলিলেন "নিমাই বালক; বিশেষতঃ মূর্চ্ছিত; এ অবস্থায় তাহার প্রতি আপনি এমন অসঙ্গত ব্যবহার কেন করিতেছেন?" অদ্বৈতভাবব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন "হাঁ! বালক! কি, কি, পরে জানিবে।"

গদাধর কিছু বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'তবে কি ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন না কি?' এমন সময়ে চৈতন্যের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যকে তখনও আবেশময় দেখিয়া তিনি দুই হাত যুড়িয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন ও আপনার দেহপ্রাণমন সকলই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "আচার্য্য! আমাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপাব্যতীত আমার কৃষ্ণলাভের আশা নাই; আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।"

বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের মতে বিশ্বম্ভর ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ঈশ্বরত্ব গোপন করিলেন। অদ্বৈত মনে মনে ভাবিলেন "আমার কাছে তোমার চতুরালি খাটে না; আমি আগে থাকিতে চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছি" ও

প্রকাশ্যে উত্তর করিলেন "বিশ্বম্ভর! তুমি আমার কাছে সকল অপেক্ষা বড়; আমার এবং সকল বৈষ্ণবগণের ইচ্ছা এই যেন আমরা সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতে পাই ও সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন করিতে পাই।"

অদ্বৈতের করুণ বাক্যে প্রীত হইয়া বিশ্বম্ভর বিদায় হইলেন। এদিকে বৃদ্ধ আচার্য্য, সত্য সত্য প্রভু প্রকাশিত হইলেন কি না? পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; উদ্দেশ্য—যদি সত্য বিশ্বম্ভরই শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে অবশ্যই আমাকে অচিরাৎ বাঁধিয়া আনিবেন।

কথাটা কিছু অসংলগ্ন হইল। আগে দৃঢ় ঈশ্বরজ্ঞান না হইলে ঘোর ঘটা করিয়া পূজা করা হয় না। আর যদি ঈশ্বর জ্ঞানই হইল, তবে আবার গুরু হইয়া শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয়, সেরূপ উপদেশ কেন দেওয়া হইল? আবার ঈশ্বরত্বে সন্দিহান হইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তি-পুরেই বা পলায়ন কেন? এই মাত্র কথা ঠিক হইয়া গেল যে, সকলে একত্র ভগবানের আরাধনা করিবেন; তাহারই বা ব্যত্যয় কেন? তবে কি ঈশ্বর জ্ঞানের কথা ও পূজার কথা অতিরঞ্জিত চিত্র নয়? সন্দেহ আপনা হইতে উদিত হয়। এই সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাহার কিছু পরেই অদ্বৈতের শান্তিপুরে গমন বৃত্তান্ত সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আর প্রথম দর্শনেই নিমাইয়ের অলৌকিক ভাবাবেশ ও মূর্চ্ছা দেখিয়া অদ্বৈতের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রমের উদ্রেক হওয়াও অসম্ভব নহে। তবে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজার ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত কি না? বিচার্য্য। গ্রন্থকারও গ্রন্থরচনার সময়ে এ বিচার করিয়াছিলেন; তা না হইলে তিনি বলি-বেন কেন?—

> "অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবারে শক্তি কার?
> "যাঁর শক্তিকারণে চৈতন্য অবতার।
> এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত;
> অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল নিশ্চিত।"

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। গ্রন্থকর্ত্তা যাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রন্থের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে অটলবিশ্বাসী। মূল ঘটনা দেখিতে দেখিতে, স্মরণ করিয়া রাখিতে রাখিতে, পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে যে প্রেমের ও ভক্তির রঙ্গে কল্পনার

তুলি দিয়া চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা সহজবোধ্য। ইহাতে বিচার শক্তি প্রয়োগ করিলে পাছে ভক্তির রং লুকাইয়া যায়, অসামঞ্জস্য বাহির হইয়া পড়ে, তাই বিশ্বাসের দুয়ারে আপীল করিয়া একটী ছোট রকম মাথার দিব্যি দেওয়া হইয়াছে;—অর্থ, কেহ যেন এ সম্বন্ধে তর্ক ও বিচার না করেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বায়ু রোগ ও শ্রীবাসমিলন।

এখন হইতে বিশ্বম্ভরের মধ্যে এক এক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব দেখা যাইতে লাগিল। গৌরের হৃদয় ভাবপ্রবণ; যখন তাহাতে যে ভাব উঠে, তাহার তরঙ্গ না হইয়া যায় না। নির্ম্মল সরসীর স্বচ্ছসলিলে ক্ষুদ্র উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন কুল্যের উপর কুল্য উঠিয়া শেষে সমস্ত সরসী তরঙ্গময়ী হইয়া যায়; তেমনি বাহিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তদীয় চিত্ত-সরসীতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাবের পর ভাববীচি উৎপত্তিত হইয়া প্রাণমন সকলই ভাবময় করিয়া তুলিত। তাঁহার স্বভাবের এই মগ্ন ভাবই স্বর্গীয়। ইহারই চমৎকারিত্বে সমস্ত ভারতবর্ষ সমাকৃষ্ট হইয়াছিল এবং ইহাই অবশেষে গাঢ় মহাভাবে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের উপর পাষণ্ডীদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে ও ভাবিতে ভাবিতে পাষণ্ডী উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটী বাসনা প্রবল হইল। তাঁর পক্ষে বাসনাও যাহা; আর মন প্রাণের সকল ভাব ঐ চিন্তায় পর্য্যবসিত হইয়া তদ্ভাবময় হইয়া যাওয়াও তাহাই। তাই তিনি এখন হইতে 'সংহার করিব' 'আমি সেই' এই প্রকার নানা রূপ অলৌকিক কথা বলিতে লাগিলেন ও এই ভাবে বিভোর হইয়া কাঁদিতে হাসিতে ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন; কখন ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং কখন ভার্য্যাকে দেখিলে মারিতে যান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্নেহময়ী জননীর মনে কতই বিপদাশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি পুত্রের পূর্ব্ব ব্যাধির কথা মনে করিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; এবং যাহাকে দেখেন, তাহাকেই পুত্রের ভাব লক্ষণ বলিয়া উপদেশ চাহিতে লাগিলেন।

যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তেমনি উপদেশ দিতে লাগিল। কেহ বলিত বিষম বায়ু উপস্থিত, ইহাকে বাঁধিয়া রাখ ও নারিকেল জল খাইতে দাও; তাহা, হইলে উৰ্দ্ধবায়ু অধঃ হইবে'। কেহ বলে, 'অপদেবতার বাতাস লাগিয়াছে'; কেহ শিবাঘৃত, পাকতৈল সেবন করাইতে বিধি দেয়। এইরূপে যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই বলে। আসল রোগ কেহই বুঝিল না। মূর্খ পৃথিবীর লোক! কৃষ্ণানুরাগে শিবাঘৃতের ব্যবস্থা! প্রেমরোগে বন্ধনের ব্যবস্থা! তোমরা নইলে এমন অপূর্ব্ব বিধি আর কে দেয়? এইরূপ পাঁচ জনের পাঁচরূপ কথা শুনিয়া শচীদেবী বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং এক দিন অনেক লোক দিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভক্তদর্শনে গৌরের ভক্তিভাব উথলিয়া উঠিল। অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষাদি হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। রোজার কাছে রোগ লুকান থাকে না; শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরের অবস্থা দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। বিশ্বম্ভরও চৈতন্যলাভ করিয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, 'পণ্ডিত! আপনি আমার সম্বন্ধে কি বুঝিলেন? লোকে বলিতেছে, আমার বাই রোগ হইয়াছে।'

শ্রীবাস সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, 'তোমার বাইর মত আমার একটু বাই হইলে বাঁচিয়া যাইতাম। দেখিতেছ না মহাভক্তিযোগ আসিয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে?' শচীকে বলিলেন "দেবি! আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ বায়ু রোগ নহে, মহাভক্তির অভ্যুদয়। কাহাকেও একথা বলিবেন না; দেখুন কি কাণ্ডকারখানা হয়?"

শ্রীবাস শচীকে এইরূপে প্রবোধ দিতেছেন শুনিয়া, বিশ্বম্ভর মহাসুখী হইলেন এবং শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আপনি আজ যাহা বলিলেন, ইহা আর কেহ বলে নাই। সকলেই বায়ুরোগ বলিতেছে। আমি আজ মহা উপকৃত হইলাম। যদি আপনিও বাই বলিতেন, তবে নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম।"

তখন ভক্ত শ্রীবাস বলিতে লাগিলেন 'এখন হইতে আর আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত নহে; সকলে একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিব। আমরা একত্রিত হইলে পাষণ্ডীরা কিছুই করিতে পারিবে না।'

শ্রীবাস বিদায় হইয়া গেলে শচীদেবীর মন হইতে যদিও বায়ুরোগের আশঙ্কা দূর হইল; কিন্তু তাহার স্থানে আর এক নূতন আশঙ্কা সমুপস্থিত হইল; বিশ্বরূপের কথা মনে পড়িয়া গেল। 'সেও তো এইরূপ ভক্তি-

পিপাসু হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তবে কি বিশ্বম্ভরও সেই পথে যাইবে? কে জানে ভাঙ্গা কপাল আবার বুঝি ভাঙ্গে?' শচি! আশ্বস্ত হও, সকলই ঈশ্বর-ইচ্ছা।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্ত দল।

যেদিন অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন, সেইদিন হইতে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে শিখিলেন। ইহার উপরে বিশ্বম্ভরের নবজীবনের নূতন ভক্তির বিকাশ তাঁহাদের ঐ ভাবকে দগ্ধেন্ধনে ঘৃতাহুতির ন্যায় উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ফলতঃ এই সময় হইতেই গৌরের ভবিষ্যৎ ভক্তদল গঠিত হইতে চলিল। ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই ঘটনা অতি স্বাভাবিক দেখা যায়। তাঁহারা যত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নত হইয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে থাকেন, ততই চারিদিক্ হইতে পরিত্রাণের জন্য লালায়িত নরনারীসকল আসিয়া তাঁহাদের দল পুষ্টি করিতে থাকে। দেবনন্দনের প্রেরিত দল, শাক্যসিংহের শিষ্যদল ও মহম্মদের চিহ্নিত দল এই প্রকারে সংগঠিত হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজ্যে দলবাঁধা একটী স্বাভাবিক নিয়ম। যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন জীবন লইয়া সংসারের কুটিল পথে ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিতেছিল; যখন কোন মহাপুরুষের জীবনের অসামান্য আলোকে সে আপনার জীবনের জঘন্যতা দেখিতে পায়, তখন সেই আলোকে সমাকৃষ্ট হইয়া সেই আত্মা যে তাঁহার পরিকররূপে পরিণত হইবে, ইহা অতি সহজে বুঝা যাইতে পারে। এইরূপে একটী একটী করিয়া যখন অনেক গুলি মানবাত্মা সেই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া পড়ে, তখনই একটী দল গঠিত হয়। ধর্ম্মজগতে যত কিছু মহান্ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সকলই দল হইতে। দলেই বল, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে সেই দল যখন সার্ব্বভৌমিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কার ও স্বার্থের সংকীর্ণ রাস্তা আশ্রয় করে, তখনই তাহা হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা। কিন্তু মহাপুরুষদিগের জীবনে এরূপ সংকীর্ণতার ভাব কখনও দেখা যায় নাই। জগতে যত কিছু বিপদ্

আসিয়াছে, মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তীগণ হইতে। অনুবর্ত্তীগণ অনেক স্থলে মহাপুরুষের জীবনের লক্ষ্য, ভাব ও ভাষা বুঝিতে না পারিয়া, বিকৃত অর্থ করিয়া ও তাহার সঙ্গে আপনাদের কর্তৃত্ব মিশাইতে গিয়া এই রূপ বিপদ আনয়ন করিয়াছে।

গৌরের ভক্তদল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা না হইতে ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের বহির্বাটীতে আসিয়া জুটিয়া মহাপ্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতেন; কোন্ দিক্ দিয়া রজনী প্রভাত হইয়া যাইত? কেহ টের পাইতেন না। গৌরের অপূর্ব্ব ভাববিকাশে এক এক রাত্রি মুহূর্ত্তের ন্যায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন তাঁহার অলৌকিকত্বে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

এই সকল অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া শুনিয়া ভক্তগণ কেহ তাঁহাকে অংশাবতার, কেহ ভক্তাবতার, কেহ কেহ বা শুক, নারদ বা প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। মহিলাগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

গৌরের ধর্ম্মজীবনের আমূল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দুইটী প্রধান অবস্থা লক্ষিত হয়; প্রথম বিরহ বা ব্যাকুলতা; দ্বিতীয় সম্ভোগ-অবস্থা। বিরহ অবস্থার প্রথম ভাগে আপনাকে মহাকৃপাপাত্র দীন মনে করিয়া তিনি শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন। এই অবস্থায় মানব স্বভাব-সুলভ দুর্ব্বলতা সর্ব্বদা চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিত। এই বিরহ ও ব্যাকুল-ভাব আবার দুই সময়ে দেখা যাইত। সম্ভোগের পূর্ব্বে ও পরে। প্রথম-টীকে পূর্ব্বরাগ ও দ্বিতীয়টীকে বিচ্ছেদ বলা যাইতে পারে। এ অবস্থাদ্বয়ে ব্যাকুলতা, হা হুতাস, অসহ্য যন্ত্রণানুভূতি, অনুতাপ, বিষমক্রন্দন, মূর্চ্ছা, স্বেদ, স্তম্ভ, মৌনভাব প্রভৃতি সকল লক্ষিত হইত। সম্ভোগের অবস্থায় ইহার কোন কোন ভাব লক্ষিত হইলেও বিভিন্নরূপ কারণাবলম্বনে উত্থিত হইত। গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে ঈশ্বর সম্ভোগের লক্ষণ নানা অবস্থায় নানা রূপে দেখা যাইত। এই অবস্থায় প্রায় তিনি গভীর যোগে যুক্ত ও ভগবানে অভিন্ন ভাব হইয়া আপনার মানুষ স্বভাব ভুলিয়া যাইতেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব হইতেই "আমি সেই, আমি সেই" প্রভৃতি ভাষা শুনা যাইত; এবং তাহা হইতেই তাঁহার অবতারত্বের প্রধান কারণ, তদীয় শিষ্যগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণসম্ভোগকালে গৌরের নৃত্য, হাস্য,

আনন্দময় প্রলাপ বাক্য, উচ্চকীর্ত্তন, অশ্রু, পুলক, স্বেদ, স্তম্ভ, ও মৌনভাব প্রভৃতি বৈচিত্র্য সকল পর্য্যায়ক্রমে দেখা যাইত। এ অবস্থাতেও তিনি উচ্চ ক্রন্দন করিতেন;* কিন্তু সে অনুতাপের ক্রন্দন নহে, প্রিয়সহবাস জনিত আহ্লাদের ও প্রেমের ক্রন্দন।

এক দিন পূর্ব্বরাগের অবস্থায় গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া আপনার হৃদয়যাতনার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন;—'হায়! কোথায় গেলে সে মুরলীবদনের দেখা পাইব? বন্ধুগণ! আমার দুঃখের অন্ত নাই। প্রাণবল্লভকে পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম। হায়! আমার কি হইবে? মনের দুঃখ বলি শুন'।

পূর্ব্বে তিনি একদিন স্বীয় মনোদুঃখ বলিবেন বলিয়া ভাবাবেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে পারেন নাই; আবার আজ মনের রহস্য কথা প্রকাশ করিবেন শুনিয়া বয়স্যগণ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—'ভাই সব! গয়া হইতে আসিবার সময় কানাইর নাটশালা নামক গ্রামে এক রাত্রি ছিলাম। আহা! এক পরম সুন্দর শ্যামল বালক স্বর্গীয় ভূষায় বিভূষিত হইয়া মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়া চকিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন? হায়! আর কি তাঁর দর্শন পাইব?'

ইহা সকল ভক্ত জীবনেই সংঘটিত হইয়া থাকে। দেবনন্দন ঈশা অভিষেকের পর স্বর্গীয় কপোত দর্শন করিয়াছিলেন। মহম্মদ গিরিশৃঙ্গে ঈশ্বর-দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শাক্যসিংহও কঠোর তপস্যার পর দিব্যদৃষ্টিতে অভীষ্ট দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কানাইর নাটশালায় গৌরচন্দ্রও সেইরূপ দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন। তদীয় জীবনের তাহাই স্তম্ভ স্বরূপ। সে মূর্ত্তি তিনি আর কখন ভুলিতে পারেন নাই। তাহাই তাঁহার সর্ব্বেসর্ব্বা, ইহাতেই তিনি সঞ্জীবিত এবং ইহার দর্শনবিরহেই তাঁহার জীবনমৃত্যু। এত দিন পরে গয়ার রহস্য কথা অবগত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে বিশ্বম্ভর কিসের জন্য পাগল হইয়াছেন। তদবধি তাঁহারা গৌরকে নায়কত্বে বরণ করিয়া আপনারা তাঁহার আনুপাল্য হইয়া নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

বিরহে কাতর হইয়া গৌরসুন্দর স্বীয় ভবনে উপবিষ্ট; তাঁহার প্রিয়-

সঙ্গী গদাধর পণ্ডিত তাঁহার জন্য তাম্বুল আনিয়া খাইতে অনুরোধ করিতেছেন ; গৌরের বাহ্যজ্ঞান নাই ; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরি কোথায় ?' গদাধর উত্তর করিলেন, 'হরি নিরবধি তোমার হৃদয়ে বিরাজিত।' হরি হৃদয়ে আছেন শুনিয়া মুগ্ধ গৌরাঙ্গ নখ দিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। গদাধর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"স্থির হও, একটু অপেক্ষা কর, এখনই হরি আসিবেন।" গদাধরকে গৌর অত্যন্ত ভাল বাসিতেন,তাঁর আশ্বাস বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। শচীমাতা এই ঘটনা দেখিয়া গদাধরকে বহু প্রশংসা করিলেন ও নিয়ত বিশ্বম্ভরের নিকটে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

সঙ্গীদিগের মধ্যে মুকুন্দদত্ত অতি সুগায়ক ছিলেন। ইঁহার আদিবাস চট্টগ্রামে ; গঙ্গাবাস উপলক্ষে নবদ্বীপে স্থিতি। ইনি গৌরচন্দ্রের একজন সহাধ্যায়ী। মুকুন্দের মধুর কণ্ঠস্বরযোগে ভাগবতের শ্লোকাবলি উচ্চারিত হইলে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তখন তিনি উৎসাহে "বোল বোল" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন, চারিদিকে হরিধ্বনি হইত। প্রেমের তরঙ্গে নৈশগগন তরঙ্গায়িত হইয়া যাইত।

এইরূপে নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রেমরঙ্গে গৌরচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বহির্ম্মুখ লোকদিগের বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাহারা কীর্ত্তনের ধ্বনিতে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না ; বিশেষতঃ প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক ভক্তি সাধন করিতেছে ; ইহা তাহাদের প্রাণে সহ্য হইল না। সুতরাং যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা রাজদ্বারে পর্য্যন্ত অভিযোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ও ভক্তদলের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতই বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহাকে জব্দ করিতে পারিলে দলটা ভাঙ্গিয়া যাইবে, মনে করিয়া তাঁহার নামে কত মিথ্যা সম্বাদ রটনা করিতে লাগিল। দেওয়ান হইতে দুইখান নৌকা আসিতেছে ; শ্রীবাস পণ্ডিতকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, এই জনরব অল্পদিন মধ্যে নগরী মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শ্রীবাসের অপরাধ কি ? জিজ্ঞাসা করিলে কেহই কিছু বলিতে পারে না। এই সকল কথা শুনিয়া বৈষ্ণবদলের মধ্যে কেহ কেহ ভয় পাইয়া গেল ; কিন্তু যাঁহাদের বিশ্বাস ফাঁকা নহে, তাঁহারা অটল ভাবে ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলেন। গৌরচন্দ্র এই সকল

টোট্‌কা ধমকে ভীত হইবার লোক নহেন; তাই পুরুষসিংহের ন্যায় অটল ভাবে প্রকাশ্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মতলব—লোক দেখুক, তিনি তাহাদের ভয়ে ভীত নহেন।

ধর্ম্মবীর যাঁহারা, তাঁহারা কি সংসারের লোকের ধমকানিতে ভীত হন? গৌরসিংহকে নির্ভয়ে নগরভ্রমণ করিতে দেখিয়া একদিকে ভক্তদলের যেমন সাহস ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অপর দিকে তেমনি পাষণ্ডীদের মনে ভয় সঞ্চার হইল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল; 'এ তো ভয়ের কথা শুনিয়াও ভয় পায় না, এ যে রাজকুমারের ন্যায় নগরে বেড়াইতেছে।' তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তিনি বলিলেনঃ—'ওগো! তোমরা বুঝিতেছ না, এ পলাইবার ফিকির বই আর কিছু নয়।'

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীবাসের গৃহে।

তটশালিনী ভাগীরথীর সুন্দর পুলিনে বিশ্বম্ভর একাকী লীলা ভ্রমণ করিতেছেন; সম্মুখে প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, মেঘের লেশ মাত্র নাই; তরুণ সূর্য্যের শুভ্র আলোকে দিঙ্মণ্ডল বিধৌত, ভাগীরথীসলিল গর্ভে আকাশের ছবি খানি প্রতিবিম্বিত, কেবল মাঝে মাঝে দুই একটী ক্ষুদ্র উর্ম্মিতে, তাহার ক্রম ভঙ্গ হইতেছে। মাথার উপর আকাশবিহারী কলকণ্ঠ পাখীগুলি নূতন উদ্যমে গাইয়া চলিয়াছে, কূলে নরনারী স্নানাবগাহনান্তে দেবার্চ্চনাদি করিতেছে। অদূরে একদল গাভী গঙ্গাপুলিনে চরিতেছে; কোন কোন গাভী পিপাসার্ত্ত হইয়া গঙ্গাজল পান করিতে অসিতেছে; দুই একটী ঊর্দ্ধপুচ্ছ করিয়া হম্বারব করিতেছে; কেহ কেহ পরস্পর ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেছে; কেহ বা শুইয়া রোমন্থ করিতেছে। প্রকৃতির এই হাসিমাখা ছবি দেখিয়া গৌরচন্দ্রের হৃদয়ের ভাবের কপাট খুলিয়া গেল; অনন্তের দিকে মন ছুটিল। চারিদিক্ হইতেই যেন জীবন্ত ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সম্মুখে গাভীযূথ দর্শন, আর রক্ষা নাই; যুগপৎ বৃন্দাবন লীলাস্মৃতি,

মহাভাবের উদয় ও মহাসমাধিতে প্রাণ নিমগ্ন। বাহ্যজ্ঞান নাই। ভগবানে অভিন্নাত্মক হইয়া গৌরসিংহ গর্জ্জন করিয়া "আমি সেই! আমি সেই!" বলিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন ও যে প্রকোষ্ঠে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন, তাহার বহির্ভাগে আসিয়া সজোরে পদাঘাৎ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমি সেই! আমি সেই! ওহে শ্রীবাস! কি করিতেছো? একবার দেখ না?'

শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হইলে দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইয়া বিশ্বম্ভর সমাধিযোগে বীরাসনে উপবিষ্ট। শ্রীবাস গৌরের ব্যাকুলতা বা পূর্ব্ব রাগের অবস্থা ইত্যগ্রে দুই একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সমাধিতে সম্ভোগের ভাব আর কখন দেখেন নাই; সুতরাং যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বিশ্বম্ভর আবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"ওরে শ্রীবাস! এত দিন কি আমার প্রকাশ জানিতে পারিস্ নাই? তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে ও নাড়ার হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছি; তুই আমাকে আনিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস্, আর নাড়া শান্তি পুরে চলিয়া গেল। সাধুদিগকে রক্ষা করিব, দুষ্টের দমন করিব, তাও কি জানিস্ না? এখন আমার স্তব পড়।' কথিত আছে যে, শ্রীবাস বিশ্বম্ভরের ঈদৃশভাব দেখিয়া বিস্ময়ে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া তৎকালে বিশ্বম্ভরকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং ভাগবতের ব্রহ্মমোহনের স্তোত্র পড়িয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন; পরে সপরিবারে দাসদাসী সহিত বিষ্ণুপূজার জন্য আনীত উপকরণ দিয়া গৌরের পূজা করিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র তখন প্রেমে পূর্ণ মাতোয়ারা; সুতরাং এসব পূজায় আপত্তি করা দূরে থাকুক, পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকারে শ্রীবাসকে কত অমানুষী কথা কহিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন, 'শ্রীবাস! লোকে বলিতেছে, তোমাকে সপরিবারে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য বাদসাহ নৌকা পাঠাইয়াছেন; ইহাতে কি তোমার ভয় হইয়াছে? বিশ্বাসিন্! বিশ্বাস কর, তাহা কখন হইবে না। নৌকা যদি আইসে, তবে আগে আমি তাহাতে পদার্পণ করিব। দেখি দেখি, কে তোমাকে ধরিতে পারে? তাহাতেও যদি ক্ষান্ত না হয়; আমি তবে এই ভাবে রাজার নিকট যাইয়া তাঁহার সব কাজী মোল্লা আনিয়া ভগবৎপ্রেমে

সকলকে কাঁদাইতে বলিব; যখন তাহারা পারিবে না; তখন হরিগুণানু-কীর্ত্তন করিয়া আমি সেই রাজা ও সভাসদগণকে কাঁদাইয়া দিব। ইহাতেও কি রাজার বিশ্বাস হইবে না?” শ্রীবাসের মুখে সন্দেহের ছায়া দেখিয়া গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, ‘শ্রীবাস! আমার এ কথায় কি তোমার প্রত্যয় হইতেছে না? দেখিবে সাক্ষাতে এই ছোট বালিকাকে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদা-ইতে পারি কি না?’ এই বলিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা চৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাসের জননী চারি বছরের মেয়ে নারায়ণীকে বলিলেনঃ;—“নারায়ণি! কৃষ্ণ প্রেমে কাঁদ দেখি?” নারায়ণী অমনি হা কৃষ্ণ! বলিয়া প্রেমাবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

তখন গৌরচন্দ্র বলিলেন, ‘কেমন, শ্রীবাস! এখন তোমার সন্দেহ দূর হ’ল তো?’

শ্রীবাস তখন দুই বাহু তুলিয়া উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন; ‘ভগবানে যদি আমার বিশ্বাস থাকে; তবে কিসের ভয়? বিশেষতঃ এখন তো তুমি আমার গৃহে বিরাজমান; এখন আর ভয় কেমন করিয়া থাকিবে? বলিতে বলিতে বিশ্বাসীর নয়ন যুগল দিয়া দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

গৌরের মহাভাব দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য নয়; যখন সে ভাব হইত, যখন শ্রীকৃষ্ণে মন মগ্ন হইত ও হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথকে পাইয়া আত্মায় আত্মায় মিশিয়া এক হইয়া যাইতেন, তখনকার ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইয়া যাইত না। সে সময়ে গৌরের স্বাভাবিক বিনয় ও দৈন্য আর থাকিত না। মহাধন লাভ হইলে কেই বা দীন থাকে? তাই আস্ফালন সহকারে কত কথাই বলিয়া ফেলিতেন। পাঠক! বিস্মিত হইও না; এ অবস্থা অসামান্য হইলেও অসম্ভব মনে করিও না। সাধারণ লোকের ভাব দেখিয়া মহানু-ভবদিগের বিচার করা সুবুদ্ধির কার্য্য নয়। তোমার আমার মহাভাব ও অভিন্ন ভাব হয় না বলিয়া তাহা কি অসম্ভব মনে করিতে আছে?

ভাবাবসানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহালজ্জিত হইলেন ও শ্রীবাসকে এই সব কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি শ্রীবাসের বাটী গৌরের নিত্য বিহার স্থান হইল।

বরাহ ভাব ও মুরারি গুপ্ত।

গৌরজীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় নিত্য নূতন ভাবাবেশ হইতে লাগিল; এবং এক একটী বিশেষ ভাব দেখিয়া এক একজন ভক্ত চিরদিনের মত আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি এক এক করিয়া এই সকল ভাব দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন; ও চির দিনের মত তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। মুরারি প্রভৃতি বাকী আছেন; তাঁহাদেরও সময় হইয়া আসিয়াছে।

এক দিন বরাহাবতারের শ্লোকাবলি ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়া গৌরাঙ্গের বরাহাবেশ হইল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মুরারির প্রতি গৌরের বড় ভালবাসা ছিল। সহসা বিশ্বম্ভরকে আসিতে দেখিয়া মুরারি সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বন্দনা করিলেন! গৌরচন্দ্র 'শূকর! শূকর!' বলিয়া বিষ্ণু মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র দেখিয়া বরাহভাবে তাহা দন্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া শূকরের ন্যায় চারি পায়ে চলিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে মুরারি গুপ্ত প্রকৃতরূপে বিশ্বম্ভরকে বরাহ আকার ধারণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরের নরদেহ অন্তর্ধান হইয়া শূকরদেহ প্রাপ্তি হইয়াছিল, কি ঈশার শিষ্যেরা যে ভাবে তাঁহাদের নেতাকে শূন্যপদে সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে ও দুইখানি রুটী দ্বারা দুই সহস্র লোককে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতে দেখিয়াছিলেন, মুরারি গুপ্ত সেইরূপ যোগের ও বিশ্বাসের চক্ষে গৌরের বরাহরূপ দেখিয়াছিলেন, বিবেচক পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। মুরারি গুপ্ত অপূর্ব্ব দর্শনে স্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলে গৌরচন্দ্র পূর্ণ ভাবাবেশে বলিলেন 'মুরারি! তুমি কি এখনও জানিতে পার নাই যে, আমি এখানে আসিয়াছি?'

তৎপরে মুরারি গুপ্তকে বরাহভাবে নানারূপ উপদেশ দিয়া গৌরচন্দ্র বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন;—

"এই মত সর্ব্ব লোকের ঘরে ঘরে;
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে।
চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার;
পরমানন্দময় চিত্ত হইল সবার।"

আসল কথা গৌরের ভাবময় জীবনই এই সকল আধ্যাত্মিক দর্শনের মূলীভূত কারণ। সুদক্ষ বাজীকরের বাজীতে দর্শকবৃন্দ যখন নানারূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া থাকেন, তখন একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প্রেরিত মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনের আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শনে যে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাসম্পন্ন অনুচরবর্গ অলৌকিক দর্শন করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

নিত্যানন্দ মিলন।

নিত্যানন্দের জন্মকথা ও তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যখন গৌরচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরস্পর গৌরের অপূর্ব্ব ভক্তিবিকাশের কথা শুনিয়া তাঁর সহিত সাক্ষাৎ মানসে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করিয়া নন্দনাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবধূত বেশ, প্রকাণ্ড শরীর, মদমত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গতি; নিয়ত কৃষ্ণনাম রসনা দিয়া উচ্চারিত হইতেছে; হরিপ্রেম মদিরা পানে মাতোয়ারা, পদে পদে গতি স্খলিত হইতেছে; দেখিলে হঠাৎ মাতাল বলিয়া ভ্রম জন্মে, অথচ মুখশ্রী পবিত্র ও গম্ভীর, তাহাতে আবার বালকের সরলভাব ব্যঞ্জিত। পরম ভাগবত নন্দনাচার্য্য এই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষকে পাইয়া যত্নের সহিত আতিথ্য সৎকার করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতন্য যেমন কৃষ্ণাবতার, শ্রীনিত্যানন্দও তেমনি বলরাম, সঙ্কর্ষণ ও অনন্তের অবতার বলিয়া পূজিত। এই অবতার তত্ত্ব কি? স্বভাবতঃ তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। বৈষ্ণবীয় অবতার তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের উত্তরভাগে বর্ণিত হইবে; সংপ্রতি তাহার সংক্ষিপ্ত অবতারণা করা যাইতেছে। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না; সৃষ্টির আদিকারণে ঐ গুণত্রয় নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিতি করে। ভগবদিচ্ছার সংযোগে যখন গুণত্রয় বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়, তখন সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেক পদার্থে ঐ ত্রিবিধ গুণ অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাগবতে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুকেই ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে ভগবদ্গুণাংশের

আধারগুলি সমস্তই গুণাবতার বলিয়া কথিত হইলেও সৃষ্টিকার্য্যের মৌলিক কতকগুলি গুণ ঈশ্বরের আদ্যবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে ইহারাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, বেদান্তমতে ইহাদিগকেই পুরুষাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এগুলি গুণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন সঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কারতত্ত্ব একটী গুণ, যাহা সৃষ্টি বিষয়ে এক মৌলিক উপাদান। বলরামে ঐ তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়া তিনিই সঙ্কর্ষণ ; আবার নিত্যানন্দে সেই গুণ দেখা গিয়াছিল সুতরাং তিনি বলরামের বা সঙ্কর্ষণের অবতার। কালক্রমে আবার কোন অসাধারণ ব্যক্তিতে কোন অসাধারণ গুণ লক্ষিত হইলে সেইটীকে আদর্শ গুণ বা সৃষ্টি লীলার একটী উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা হইত। উত্তরকালে সমুৎপন্ন কোন ব্যক্তি বিশেষে সেই গুণ লক্ষিত হইলে সেই ব্যক্তিকে পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শগুণশালী পুরুষের অবতার বলা যাইত। হনুমান রামচন্দ্রের দাসত্বে ও সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন ; চৈতন্য-ভক্তের মধ্যে মুরারি গুপ্ত রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ও চৈতন্য সেবক ছিলেন ; সুতরাং তিনি হনুমানের অবতার। সচরাচর কোন ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে যেমন ধর্ম্মাবতার বলা যায় ; এখানেও সেই রূপ কোন নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কথিত আছে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর মনোবলে জানিতে পারিয়া সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ২।৩ দিন মধ্যে কোন মহাপুরুষ এখানে আসিবেন। তখন সে কথার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পর যে দিন নিত্যানন্দ নন্দনাচার্য্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন ; তাহার পরদিন গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবদলের নিকট বলিতে লাগিলেন "গত রাত্রিতে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। তালধ্বজ রথোপরি প্রকাণ্ড শরীর হলধর মূর্ত্তি এক মহাপুরুষ আসিয়া যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিমাই পণ্ডিতের কি এই বাড়ী ? মহাপুরুষের নীলবস্ত্র পরিধান, অবধূত বেশ, বাম শ্রুতিতে এক বিচিত্র কুণ্ডল, মহাদুর্দ্দান্ত প্রেমিক ও স্খলিত গতি। আমি অত্যন্ত সংভ্রম সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোন্ মহাপুরুষ ? তিনি উত্তর করিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি আমার ভাই, আচ্ছা কাল তোমার সঙ্গে পরিচয় হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে গৌরচন্দ্র হলধর আবেশে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "বন্ধুগণ! আমার বোধ হইতেছে, কোন মহা-

পুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন" ; শ্রীবাসকে কহিলেন "পণ্ডিত ! তুমি যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান কর।" বর্ণিত আছে যে, শ্রীবাসপণ্ডিত তিন প্রহর কাল অনুসন্ধান করিয়া নিত্যানন্দের উদ্দেশ না পাইয়া গৌরাঙ্গকে জানাইলে গৌর তখন সদলে নন্দনের গৃহে যাইয়া নিত্যানন্দের দর্শন লাভ করিলেন। অবধূতের মুখশ্রীতে তপস্যার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া গৌরচন্দ্র গণ সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

সাধুগণের হৃদয়ে এক প্রকার বৈদ্যুতিক যোগ আছে যে, চারি চক্ষু একত্রিত হইলেই পরস্পরকে চিনিতে বাকী থাকে না। নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের পরস্পর সন্দর্শনে তাহাই হইল ; নিতাই এক দৃষ্টিতেই গৌরকে চিনিয়া লইলেন।

গৌর নিতাইকে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিলেও তাঁহার মহিমা সমবেত বৈষ্ণব মণ্ডলীতে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবাসকে ভাগবতের শ্লোকাবৃত্তি করিতে বলিলেন। শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বিষয়ক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলে নিতাই প্রেমে বিভোর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া গৌরচন্দ্র শ্রীবাসকে 'পড় ! পড় !' বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিতে লাগিলেন।

তৎপরে নিতাই নানা প্রকার ভাবাবেশে কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে, কখন উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে ও লম্ফ দিতে লাগিলেন দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া কোলে করিয়া বসিলেন ও তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন :—'আজ আমার শুভদিন ; তাই বেদের দুর্লভ ভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম। এ গর্জ্জন, হুঙ্কার, অশ্রু, কম্প, সাত্ত্বিকবিকার কি ঈশ্বরচরিত্র ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবে ? বুঝিলাম আপনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি প্রেমভক্তি ; আপনার সংস্পর্শে মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায় ; বুঝিলাম ভগবান্ আমাকে পরিত্রাণ দিবেন বলিয়া এ হেন সঙ্গ জুটাইয়া দিলেন ; আরও বুঝিলাম যে আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' রতনেই রতন চেনে ; প্রেমিক না হইলে প্রেমিকের মর্ম্ম বুঝা যায় না। তাই গৌর সুন্দর আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের এত স্তুতি করিলেন। নিতাই সংজ্ঞা লাভ করিলে গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কোন্ দিক্ হইতে মহাশয়ের আগমন হইল ?" নিতাই বালকের ন্যায় চঞ্চল ; বিশেষতঃ আপনার স্তুতি শুনিয়া লজ্জিত হইয়া প্রকারান্তরে গৌরের স্তুতিবাদ করিয়া

উত্তর করিলেন ; "আমি কৃষ্ণের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু কোনখানে কৃষ্ণ না দেখিয়া দুঃখিত হইয়া ভাল ভাল লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কৃষ্ণের স্থান সব শূন্য দেখিতেছি কেন ? কৃষ্ণ কোথায় ?' তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, কৃষ্ণ সংপ্রতি গৌড়-দেশে গিয়াছেন। তাহার পর শুনিলাম যে, নবদ্বীপে বড় নাকি সঙ্কীর্ত্তনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে ; ও কত পতিত নরাধম পরিত্রাণ পাইতেছে। কেহ কেহ এরূপও বলিল যে, এখানে নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়া এখানে দৌড়িয়া আসিলাম, দেখি পরিত্রাণ পাই কি না ?"

বিশ্বম্ভর প্রত্যুত্তরে বলিলেন 'আমরা মহাভাগ্যবান্ যে তোমার ন্যায় সাধুর সহিত আমাদের মিলন হইল। দুইজনের মিলন দেখিয়া ও কথোপকথন শুনিয়া বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে কত কি বলাবলি করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস আনন্দ মনে বলিয়া উঠিলেন 'ঠিক্ যেন মাধব শঙ্কর ! উঁহাদের ভাব আমরা কি বুঝি ?' গদাধর বলিলেন 'পণ্ডিত ! বেশ বলেছো, ঠিক যেন রাম লক্ষ্মণ !' কেহ বলিল যেন কৃষ্ণ বলরাম। অন্য জনে বলিল যেন অনন্তের কোলে শ্রীকৃষ্ণ। অপর ভক্ত বলিলেন 'না হে ঠিক্ যেন কৃষ্ণার্জ্জুন ; দেখিতেছ না তেমনি মাখামাখি প্রেম। উঁহাদের সব কথা ঠারে ঠোরে ; আমরা কি বুঝিব ?'

নিতাই গৌরের পর জীবনের ঘটনার রঙ্গে যে এই ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর গৌর নিতাই ও সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া শ্রীবাসমন্দিরে আগমন করিলেন। তখন মহানন্দে বিহ্বল হইয়া বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলে বাহিরের দরজা বন্ধ হইল। মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপিতে লাগিল ; হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল ও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সকলে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীপাদ গোঁসাই ! তোমার ব্যাস পূজা কোথায় হইবে ?" নিতাই শ্রীবাসকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই বামনার বাটীতে"। তখন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে কহিলেন "তোমার উপর বড় কার্য্যের ভার হইল"। শ্রীবাস উত্তর করিলেন, 'কিছু ভয় নাই ; পূজার আয়োজন সামগ্রী সকলই ঘরে আছে ; কেবল এক পদ্ধতি পুস্তক নাই ; তাহা চাহিয়া আনিলেই হইবে।'

বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'তবে আর কি? এস সকলে মিলে ব্যাসপূজার অধিবাস-উল্লাস কীর্ত্তন করি।

তখন দ্বিগুণ মাত্রা চড়াইয়া প্রেমমত্ততার সহিত নৃত্য কীর্ত্তন হইতে লাগিল। নিতাই ও গৌর কখন দুইজনে বাহু ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিতে লাগিলেন; বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন ও নৃত্যে মত্ত হইলেন। গৌর নিতাই পরস্পর পরস্পরের চরণধূলি লইতে চেষ্টা করিলেন; উভয়েই পরম চতুর, কেহই ধরিতে ছুঁইতে দিলেন না। কখন উভয়ে প্রেমানন্দে শ্রীবাসের আঙ্গিনার মধ্যে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। নিতাই ও গৌরের নৃত্য প্রেমোন্মাদ জনিত হইলেও, উভয়ের নৃত্যে কিছু কিছু বিশেষভাব দেখা গেল। বিশ্বম্ভর প্রেমে টলিয়া টলিয়া ও ঢুলিয়া ঢুলিয়া নাচাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার মস্তক গিয়া চরণ স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু নিতাইর উদ্দণ্ড নৃত্যে পৃথিবী টলটলায়মানা। এই সকল ভাব দেখিয়া শুনিয়া কোন ভাবুক ভক্ত গাইয়াছিলেন;—

"শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে।
আমার নিতাই নাচে রঙ্গ ভঙ্গে;
গৌর নাচে প্রেম তরঙ্গে;
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল বলে"।

নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে গৌরচন্দ্রের সে দিন বলরামাবেশ হইল। হইবারই তো কথা; কারণ পূর্ব্ব হইতে বলদেবকে স্বপ্নে দেখা ও নিতাইর সহিত তাঁহার অভিন্নভাব অনুভব করা হইয়াছিল। বলরামাবেশে গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের খট্টার উপর উঠিয়া বসিয়া "মদ আন! মদ আন!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ও নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'আমার হল মুষল দাও'। নিতাই গৌরের করে কর দিয়া বলিলেন, 'এই লও'। অনেকে উভয়ের করে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কথিত আছে, কেহ কেহ প্রত্যক্ষে হল মুষল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই সকল ভাবময় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারায়, ধর্ম্মজগতে অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্যের কতই বর্ণনা হইয়াছে। শুধু বর্ণনা নয়, এই সকল কার্য্য (Miracles) কত নর নারীর বিশ্বাসস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ উপরোক্ত বর্ণনা পাঠে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বিশ্বম্ভর তখন "বারুণি! বারুণি!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ মর্ম্ম বুঝিয়া গঙ্গাজল পূর্ণ পাত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। গৌরচন্দ্র তাহা পান করিলে সকল ভক্তগণ সেই জল অল্প অল্প চাখিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা ঐ জলে সত্য সত্য কাদম্বরীর আস্বাদ পাইয়াছিলেন। গৌর তখন 'নাড়া! নাড়া!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু! কাহাকে নাড়া বলিতেছ'? গৌর উত্তর করিলেন;—"যাহার হুঙ্কারে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিলাম; যাহার সাধনায় বিষয়জাতীয়ত্ব ছাড়িয়া আশ্রয়জাতি হইয়াছি; লোকে যাঁহাকে অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়া ডাকে, সেই আমার নাড়া। লোকটার রকম দেখ! আমাকে এখানে আনিয়া হরিদাসকে লইয়া সুখে শান্তিপুরে বসিয়া রহিয়াছে।'

কিছুকাল পরে গৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?' শিষ্যগণ উত্তর করিলেন; "বড় কিছু নয়"। গৌর তখন লজ্জিত হইয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন 'ভাই সব! আমার অপরাধ লইও না।'

এদিকে নিতাইচাঁদের আবেশ আর ছাড়ে না। স্বয়ং বিশ্বম্ভর নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে নিতাইর বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল ও শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা।

নিত্যানন্দ শ্রীবাসগৃহে শয়ন কক্ষে শয়ান। গভীর রজনীতে তিনি হঠাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া কি মনে করিয়া হুঙ্কারশব্দে পার্শ্বস্থিত নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলেন। কি কারণে তিনি আপন সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্ন বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নিতাই কি ভাবিলেন যে প্রেমভক্তি না থাকিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা

ভণ্ডামি? অথবা সন্ন্যাসগ্রহণ ভগবদিচ্ছার অনুগত নহে—কে বলিবে? বৃন্দাবন দাস মহাশয় তাঁহার একজন বিশ্বাসী শিষ্য ও তদ্গত প্রাণ, তিনিও ইঁহার তথ্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

প্রত্যূষে উঠিয়া শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর রামাই পণ্ডিত নিতাইয়ের শয়নকক্ষের প্রকোষ্ঠের দ্বারে ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্বীয় অগ্রজকে তদ্বিষয় অবগত করিলেন। পণ্ডিত আবার ঐ কথা গৌরের কাণে তুলিলেন। গৌর আসিয়া ভাঙ্গা কমণ্ডলু ও দণ্ড খণ্ড লইয়া, নিতাইকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ! একি?" নিত্যানন্দ ভাবাবেশে মগ্ন; গৌরের কথায় কোন উত্তর না দিয়া কেবল 'খিল খিল' করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইয়া স্বহস্তে সেই দণ্ড কমণ্ডলু গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলেন।

সদলে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করিতেছেন। নিতাই বাল্যভাবে বিভোর; খুব সাঁতার দিতেছেন; মাঝ গঙ্গায় সাঁতার দিয়া কুম্ভীর ধরিতে অগ্রসর হইতেছেন এবং জলক্রীড়ায় কতমত চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন। সঙ্গীগণ নিষেধ করিলে চঞ্চল নিতাই একগুণের স্থানে দশগুণ দুষ্টামি করিতে লাগিলেন। কেবল গৌরের তাড়নায় কিছু স্থির হইলেন। অবশেষে গৌরচন্দ্র কহিলেন, "শ্রীপাদ গোঁসাই! তোমার যে আজ ব্যাস পূজার দিন; কখন পূজা হইবে?" ব্যাস পূজার কথা মনে হওয়ায় নিতাই জল হইতে উঠিয়া এক দৌড়ে শ্রীবাসালয়ে আসিয়া হাজির। এ দিকে গৌরচন্দ্র ও আর আর ভাগবতজনও একে একে আসিয়া জুটিলেন। ব্যাস পূজার সামগ্রী সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইলে ভক্তদল মৃদু মধুর সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত পূজার আচার্য্য হইয়া সুন্দর এক ছড়া বনফুলের মালায় গন্ধ লেপন করিয়া নিতাইর হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন 'নিতাই! এই মালা স্বহস্তে লইয়া আমি যে বচন বলি তাহা উচ্চারণ করিয়া বেদব্যাসের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া নমস্কার কর। স্বহস্তে মালা দিবার বিধি আছে; নইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না।'

নিত্যানন্দ ভাবাবেশে ভোর হইয়া কি ভাবিতেছেন; পণ্ডিতের কথায় তত মনোযোগ নাই; বচন পড়া দূরে থাকুক, মালা গাছটী হাতে করিয়া কেবল 'হাঁ হাঁ' বলিতে ও চারিদিকে শূন্য চক্ষে চাইতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শাদাশিদে উদার রকমের লোক; ভিতরকার গূঢ়ভাব না বুঝিতে

পারিয়া গৌরচন্দ্রকে বলিলেন ; "তোমার শ্রীপাদ গোঁসাই মন্ত্র পড়িয়া ব্যাস-পূজা করিতেছেন না।"

শ্রীবাসের কথায় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "শ্রীপাদ ! পণ্ডিতের কথা শুনিতেছ না কেন ? মালা দিয়া বেদব্যাসকে প্রণাম কর।" নিতাই সম্মুখে বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া একবার এ দিক ও দিক তাকাইলেন এবং তাঁহার কথার উত্তর না করিয়া মালা গাছটী একবারে তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন।

মালা অর্পণ করিলে বিশ্বম্ভর নিতাইকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। কথাটা অতি অদ্ভুত। অন্য দর্শকবৃন্দ ঐরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন পরিষ্কার বর্ণনা দেখা যায় না। তবে গ্রন্থকার নিজেই কথাটীর অলৌকিকত্ব অনুভব করিতে পারিয়া দোষ ক্ষালনার্থে প্রস্তাবান্তরের অবতারণা করিয়াছেন। ষড়্‌ভুজদর্শনে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন দেখিয়া গৌরচন্দ্র স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া মূর্চ্ছাপনোদন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া মহানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই ব্যাপারের এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন যে, নিত্যানন্দহৃদয়ে অনন্তের ভাবে ভগবচ্ছক্তি আরূঢ়, তাঁহার পক্ষে ষড়্‌ভুজ দর্শন কোন্ আশ্চর্য্য কথা ?

> "ছয়ভুজ দৃষ্টি তাঁরে সে কোন্ অদ্ভুত ?
> অবতার অনুরূপ এ সব কৌতুক।
> রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈল ;
> প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ নিল।
> সে যদি অদ্ভুত হয়, এ তবে অদ্ভুত ;
> নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক।"

এ কথার সূক্ষ্ম মীমাংসার ভার পাঠক মহাশয়ের উপর দেওয়া গেল। যে হৃদয়ে অন্তর্যামী যে ভাবে আবির্ভূত হইবেন, বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় তাঁহার নিকট তদনুরূপ হইবে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

ইহারই নাম ব্যাসপূজা। গৌরচন্দ্র বলিলেন ব্যাস পূজা পূর্ণ হইল ; এখন সকলে মহাসংকীর্ত্তন কর। তখন মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল ; গৌর নিতাই দুই ভাই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গলা

ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিলেন; শচীমাতা শ্রীবাসের অন্দর প্রকোষ্ঠে থাকিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া মহা আনন্দিতা হইলেন এবং মনে মনে উভয়কেই আপন আত্মজ জ্ঞান করায় স্নেহ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ভক্তগণ কেহ নাচিতে, কেহ গাইতে, কেহ বাজাইতে উন্মত্ত; কেহ কেহ অচৈতন্যাবস্থায় ভূমি শায়িত; আর কোন কোন ভাগ্যবান্ ভক্তদলের পদরজে গড়াগড়ি পাড়িতে লাগিলেন।

নৃত্যকীর্ত্তনে দিবা অবসন্ন হইল দেখিয়া বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন। সকলে সুস্থির হইয়া বসিলে গৌরচন্দ্র শ্রীবাস পণ্ডিতকে ব্যাসোদ্দেশে আহরিত নৈবেদ্যাদি আনিতে বলিলেন এবং ঐ সকল দ্রব্য আনীত হইলে স্বহস্তে উপস্থিত ভক্তদলকে বণ্টন করিয়া দিলে ভক্তগণ মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেদিনকার কৌতুক নিবৃত্ত হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈত আগমন।

গৌরের ভক্তদল দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও সংকীর্ত্তনের জমাটে নবদ্বীপ তোলপাড় হইয়া গেল। কিন্তু এই আনন্দবাজারে অদ্বৈতকে না দেখিয়া বিশ্বম্ভর দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, যেদিন বিশ্বম্ভরের মহাভাবের অচৈতন্যাবস্থায় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার পাদপূজা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য গদাধর কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে গৌরকে তিনি অন্যচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু পূর্ণরূপে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিবার জন্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের বাটীতে চলিয়া যান; তদবধি আর নবদ্বীপে আইসেন নাই। একদিন গৌরচন্দ্র মহাসমাধিতে ভগবানের সহিত অভিন্নযোগে যুক্ত হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের ভাই রামাইকে শান্তিপুরে যাইয়া নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সস্ত্রীক নবদ্বীপে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, রামাইয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, পূজার আয়োজন লইয়া অদ্বৈত আসিয়া যেন তাঁহাকে পূজা করেন। রামাই শান্তিপুরে অদ্বৈত-

ভবনে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে আচার্য্য প্রথমতঃ তাঁহার কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'হাঁ! ভগবানের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই যে, তিনি নবদ্বীপে কতকগুলা লোকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন? বল দেখি কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে যে, নবদ্বীপে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন?'

"কোথা বা গোঁসাই আইলা মানুষ ভিতরে?
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ার অবতারে?"

বড় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অদ্বৈত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। রামাই তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কথায় উত্তর দিলেন না। ক্ষণকাল পরে আচার্য্য প্রকৃতিস্থ হইলে রামাই বলিলেন—"এখন ওরূপ বলিলে হইবে কেন? ভক্তিশূন্য জগতে ভক্তিপ্রচার করিবার জন্য যে তখন কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছিলেন, তাকি মনে নাই? আজ সেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়া ঘরে ঘরে ভক্তি বিলাইতেছেন; এখন উদাসীন হইয়া থাকিলে চলিবে কেন?" অদ্বৈতাচার্য্য কিছু সন্দেহব্যঞ্জকভাবে উত্তর করিলেন "দেখ রামাই! আমাকে তিনি যাইতে বলিয়াছেন; আমি যাইব। কিন্তু সত্য সত্যই তিনি যদি সেই হন, যাঁহার জন্য কঠোর সাধ্য সাধনা করিয়াছি; তবে তিনি সেই ঐশ্বর্য্য আমাকে দেখাইবেন, যাহা আমার মনে জাগিতেছে।" এই বলিতে বলিতে অদ্বৈত রায় মহা উত্তেজিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেনঃ—"আর সত্য সত্য আমার এই পলিতকেশ মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম উঠাইয়া দিবেন। ইহা যদি পারেন, তবে তাঁহাকে আমি আপন প্রাণনাথ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারি; নচেৎ নহে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আচার্য্যের অধর, ওষ্ঠ, ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন—"রামাই! তুমি অগ্রসর হও, আমি সস্ত্রীক তোমার অনুগমন করিব ও গোপনে যাইয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব। সাবধান, তুমি একথা বিশ্বম্ভরকে বলিবে না। তাঁহাকে বলিও যে অদ্বৈত আসিলেন না। দেখি, আমাকে তিনি খুজিয়া বাহির করিতে পারেন কি না?"

রামাই তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন; অদ্বৈতও নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সস্ত্রীক নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন এবং নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কথাটা একটু প্রাণে আঘাত দিতেছে। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক; আমাদের আদর্শ অনুসারে সাধুজীবনের

সাধুতা দেখিতে ইচ্ছা হয়। অদ্বৈতাচার্য্য একজন মহাসাধু; তবে তিনি কেমন করিয়া রামাই পণ্ডিতকে অসত্য কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন? আর রামাইও একজন ভক্ত, তিনিই বা অদ্বৈত আসিবেন না, এই মিছাকথা বলিয়া গৌরকে ভুলাইতে কেন স্বীকৃত হইলেন? তবে কি অদ্বৈতের নবদ্বীপ আগমনের বৃত্তান্ত মধ্যে যে সকল অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপনে অভিলাষী ভক্তগণের মনের বিশ্বাস ও আবেগ, প্রেমভক্তির রঙ্গে প্রতিফলিত করিয়া ছবিখানিকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে?

শ্রীবাসালয়ে প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; গৌরচন্দ্র পূর্ণ মাত্রায় ভাবে বিভোর হইয়া মৌনাবলম্বনে বসিয়া আছেন, ভক্তদল তাঁহার আবিষ্ট চিত্ত বুঝিয়া চারিদিকে চুপ করিয়া আছেন, এমন সময় গৌরসিংহ হুঙ্কার করিয়া এক বারে পণ্ডিতের বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন। নিত্যানন্দ নিকটে ছিলেন, তিনি অমনি তাড়াতাড়ি একটী ছত্র লইয়া গৌরের মস্তকে ধরিলেন। আর গদাধর কর্পূর ও তাম্বূল দিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র স্বানুভবানন্দে মাথা ঢুলাইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন:—“নাড়া আসিতেছে; নাড়া আমার ঠাকুরালি দেখিতে চাহে।”

এই সময়ে রামাই পণ্ডিত শান্তিপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিলেন। পণ্ডিত কিছু না বলিতেই আবিষ্ট গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন,—“কি রামাই! নাড়া বুঝি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছে ও আপনি নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছে? আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, এখন তুমি যাও, তাঁহাকে ডাকিয়া আনো গে।” রামাই নন্দন আচার্য্যের গৃহে যাইয়া সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে অদ্বৈত সস্ত্রীক আসিয়া গৌরের সভায় উপনীত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার বোধ হইল, বিশ্বম্ভর মহাজ্যোতির্ম্ময় ভূষণে ভূষিত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, চারিদিকে মহাজ্যোতির্ম্ময় দেবগণ যেন তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিতেছে; অনন্ত আপনি ছত্র ধারণ করিয়াছেন ও চারিদিকে যেন দেবোৎসব হইতেছে। অদ্বৈতের স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া গৌরচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—“আচার্য্য! কি দেখিতেছ? তোমারই কঠোর আরাধনায় আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, জীবের দুঃখ আর থাকিবে না। আর চারিদিকে এই যে ভক্তদল দেখিতেছ, ইহারা

সকলেই দেবাংশে আবির্ভূত হইয়াছেন।” কথিত আছে যে, অদ্বৈতের তখন আর অবিশ্বাসের কারণ থাকিল না; তখন প্রেমে, আনন্দে ও আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ; জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ” শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য গৌরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। আর বিশ্বম্ভর কি করিলেন? এত দিন যাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, ঈশ্বর ভাবে মগ্ন হইয়া একেবারে তাঁহার মাথায় পা দুখানি তুলিয়া দিলেন; তখন ভক্তদল একেবারে ‘জয়! জয়!’ ধ্বনি করিয়া একটা তুমুল আন্দোলন করিয়া তুলিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্রখানি অতিরঞ্জিত; পাঠক মহাশয়! অতি সাবধানে ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন।

বিশ্বম্ভর আদেশে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন; বৃদ্ধ আচার্য্য তখন প্রেমে ভোরপূর, সুতরাং নানারূপ অঙ্গভঙ্গিতে নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তদল হাসিয়া অস্থির হইলেন। গৌর তখনও বিভোর, অদ্বৈতকে বলিলেন—“আচার্য্য! কিছু বর লও।’

আচার্য্য উত্তর করিলেন, “আর কি বর চাহিব? যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাপেক্ষা অনেক বেশি পাইলাম।”

বিশ্বম্ভর। “তবু আর কোন অভিলাষ কি নাই?”

অদ্বৈত। আছে, একটী নিবেদন আছে। প্রেমভক্তি বিলাইতে বসিয়াছ, আমার প্রার্থনা এই যে, স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল প্রভৃতি লোকদিগকে, জাতি-বিদ্যা-ধন মদে মত্ত লোকগুলা সর্ব্বদাই ঘৃণা করে ও পীড়া দেয়; প্রেমভক্তি দিতে হবে আগে তাহাদেরই দিও। পাপিষ্ঠগুলা দেখুক যে, ভগবানের নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই।

বিশ্বম্ভর। এই ত কথা! আচ্ছা তাহাই হইবে।

এই মতে নানা রূপ রঙ্গ ভঙ্গির পর গৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন, সকল গোল চুকিয়া গেল, নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের পরিচয় হইল এবং তদবধি অদ্বৈতাচার্য্য সস্ত্রীক নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্যানিধি না প্রেমনিধি ?

একদিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া বিশ্বম্ভর 'বাপ রে পুণ্ডরীক ! বন্ধু রে ! তোকে কবে দেখিব ?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্ডরীক নাম ধরিয়া বুঝি প্রভু কাঁদিতেছেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের ভাবাবেগ উপশমিত হইলে কোন কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু ! আজ আমাদের মনে এক সন্দেহ হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন।"

বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সন্দেহ ?

প্রশ্নকর্ত্তা কহিলেন, আজ আবেশ সময়ে একটী নূতন নাম শুনিয়াছি, পুণ্ডরীক বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। পুণ্ডরীক কে তাহা কি আমরা জানিতে পারি না ?

বিশ্বম্ভর।—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম ধন্য করিবার জন্য ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি মহাপ্রেমিক ও বিশ্বাসী। গঙ্গার মাহাত্ম্যে তাঁর এত দূর বিশ্বাস যে, পাদস্পর্শ হইলে অপরাধ হইবে ভয়ে তিনি গঙ্গাজলে স্নান করেন না; আর লোকে পরম নির্ম্মল গঙ্গাজলে কুল্য, দন্তধাবন প্রভৃতি অনাচার করে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এতই ব্যথা হয় যে, ঐ সকল মলিন কার্য্য দর্শনের ভয়ে দিবাভাগে গঙ্গা দর্শন করেন না। এখন তিনি চাটিগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্রই এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ ব্যবহারাদি ঘোরবিষয়ীর ন্যায়, দেখিলে হঠাৎ ভক্ত বলিয়া চেনা যায় না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে; তোমরা সকলে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আন দেখি ?'

এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় ভক্তপ্রার্থনায় ও সেবাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে আসিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন এবং বহুবিধ দাসদাসী দ্রব্যসামগ্রী লইয়া একজন মহাধনাঢ্য ভোগীর ন্যায় যাত্রা করিয়া যথাসময়ে নবদ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা গৌরের ভক্তদল কেহই জানিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র মুকুন্দ

সে সম্বাদ জানিয়া অপ্রকাশিত রাখিলেন। বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ দত্ত এক গ্রামে জন্মিয়াছেন ও উভয়ে বাল্যবন্ধু। সে কারণে মুকুন্দের কাছে ঐ সংবাদ অপ্রচারিত থাকিল না। গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের হৃদয়বন্ধু, পরস্পরের নিকট পরস্পরের কোন কথা লুকান থাকিত না; কাজেই মুকুন্দ গদাধরকে ঐ সংবাদ না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুকুন্দ বলিলেন "গদাধর! আজ তোমাকে এক শুভ সংবাদ দি; কয়েক দিন হইল নবদ্বীপে এক জন অদ্ভুত বৈষ্ণব আসিয়াছেন। যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল, দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।"

গদাধর পণ্ডিত বাল্যকাল হইতে সংসারে বিরক্ত, ভক্তি-পিপাসু। বৈষ্ণব দর্শনের কথা শুনিয়া আনন্দ সহকারে "চল তবে যাই" বলিয়া গমনে উদ্যত হইলেন। দুই বন্ধুতে তখন শুভ যাত্রা করিয়া বিদ্যানিধির প্রবাস বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধর বৈষ্ণবদর্শনের কথা শুনিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, একজন উদাসীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইবেন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যখন দেখিলেন যে বহু দাসদাসী দ্রব্য-সামগ্রীতে প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ ও বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত বৈঠকখানা উজ্জ্বল করিয়া একজন রাজপুত্রের ন্যায় যুবাপুরুষ বসিয়া আছেন, তখন তাঁহার আশ্চর্য্যের পরিসীমা থাকিল না। একবার মনে করিলেন "এ ব্যক্তি বৈষ্ণব না হইতে পারে।" পরে যখন মুকুন্দদত্ত এই "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়" বলিয়া পরিচয় করিয়াদিলেন, তখন আর ব্যক্তিত্বের প্রতি সন্দেহ থাকিল না; কিন্তু মনে করিলেন, তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সে জন্য মুকুন্দ বুঝি তাঁহার সঙ্গে রহস্য করিয়াছেন। গদাধর বিদ্যানিধির সজ্জা আসবাবের এইরূপ পারিপাট্য দেখিলেন:—পিত্তলে মণ্ডিত ও নানা বর্ণে চিত্রিত এক দিব্য খট্টায় বিচিত্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে; বহুমূল্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট বস্ত্রের সুন্দর শয্যা তাহাতে বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহার চারি পাশে শোভন বস্ত্রাচ্ছাদিত কতকগুলি বালিশ সজ্জিত আছে; গুটীকয়েক ছোট বড় ঝাড়ি, দুইটী সুন্দর আলবাটী ও বাটাভরা পাকা [illegible] সাজান আছে। শয্যোপরে পরম সুন্দর এক যুবা পুরুষ রাজপুত্রের ন্যায় বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন; দুইজন পরিচারক তাঁহাকে ময়ূরপাখা বীজন করিতেছে। যুবকের কেশসংস্কারেরই বা কত পারিপাট্য? আমলকী ও সুগন্ধে অনুরঞ্জিত হইয়া সৌরভ বিস্তার

করিতেছে। সম্মুখে এক বিচিত্র সাহেবানা দোলা পড়িয়া আছে। পরিচরবর্গ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইনি কে?'

মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "এই গ্রামবাসী মাধবমিশ্র মহাশয়ের পুত্র, নাম শ্রীগদাধর; ইনি বালক কাল হইতে সংসারে বিরক্ত ও ভক্তিপথের পথিক। তোমার নাম শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।"

গদাধর নীরবে প্রণাম করিয়া বসিলেন, ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ভাল ত বৈষ্ণব দেখিতে আসিয়াছি? এ যে দেখ্‌ছি একজন ঘোর বিষয়ী; শুনিয়া ছিলাম বটে ইনি একজন পরমভক্ত, কিন্তু দেখ্‌ছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

মুকুন্দ দত্ত গদাধরের মনের ভাব কতক বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মুকুন্দ বড় সুগায়ক; ভাগবতের পূতনাবধাধ্যায়ে ছলনা-রূপিণী রাক্ষসী পূতনা কালকূট দিয়া কৃষ্ণের প্রাণ সংহার করিতে চাহিয়াও ভগবানের অপার করুণাগুণে মাতৃপদ লাভ করিয়া মুক্তা হইয়াছিল, ইত্যাদি যে শ্লোকে বর্ণিত আছে, তাহা সুমধুর স্বর সংযোগে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি ভক্তিযোগের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন; নয়নযুগল দিয়া আনন্দধারা বহিয়া যাইতে লাগিল; ক্রমে কম্প, স্বেদ, পুলক, হুঙ্কার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি মহাভাবের লক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল; এবং 'বোল! বোল!' করিতে করিতে বিদ্যানিধি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন; ও হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন। কোথাকার দ্রব্য সামগ্রী কোথায় গেল? লাথি ও আছাড়ের চোটে সব দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সে সুন্দর কেশ দাম ধূলায় লুটাইতে লাগিল; পরিধেয় বহুমূল্য বস্ত্র দুই হাতে ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, 'হায়! প্রাণকৃষ্ণ! আমাকে কেন কাষ্ঠপাষাণের ন্যায় নীরস করিলে? আমি কেন তব পদারবিন্দে বঞ্চিত হইলাম?'

কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া বিদ্যানিধি আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া গদাধর পণ্ডিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন ও বিদ্যা-

নিধির প্রতি মনে মনে যে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার জন্য কাতর ও অনুতপ্ত হৃদয়ে মুকুন্দকে বলিতে লাগিলেন :—'হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! এ হেন মহাশয়কে আমি অবজ্ঞা করিয়া কি মহাপাতক সঞ্চয় করিলাম? কি অশুভক্ষণে আমি ইঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম? বলিতে কি মুকুন্দ! তুমি না থাকিলে আজ্ ভক্তের নিকট অপরাধে আমার না জানি কি দুর্দ্দশা হইত? তুমি ভক্ত বিদ্যানিধির ভক্তির প্রকাশ দেখাইয়া যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিলে। আজি আমি কি পরম সঙ্কটই এড়াইলাম? ইঁহার বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া বিষয়ীবৈষ্ণব জ্ঞানে ইঁহার প্রতি আমার মনেমনে অবজ্ঞা হইয়াছিল; তুমি বুঝি আমার মনের ভাব টের পাইয়াছিলে? তাই ভক্ত পুণ্ডরীকের ভক্তিপুণ্ডরীক প্রকাশ করিয়া দিলে। ইঁহার ভক্তিদর্শনে ত্রিলোক পবিত্র হয়; এমন ভক্ত কি আর আছে?' এই বলিয়া গদাধর মুকুন্দকে জানাইলেন যে, "আমি উঁহার সম্বন্ধে যত খানি অপরাধ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমার এ পাপ যাইবে না। আমি এখনও দীক্ষিত হই নাই; বিদ্যানিধি কৃপা করিয়া যদি আমাকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন. তাহা হইলে আমি এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। কারণ শিষ্য হইলে তিনি অবশ্যই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

মুকুন্দ 'ভাল, ভাল' বলিয়া ঐ কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। এ দিকে প্রায় দুই প্রহর কাল পরে বিদ্যানিধি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন মুকুন্দ দত্ত গদাধর সম্বন্ধীয় কথা আদোপান্ত বিবৃত করিয়া গদাধরের মনোভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন। গদাধর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেলেন। বিদ্যানিধি হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে, এমন ভগবদ্ভক্ত আমার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেন।"

তখন গদাধর ও মুকুন্দ মহাহৃষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌরের সভায় আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন ও বিদ্যানিধির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গৌরচন্দ্র মহা আনন্দ লাভ করিলেন। এ দিকে বিদ্যানিধি মহাশয়ও রজনীযোগে একাকী অলক্ষিত রূপে শ্রীবাসমন্দিরে গৌরাঙ্গ সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন; ও গৌরের ভাবাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন শ্রবণ করিয়া মহাপ্রেমোন্মত্ততায় আত্মহারা হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন :—

"কৃষ্ণ রে জীবন! কৃষ্ণ রে মোর বাপ!
মুই অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ।
সর্ব্বজগতের বাপ! উদ্ধার করিলে;
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে।"

ভক্তগণ আগন্তুকের ঈদৃশ বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া চিনিতে না পারিয়া কিছু বিস্মিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে গৌরচন্দ্র বুঝিতে পারিয়া সম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও "পুণ্ডরীক বাপ! আজ তোমাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক হইল" বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তখন ভক্তগণ বুঝিলেন যে, ইনিই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। গৌরের মত ভক্তের প্রশংসা করিতে কেহ জানে না; তাই তিনি সর্ব্ব সমক্ষে দশমুখে বিদ্যানিধির গুণ বর্ণিতে লাগিলেন:—'আজি শ্রীকৃষ্ণ আমার সকল মনোরথ সিদ্ধ করিলেন; আজি শুভক্ষণে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পুণ্ডরীক দর্শন করিলাম। আজি আমার সকল মঙ্গল হইল। ইহার পদবী বিদ্যানিধি, কিন্তু বিধাতা প্রেমভক্তি বিলাইতে ইঁহাকে আনিয়াছেন। ইনি তো বিদ্যানিধি নন, সাক্ষাৎ প্রেমনিধি।'

বিদ্যানিধি উপাধিটী গৌরচন্দ্রের কাণে ভাল শুনায় নাই; যেন একটু পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব মাখান। তাই ঐ উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রেমনিধি বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সেই অবধি বিদ্যানিধি প্রেমনিধি বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া গেলেন। প্রেমনিধি মহাশয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রণাম করিবার অবসর পান নাই। এখন সমবেত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন; ও সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পাদবন্দনা করিয়া ক্রমে সকলের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। গদাধর এই অবসরে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা পাওয়ার প্রস্তাব করিয়া গৌরের অনুমতি চাহিলেন। গৌরচন্দ্র 'শীঘ্র শীঘ্র কর' বলিয়া মহাসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে গদাধর পণ্ডিত শ্রীপ্রেমনিধির স্থানে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শচীমাতার স্বপ্ন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিত্যানন্দের বাসা। নিতাই বাল্যভাবে বিভোর; এখন আর নিজ হাতে ভাত খান না। মালিনীদেবী শিশুর মত ভাত খাওয়াইয়া দেন। প্রতিবাসী বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়া নিতাইয়ের খেলা; নগরে নগরে ধূলা খেলা, গঙ্গাস্রোতে ডুব সাঁতার, চিৎসাঁতার প্রভৃতি নানা-বিধ জলক্রীড়া এবং ভাত খাওয়ার সময় অর্দ্ধেক অন্ন সমস্ত অঙ্গে মাখিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলান প্রভৃতি ক্রীড়ায় তিনি খুব মজবুত হইয়া উঠিলেন। থাকিয়া থাকিয়া নিতাই এক দৌড়ে বিশ্বম্ভরের বাড়ী যান, শচীমাতাকে মা বলিয়া ডাকেন, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস করেন, আর শচীমাতাকে দেখিলেই তাঁহার চরণ-ধূলি লইতে যান। উদাসীন সন্ন্যাসী চরণ স্পর্শ করিলে অপরাধ জন্মিবে ভয়ে শচীদেবী নিতাইকে দেখিলেই পলাইয়া যান; তথাপি নিতাইয়ের বাল্যসরলতায় শচীর মন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া গেল; এবং নিতাইকে আপন প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানে ভালবাসিতে লাগিলেন। এক দিন শচীদেবী বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ নিমাই! আমি গত রজনীতে বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি; তুমি আর নিত্যানন্দ যেন আমার দেবালয়ে প্রবেশ করিলে ও পাঁচবছরের ছেলে হইয়া সিংহাসনস্থিত কৃষ্ণবলরাম শ্রীবিগ্রহ লইয়া বাহির হইয়া এলে। তোমার হাতে বলরাম ও নিতাইয়ের হাতে কৃষ্ণ। তাহার পর চারি জনে যেন মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাদের দুই জনকে তিরস্কার করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন; 'হাঁরে! তোরা দুই চাঙ্গাত্ কে রে"? এ বাড়ী ঘর, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশাদি উপকরণ সব আমাদের; তোরা দূর হ।' নিত্যানন্দ যেন ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিলেন 'সে কাল আর নাই, যখন ছানা মাখন লুঠিয়া খেয়েছিলে; গোয়ালার অধিকার চলিয়া গিয়াছে, এখন ব্রাহ্মণের অধিকার। তাই বলি এ সব ছেড়ে এখন চম্পট দাও। যদি সহজে না ছাড়, ঠেঙ্গাইয়া দোরস্ত করিয়া দিব; ও জোর করিয়া কাড়িয়া খাইব।' তাহাতে রামকৃষ্ণ যেন আরও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন "কৃষ্ণের দোহাই! তোদের দুজনকে আজ মারিয়া তাড়াইয়া দিব।" নিতাই পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন:—"তোর কৃষ্ণকে কে ভয় করে?

বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র আমার প্রভু।" ইহার পর যেন তোমাদের চারি জনের মধ্যে মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল।

"কাহারও হাতের কেহ কাড়ি লই যায়;
কাহারও মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়।"

আর নিত্যানন্দ যেন আমাকে বলিলেন "মা! বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমাকে অন্ন দাও।" এই বলিয়া সরলহৃদয়া শচী পুত্রকে বলিলেন,—"বৎস! এ স্বপ্নের অভিপ্রায় কি? আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তুমি আমাকে উহা বুঝাইয়া দাও।"

বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মা! আমার বোধ হইতেছে আপনি খুব সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন; ইহা আর কাহাকেও বলিবেন না। আমাদের বাড়ীর মূর্ত্তি বড় প্রত্যক্ষ দেবতা; আমিও অনেক সময়ে নৈবেদ্যাদি করিয়া রাখি ও পরক্ষণে আসিয়া দেখি তাহা আধা আধি হইয়া আছে। এত দিন মনে মনে ভাবিতাম, এ সব কি হয়?' এই বলিয়া রসিক চূড়ামণি বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া ও বধূর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'মা! সত্য সত্য এত দিন আমার তোমার বধূর উপর সন্দেহ ছিল; আজ তাহা দূর হইল।' বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু অন্তরে ছিলেন; স্বামীর ভালবাসা মাখান পরিহাস শুনিয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কোন্ স্ত্রীই বা না হয়?

নিমাই! আমরা জানিতাম তুমি গার্হস্থ্য প্রেম জান না, কেবল বিভু-প্রেমে ভোর। আজ্ আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। অথবা যাঁহার প্রাণে হরিপ্রেম পরিপূর্ণ; তিনি দাম্পত্যপ্রেম জানেন না? এ তো হইতে পারে না। হরিপ্রেম তো আর একাঙ্গ নয়, উহা যে পূর্ণাঙ্গ। গার্হস্থ্যপ্রেম বল, দাম্পত্যপ্রেম বল, সকলই সেই বিশ্বপ্রেমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা। যাহা হউক, বিশ্বম্ভর জননীকে বলিলেন,—'মা! নিতাই স্বপ্নে তোমার নিকট অন্নভিক্ষা করিয়াছেন; আমার বিবেচনায় তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বপ্ন সফল করা উচিত।' শচীমাতা পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বলিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর মহাহৃষ্ট চিত্তে শ্রীবাসের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনে বসিয়া ভাত ছড়ান নিতাইয়ের রোগ; বিশ্বম্ভর তাহা জানিতেন। সুতরাং নিতাইকে সতর্ক করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ মহাবিজ্ঞের ন্যায় কর্ণে হস্ত দিয়া "বিষ্ণু, বিষ্ণু"

বলিয়া উত্তর করিলেন "আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াইব? তুমি বুঝি আমাকে আপনার ন্যায় চঞ্চল মনে কর।"

গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রভৃতি আত্মীয়গণ লইয়া নিজগৃহে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। গৌরের নিষেধ সত্ত্বেও নিতাই থাকিয়া থাকিয়া নিজপাতের উচ্ছিষ্ট লইয়া বালকের ন্যায় চারিদিকে ছুড়িতেছেন ও বন্ধুগণ মানা করিলে কত মত রঙ্গভঙ্গি করিতেছেন! শচীদেবী রন্ধনশালা হইতে একবার অন্ন দিতে আসিয়া হঠাৎ পংক্তির দিকে তাকাইয়া দেখিয়া অন্নের থালি ফেলাইয়া দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হস্তস্থিত অন্ন চারিদিকে ছড়াইয়া গেল; ভোক্তাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। বিশ্বম্ভর আস্তেব্যস্তে উচ্ছিষ্ট হাত ধুইয়া জননীকে তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও শচীদেবী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; 'মা! উঠ, আচম্বিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন কেন?

শচীদেবী চেতনা লাভ করিয়া অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না; গৃহমধ্যে গিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন,—"বাছা! আমি ভাত দিব মনে করিয়া ভোজন স্থানে আসিয়া দেখি যেন তুমি কৃষ্ণবর্ণ ও নিতাই শুক্লবর্ণ দুইটী পঞ্চমবর্ষীয় বালক চতুর্ভুজ হইয়া ভোজন করিতেছ; উভয়েই দিগম্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল, মুষলধারী। আর আমার বউ যেন বাপ তোর হৃদয়ে শোভা পাইতেছেন। নিমাই! বল দেখি কেন আমি এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম?"

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন 'মা! রাত্রির সেই স্বপ্নের ভাব মনে ছিল। তাই ঐরূপ বোধ হইয়াছে। ও কিছু নয়।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাকীর্ত্তন—পাষণ্ডীদিগের আচরণ।

এক দিন সম্মিলিত বৈষ্ণবসভায় গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন 'ভ্রাতৃগণ! এক কথা বলি শুন; আমরা তো দিবাভাগে হরিনাম করিয়া থাকি;

নিশাভাগটা আমাদের কেন বৃথা অপব্যয় হয়। আজ হইতে সকলে এই নির্ব্বন্ধ কর য রজনীতে আমরা পরম মঙ্গল হরি সংকীর্ত্তন করিয়া ভক্তি-রূপিণী গঙ্গায় মাজ্জন করিব এই মন্ত্র সার কর।

এই কথা শুনিয়া ভক্ত দল মহানন্দ ও উৎসাহ সহকারে নিশাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এত দিন কেবল শ্রীবাসের গৃহেই কীর্ত্তন হইত, এখন হইতে অন্য অন্য স্থানেও হইতে লাগিল। কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে, কোন দিন বা বিশ্বম্ভরের বহির্বাটীতে হইত; কিন্তু শ্রীবাস-মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান স্থান রহিয়া গেল।

এখন হইতে কীর্ত্তনের প্রকৃতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। এত দিন সকলে মিলিয়া একত্রে কীর্ত্তন হইত। এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অথবা এক সময়ে এক বাড়ীতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল; শ্রীবাস পণ্ডিতের একদল, মুকুন্দ দত্তের দ্বিতীয়, গোবিন্দ দত্তের তৃতীয়, এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ দল গঠিত হইতে লাগিল। একাদশী রজনীর হরিবাসরে কিছু অধিক ধূম হইত।

. কীর্ত্তনের পদগুলিও এখন হইতে কিছু লম্বা লম্বা হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ চল্লিশপদী কীর্ত্তনের উৎপত্তি এই সময়ে। আর নৃত্যের ভাগটাও কিছু অধিক মাত্রায় চড়িয়া গেল। এই সময়ের সংকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, গাম্ভীর্য্য, মত্ততা ও মাধুর্য্যে এতই জমাট বাঁধিয়া যাইত যে, বাহিরের লোকেরও তাহাতে গভীর ভাবাবেশ না হইয়া পারিত না। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এসময়ের কীর্ত্তনের বর্ণনা লিখিতে লিখিতে এতই আবিষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি আক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, "পাপ জন্ম হইলত, কেন সেই সময়ে হইল না। তাহা হইলে তো সংকীর্ত্তনানন্দে পাপ ধুইয়া যাইত।" এই রূপ নিশাকীর্ত্তন একবৎসর কাল হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে নৃত্যের ভাগটা কিছু অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল। গৌরকে নাচাইবার উদ্দেশে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নিজেও কম নয়; কতকগুলি তৃণ দিয়া আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া বিকটবেশে যখন কটী দোলাইয়া নাচিতেন, তাহা দেখিয়া ভক্তগণে হাসি সম্বরণ করিতে পারিত না।

গৌরের নৃত্য, কীর্ত্তন, ভাব, আনন্দ সকলই অদ্ভুত। পাঠকমহাশয় জানেন যে, তাঁহার হৃদয় ভাবময়; উহাতে যখন যে ভাব জাগরূক হইত;

তাহার অবধি না হইয়া যাইত না। নর্ত্তনাবেশে বিবিধ ভাবলহরী প্রকটিত হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কখন কখন বন্ধুগণের স্কন্ধে উঠিয়া তিনি অঙ্গনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কখন বা বালকের ন্যায় চঞ্চলতা প্রকাশ করেন; পা নাচাইতে নাচাইতে কখন খল খল করিয়া হাসিতে থাকেন, কখন বা ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া কতমত রঙ্গভঙ্গ করেন; আবার কখন বন্ধুদিগের চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। এমন আশ্চর্য্য ভাবাবেশ কেহ কখন দেখে নাই। আধ্যাত্মিক রাজ্যে কত নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা কে জানে? স্থূলজগতে বাস করিয়া স্থূলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে আমরা সূক্ষ্ম জগতের ভাব কেমন করিয়া বুঝিব? সে রাজ্যে না গেলে কে তাহার সম্বাদ আনিতে পারে? এখানে মানবের দর্শনশাস্ত্র পরাস্ত; পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যারও ক্ষমতায় কুলায় না। প্রেমবিজ্ঞান সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; প্রেমিক না হইলে প্রেমতত্ত্বের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কে জানে কি কারণে ক্ষণে ক্ষণে গৌরের দেহ তুলার ন্যায় লঘু, আবার কখন লৌহাপেক্ষাও গুরু হইত? এমন শীত ও কম্পন হইত যে, যেন বিকারের কম্প। আবার কখন সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তাপযুক্ত, চন্দনপঙ্ক লেপিলে তখনই শুকাইয়া যায়। কখন আবার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে, যেন মহাশ্বাস রোগ জন্মিয়াছে। কখন কখন এমন হিক্কা হইত, যে তাহাতে সর্ব্ব অঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। কখন সুন্দর গৌরবর্ণ নানারূপ রঙ্গ ধারণ করিত এবং কখন কখন তিনি দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া চারিদিকে ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং বন্ধুদিগের প্রতি অযোগ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেন। আবার তিনি পূর্ব্বে যাহাকে সম্মান করিয়া প্রভু বলিতেন, এখন 'এ বেটা আমার দাস' বলিয়া তাহার চুলে ধরিতে লাগিলেন; পূর্ব্বে যাহার চরণবন্দনা করিতেন, এখন তাহার বুকে পা দিয়া নাচেন। কখন নিত্যানন্দের অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসিয়া পা তুলিয়া আর সকলের দিকে তাকাইয়া হাসেন; ভাবাবেশে একবার যাহার চরণে ধরেন, আবার তাহার মাথায় উঠেন; এই যাহার গলা ধরিয়া কাঁদেন, তখনই তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বসেন; আবার কখন বা চক্রাকারে ঘুরিয়া নাচেন, নিজ শির যাইয়া চরণ স্পর্শ করে।

বহির্মুখ লোকে ইহাকে পাগলামি ভিন্ন আর কি বলিবে? কিন্তু এমন পাগল হওয়া তো সহজ নয়।

এই সময়ে এক দিন এক শৈব ভিক্ষুক বিশ্বম্ভরের বাটীতে ভিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিল। ভিক্ষুকের সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, শিরে জটাজূট ও হাতে শিঙ্গা ডমরু; উহা বাজাইয়া সে শিবসঙ্গীত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। শঙ্করগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বিশ্বম্ভরের ভাবময় হৃদয় ভাবে উথলিয়া উঠিল; শঙ্করভাবাবেশে হুঙ্কার করিয়া 'আমি শিব' বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ এক লম্ফে আগন্তুকের স্কন্ধে উঠিলেন। সে ব্যক্তিও তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভক্তগণ নাকি সেই সময়ে গৌরকে সত্য সত্য জটাজূটধারী শম্ভূমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে শচীনন্দন বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার স্কন্ধ হইতে নামিলেন এবং নিজ হাতে ভিক্ষুককে যথেষ্ঠ ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলেন।

পাষণ্ডীদিগের আচরণ।

নিশাকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, প্রমত্ততা ও ভাবুকতায় নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল। গভীর রজনী যোগে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বহিঃপ্রকোষ্ঠে খুব মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইতেছে; বিশ্বাসী ভক্তগণের ব্যাকুলতা, প্রেমানুরাগ, ও উল্লাসময় কীর্ত্তনের ধ্বনিতে লোকসকল আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে পণ্ডিতের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইতেছে; কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে; কিন্তু কীর্ত্তনের একটু জমাট বাঁধিয়া গেলেই গৌরের আদেশে কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল, আর কেহ প্রবেশ করিতে পাইল না। লোকগুলি অগত্যা বাহিরে থাকিয়া কপাট ঠেলিতেছে; কলরব করিতেছে; কত নিন্দা কুৎসা করিতেছে ও কেহ কেহ নানা প্রকারে উৎপাত করিতেছে। এই সকল লোকের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছে। কতক লোক বাস্তবিক সরল প্রাণে তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য আসিয়াছে; কতকগুলি আপনাদের কৌতুহল স্পৃহা চরিতার্থের জন্য, আর কতকগুলি সংকীর্ত্তনবিদ্বেষী লোক কেবল ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উৎপাত করিবার উদ্দেশে আসিয়াছে। নমুনা স্বরূপ তাহাদের দুই চারিটী উক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে। একজন বলিল 'আরে ভাই! আমি শুনিয়াছি কীর্ত্তনচ্ছলে মদ খাইয়া এগুলা গোলমাল করে'। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "আর শুননি? ইহারা পঞ্চ কন্যা

আনিয়া ভক্ষ্য, পেয়,গন্ধ, মাল্য লইয়া তাহাদের সঙ্গে বিবিধ রূপ রঙ্গ করে'।

তৃতীয় জন বলিল 'জাত নাশারা সকল জাতি একত্র হইয়া বেশ্যা সহ মদ্য ও অখাদ্য খাইয়া জাতিধর্ম্ম নাশ করিতেছে'।

পাষণ্ডীদিগের উক্তিতে নিমাইয়ের উপর তত কোপ দেখা যায় না, যত তাঁহার সঙ্গীদিগের উপর। তাহারা মনে করিত, নিমাই পণ্ডিত খুব ভাল লোক ছিল, কেবল কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দ হইয়া গেল। একে একটু বায়ুরোগ-গ্রস্ত, তাহাতে আবার অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছে; সুতরাং পাঁচজন ঢঙ্গের দলে পড়িয়া মন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? পাষণ্ডীগণ! তোমরা লোক চিনিতে পার নাই। যত নষ্টের ওস্তাদ ঐ নিমাই। সাবধান ও বড় সহজ পাগল নয়। ওই তো দলশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া তুলিল।

ক্রমে ক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, নিমাই পণ্ডিত বিদ্যেসাধ্যি ভুলে গিয়ে গণ্ড মূর্খের দলে পড়ে এখন একজন মহা গণ্ডমূর্খ হইয়াছে। আগন্তুকদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, সংকীর্ত্তন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ; দেশমধ্যে যত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হই-তেছে, সে সব উহারই জন্য। একজন বলিয়া উঠিল 'কালি দিয়ানে গিয়া সিকদার আনিয়া উহাদের কাঁকালি ধরিয়া জনে জনে বাঁধিয়া দিব'।

কোন কোন পাষণ্ডী সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল. "ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এগুলা নাচিতেছে গাই-তেছে, ইহাদের মুখদর্শনে পাপ হয়। শরীরমধ্যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, আত্মসাক্ষাৎকার লাভই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; তাহা না করিয়া বল দেখি চীৎকার করিলে কি হইবে?" দ্বিতীয় পাষণ্ডী উত্তর করিল, 'তাইতো! নাচিলে গাইলে যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এই নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল রহিয়াছেন, তাঁহারা কি আর তাহা করিতেন না?'

আর একজন বলিল, আরে ভাই! দেখিতেছো না, নিমাইকে লইয়া এ গুলা পাগল হইয়াছে; পাগলের কথায় আমাদের কাজ কি?

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আরে! আমরা কি আর সংকীর্ত্তন শুনিতে আসি? পাগলগুলা কি করে; তাই দেখিতে ও ঠাট্টা করিতে আসি।

উহাদের মধ্যে দুই একজন সুবুদ্ধি ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "কেন ভাই! পরনিন্দা করিতেছ? যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের নাম করিতেছেন; তাঁহারা পরম সুকৃতী,

তাঁহাদের নিন্দা করিলে পাপ হইবে। আমাদের কপালে নাই, তাই এমন মধুর কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিলাম না"।

পাষণ্ডীদিগের মধ্যে যাহারা বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির লোক ও কীর্ত্তন বিদ্বেষী; তাহারা শেষোক্তদিগের কথা শুনিয়া "ইহারাও তবে ঐ দলের লোক" এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

বিদ্বেষীদিগের বিদ্বেষের ও ক্রোধের প্রধানপাত্র শ্রীবাসপণ্ডিত। তাঁহাকে তাহারা থানিয়াতি অর্থাৎ আড্ডাধারী শ্রীবাসা, বাম্না, ঢাঙ্গাইত, প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিত। তাহাদিগের মতে তাঁহা হইতেই নবদ্বীপের কুশল নষ্ট হইল ও সকল লোক খারাপ হইয়া গেল; সুতরাং স্বতঃ পরতঃ তাঁহার নিন্দা কুৎসা ও অনিষ্ট করিতে ছাড়িত না।

পাষণ্ডীদিগের উৎপাতের একটী আখ্যায়িকা আছে। গোপাল চক্রবর্ত্তী ওরফে চাঁপাল গোপাল নামে তখন একজন ষণ্ডা গোছের বামুন নবদ্বীপে বাস করিত। গভীরনিশায় ভক্তদল শ্রীবাসমন্দিরে আবিষ্টচিত্তে সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত আছেন; এমন সময়ে সে ব্যক্তি অন্য অন্য পাষণ্ডীদিগের পরামর্শানুসারে লুক্কায়িত ভাবে অঙ্গনে যাইয়া অঙ্গনের মধ্যস্থান লেপিয়া ভবানী পূজার দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া দিল; কদলী পত্রের উপর জবাফুল, সিন্দূর রক্তচন্দন ও মদ্যভাণ্ড সাজাইয়া রাখিল। উদ্দেশ্য এই, লোকে জানুক যে, সংকীর্ত্তনের ভাণ করিয়া ইহারা রাত্রি যোগে পঞ্চকন্যা আনিয়া মদ্যপান করিয়া কি কুৎসিৎ কাণ্ড করিয়া থাকে? পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, ভক্তগণের উপর পাষণ্ডীগণ যে যে দোষারোপ করিতেছিল, তাহার মধ্যে রাত্রিতে বেশ্যা লইয়া মদ্যপান করা একটী প্রধান। তাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় করা হইল।

প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত বহিঃপ্রাঙ্গণে ঐ সব বস্তু দেখিয়া গ্রামের বিজ্ঞ ও সুবোধ লোকদিগকে ডাকিয়া দেখাইলেন ও পরিহাস করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন 'মহাশয়গণ! দেখুন্ রজনীযোগে আমি কি সাধনা করিয়া থাকি?' উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শ্রীবাসকে উত্তমরূপে জানিতেন; সুতরাং পাষণ্ডীদিগের কার্য্য বুঝিতে তাঁহাদের বাকী থাকিল না। দুই চারি দিন মধ্যেই চাঁপাল গোপালকে ঐ কার্য্যের নায়ক বলিয়া সকলে জানিতে পারিলেন। কথিত আছে যে, অল্প দিন মধ্যে চাঁপাল গোপাল নিজ কার্য্যের সমুচিত দণ্ড স্বরূপ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইল।

এক সরল জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ আর এক রজনীতে কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া বর্হিদ্বার বদ্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। পর দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইয়া সে বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ নিমাই! আমি কাল রাত্রিতে তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি; ইহাতে আমার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছে।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল যে, "আমাকে যেমন তুমি মনঃপীড়া দিয়াছ; আমি শাপ দিতেছি, তুমিও তেমনি সংসারে সুখী হইতে পারিবে না।"

শাপ শুনিয়া বিশ্বম্ভরের উল্লাসের সীমা নাই। তিনি মনে মনে করিতে লাগিলেন 'আমি ঐরূপ শাপই চাই;' ও বাহিরে একটু হাসিয়া ব্রাহ্মণকে শান্তনা করিয়া ভক্তদলের নিকট আসিয়া অভিশাপ বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রকাশ।

পরমাত্মা অপরিসীম চিচ্ছরূপ; জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্রাংশ চিৎকণ। অপরিমিত বৃহৎ চিদ্বস্তুর সহিত জীবরূপী ক্ষুদ্র চিৎকণ নিত্যযোগে যুক্ত; কিছুতেই উভয়ের সম্বন্ধ বিযুক্ত করিতে পারা যায় না। একটী অনন্ত, মহান্, অপরিবর্ত্তনীয়, গভীর চিদ্ঘন; অপরটী ক্ষুদ্র, বদ্ধ, যৎসামান্য চিদংশ। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রকৃতিগত যথার্থ স্বত্বা এক হইলেও জীবের ঔপাধিক ব্যবহার ক্রিয়ার এত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে আর পরমাত্মার সহিত এক প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। আবার জীবাত্মার প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য ভেদভাব রহিয়াছে, যাহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ জীবগোস্বামী মহাশয় ইহাকে "অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞানেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মূল নিহিত রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ভ্রমর বা মৌমাছি মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পুষ্পান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে; হঠাৎ সুন্দর একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প দেখিতে পাইয়া তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি

উপবিষ্ট হইল এবং এদিক ওদিক বেড়াইয়া তাহার পাপড়িগুলি ভেদ করিয়া ভিতরের মধুভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইয়া মধুপানে বিভোর হইয়া পড়িল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমরটী স্থির ভাবে মধুপান করিতে পারে নাই; ততক্ষণ সে আপনাকে গোলাপ-স্থিত মধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করিতেছিল। কিন্তু যখন সে মধুকোষের মধ্যে যাইয়া নিমগ্ন হইয়া নীরবে মধুপান করিতে লাগিল, তখন তাহার নিকট কি বাহ্য জগৎ? আর কি সেই মধুভাণ্ডার? ইহার কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না; সে তখন সকলই মধুময় বলিয়া জানিতে থাকে; অথচ আত্মবোধের ও মধুবোধের এক অচিন্তনীয় ভেদজ্ঞানও বুঝিতে পারে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। জীব স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিলে এইরূপ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সাধকের প্রাণের মধ্যে যখন সেই রসস্বরূপের অমৃতরস-পানের জন্য সুপ্রবল তৃষ্ণার সঞ্চার হয়; তখন সে ব্যাকুল ভাবে সেই নিত্যসুন্দর পরমকুসুমের অনুসন্ধান করিতে থাকে; এবং যখন সৌভাগ্যক্রমে তাহা লব্ধ হয়; তখন আর জগতে দ্বৈতজ্ঞান বা স্থূলভেদ জ্ঞান থাকে না; সকলই তন্ময় হইয়া যায়, এবং সাধক সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল 'ত্বংহি' 'ত্বংহি' দেখিতে থাকে। এমন কি আপনি পর্য্যন্তও তখন 'ত্বংহি' হইয়া যায়। হইবারই তো কথা। জীব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, ইহাই জানিতে পারিবে। জীবের মূলে কোন্ শক্তি? কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাহা কি? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। পৃথিবীর কুটিলপথের বিভিন্ন দিকে দুইটী নরনারীর আত্মা ছুটিতেছিল; ইচ্ছারূপিণীর ইচ্ছায় তাহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎকার হইল। সেই ইচ্ছা আবার উভয়ের হৃদয়ে অনুরাগ রূপে পরিণত হইল। সেই পবিত্র ইচ্ছাই আবার পিতৃতেজে, মাতৃশোণিতে কার্য্য করিয়া ভ্রূণরূপে পরিণত হইল। তাহাই অবলম্বন করিয়া 'আমির' উৎপত্তি হইল। এই "আমি" তেই আবার কতকগুলি শক্তি সমাবেশ হইল। কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় "আমির" সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইল। আমি যদি আমার স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকে কার্য্য করিতে দিতে পারিতাম, অর্থাৎ আমার শক্তিপরিচালনের ক্ষমতা পাইবার পূর্ব্বে সেই মহতী ইচ্ছা যেরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপে করিতে দিতে পারিতাম, আমার কর্ত্তৃত্ববোধ বা অহঙ্কার দ্বারা বাধা না জন্মাইতাম, তাহা হইলে আমার স্বরূপবোধের অভাব হইয়া বিড়ম্বনা

হইত না; এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব দেখা আমার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু আমি কি করিয়াছি? আমার কতকগুলি পার্থিব সুবিধার জন্য নিজের অহঙ্কারকে পরিচালনা করিয়া একটী কল্পিত মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি; নিজের সুখদুঃখ লইয়া অজ্ঞানভাবে সেই জগতে বাস করিতেছি। কাজেই আমার স্বরূপ বুঝিবার উপায় নাই। 'আমি' তো আর সেই আমার মূলাধারা কুলকুণ্ডলিনীর জগতে বাস করি না; আমার কল্পিত জগৎই আমার সর্ব্বস্ব। শাস্ত্রকারেরা এই কল্পিত মিথ্যা জগৎকেই, মায়া, অবিদ্যা বা সংসার নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথাটী সুস্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। গুটীপোকা আপন মুখ-বিনির্গত লালা দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আপনিই জড়বৎ আবদ্ধ হইয়া পড়ে; দৈবশক্তিতে আবার তাহা কাটিয়া সুন্দর প্রজাপতির আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রমুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। জীবও সেইরূপ বাসনাপরিচালিত হইয়া স্বকল্পিত সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া আপন স্বরূপভাব বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু যখন ভগবৎকৃপায় সৎসঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ঘটনা হয়, তখনই সে ঐ পিঞ্জর কাটিয়া আপন স্বরূপাবস্থা লাভ করতঃ প্রমুক্ত চিদাকাশে উড়িয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। এই স্বরূপা-বস্থা লাভ হইলে সকলই ব্রহ্মময় দর্শন হয় এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত বা অভিন্নতা উপলব্ধি হয়। সাধকের সাধনার গভীরতা ও ঘনীভূততার পরিমাণ অনুসারে এই ভাব অল্পকাল, বহুকাল বা চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, শুকাদির এই ভাব জীবনব্যাপী ছিল; ঈশা, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণে তটস্থ ভাবে থাকিত, অন্যান্য সাধকে অল্পকাল মাত্র থাকিয়া অন্তর্হিত হয় এবং অস্মদাদিতে ইহার উদ্রেকই হয় না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের 'মামেব শরণং ব্রজ' প্রভৃতি উক্তি; বাইবেলে 'I and my father are one' এবং চরিতামৃতে 'আমি সেই' 'আমি সেই' প্রভৃতি কথা এই একই ভাবসম্ভূত।

গৌরের মহাপ্রকাশ বুঝিবার উদ্দেশে আমরা এত কথা বলিলাম। এই তত্ত্ব না বুঝাতেই ধর্ম্মজগতে অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তিতা, মহাপুরুষবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধীভাব সকল প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং পাইতেছে। গৌরের মহাপ্রকাশ হইতেই তদীয় ভক্তগণ তাঁহার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'মহাপ্রকাশ' অর্থে যে দিন গৌরচন্দ্র মহাভাবে বিভোর

হইয়া জীবাত্মার স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাকে ‘সাত-প্রহরিয়া’ ভাবও বলে; অর্থাৎ ঐ দিন তিনি বেলা এক প্রহরের সময় হইতে সমস্ত দিন ও সমস্ত রজনী ভগবদ্ভাবে নিমগ্ন ছিলেন এবং ঐ অবস্থায় আপনাকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন ভাবিয়া নানা অবতারভাব প্রদর্শন করতঃ ভক্তমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

মহাপ্রকাশের কথা বলিবার পূর্ব্বে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই একটী চমৎকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও সময়ে সময়ে মহাভাবে বিভোর হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া ভগবদুক্তিতে কত ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পাছে তদীয় শিষ্যগণের বা অপরের তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মে; সেজন্য বহু সময়ে তাঁহারা বাক্যে, উপদেশে, ব্যবহারে ও জীবনে আপনাদের মানবভাব দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। অন্য মহাপুরুষদিগের কথা এখানে বলিব না। গৌরের সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ করিবার উপায় নাই। এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না যে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; বা এমন সকল কথা বলিয়াছেন, যাহা দ্ব্যর্থ বা অস্পষ্টার্থ। আপনার মানবত্ব বিষয়ে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে সে সকল উক্তির অনেক কথা বলা গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রাতঃকালে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসের আলয়ে উপবিষ্ট; ভক্তমণ্ডলী অল্পে অল্পে আসিয়া উপনীত হইল। গৌরের ইঙ্গিতে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অন্য দিনের ন্যায় গৌরচন্দ্র দাস্যভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইয়া ক্রমে পূর্ণ মাত্রায় ঐশ্বর্য্যময় মহাভাবে পরিণত হইল। অন্য দিন নাচিতে নাচিতে ঈশ্বরভাবে বিভোর হইয়া, তিনি বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিতেন এবং ক্ষণকাল পরে ভাব অপগত হইলে যেন না জানিয়া বসিয়াছিলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া অপ্রতিভ হইতেন। আজ আর ক্ষণকালের কথা নহে, সাত প্রহরের জন্য গৌরহরি নরহরি ভাবে মগ্ন হইয়া বিষ্ণুখট্টা অধিকার করিয়া বসিলেন। পাঠক মহাশয় আকাশের চাঁদে গ্রহণ লাগা দেখিয়াছেন; প্রথম রাহুস্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত গ্রহণের স্থিতি এক প্রহর দশ দণ্ডের অধিক প্রায়ই দেখা যায় না; কিন্তু আজ গৌরচন্দ্রের

হৃদয়াকাশে যে গ্রহণ লাগিল, তাহার স্থিতি সাত প্রহর। আকাশের চাঁদের গ্রহণে রাহুশক্তি চন্দ্রস্পর্শ করে; এখানে হরিশক্তি গৌরচন্দ্রকে গ্রাস করিল। খাটের উপরে বসিয়া গৌরের আদেশ হইল 'আমার অভিষেক গীত গাও।' ভক্তগণ অমনি অভিষেক সঙ্গীত গায়িতে লাগিলেন, আর বিশ্বম্ভর মাথা ঢুলাইতে লাগিলেন। ভক্তমণ্ডলী মনে করিলেন যে, গৌরের জলাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তখন একশত আট কলস গঙ্গাজল আনাইয়া তাহাতে চন্দন, কর্পূর ও চতুঃসোম সংপৃক্ত করিয়া বৈদিক স্নানের পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তদীয় মস্তকোপরি ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের যে সকল দাস দাসীগণ গঙ্গার ঘাট হইতে জল বহিয়া আনিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুঃখী নামে একটী স্ত্রীলোক ছিল। সুরসিক গৌরচন্দ্র তাহার ভক্তিভাবে জল আনা দেখিয়া তাহার নাম বদলাইয়া "সুখী" নাম রাখিলেন।

স্নানান্তে ভক্তদল অঙ্গ সংস্কার ও গৌরদেহে চন্দন মাল্য পরাইয়া ও পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া বিষ্ণুখট্টা সজ্জিত করতঃ তদুপরি উপবেশন করাইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার শিরোপরি ছত্র ধরিলেন, কেহ চামর ঢুলাইতে লাগিল, এবং আর সকলে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল গৌরের চরণতলে রাশীকৃত পুষ্প, মালা, ধূপ, দীপ, চন্দন, কুঙ্কুম, আবির প্রভৃতি স্তূপাকারে সজ্জীকৃত হইয়াছে, চারিদিকে স্তবপাঠ হইতেছে ও শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একে মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ; আর কি রক্ষা আছে? একে ভক্তিমুগ্ধ ভক্তদল, তাতে আবার সে দিন গৌরের পক্ষ হইতে বাধা পড়িতেছে না। পড়িবেই বা কেমন করে? যে বাধা দিবে, সে তো আর তাহাতে নাই। কিন্তু ভক্তদল! তোমরা ইহার দ্বারা কি করিলে কিছু বুঝিতে পারিলে না; অবশ্য তোমাদের যাহা বিশ্বাস মনের আবেগে তাহা করিয়াছ, ইহাঁতে বাহিরের লোকের কথা কহিবার পথ নাই। কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ লোক তো আর ভিতরের কথা বুঝিবে না।

ভক্তগণ এইরূপ মহাধুমধামের সহিত গৌরাঙ্গপূজা করিতেছেন; কেহ ষোড়শোপচারে, কেহ পঞ্চোপচারে, কেহ কেহ নানা উপচারে পূজার আয়োজন করিতেছেন; ইহার মধ্যে বিভোর গৌরচন্দ্র দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া

বলিলেন 'কিছু দাও খাই।' অমনি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তিনি তাহা দিতে লাগিলেন। কেহ নারিকেল, রম্ভা প্রভৃতি ফল; কেহ দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ও নবনীত; কেহ সন্দেস, মিঠাই, ও পকান্ন প্রভৃতি, যাহা যাহার অভিলাষ, তাহা খাওয়াইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, গৌর সে দিনে না কি দুই শত লোকের আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ভোজনলীলা সাঙ্গ হইলে আর এক অদ্ভুত লীলা আরম্ভ হইল। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর এক এক জনকে ডাকিয়া আবিষ্ট গৌরচন্দ্র তাঁহার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত ও মনের গোপনীয় কথা বলিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন "কেমন হে পণ্ডিত! তোমার কি মনে পড়ে? যে দিন দেবানন্দের টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে; প্রেমরসময় ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া তুমি বিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে পড়িয়াছিলে; দেবানন্দের অজ্ঞ পড়ুয়াগণ বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করিয়া ধরাধরি করিয়া তোমাকে বাহির দুয়ারে টানিয়া ফেলিয়া দিলে; দেবানন্দ দেখিয়া শুনিয়াও কিছু বলিল না। তুমি মনে বড় দুঃখ পাইয়া নিজালয়ে আসিয়া ভাগবতের পাঠ চাহিতে লাগিলে; তখন আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ভাগবতের নিগূঢ় অর্থ বুঝাইয়া তোমাকে কাঁদাইয়াছিলাম কি না?" শ্রীবাস এই কথা হৃদয়ে অনুভব করিয়া কাঁদিয়া বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া বলিলেন "কি গঙ্গাদাস! সে রাত্রির কথা মনে নাই? রাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া তুমি সপরিবারে গঙ্গাপার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে; কিন্তু ঘাটে নৌকা না দেখিয়া যবনে পরিবার স্পর্শ করিবে ভয়ে তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলে; তখন খেয়ারীরূপে নৌকা আনিয়া তোমাকে কে পার করিয়াছিল, তা জান?"

অদ্বৈতাদি সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল। এইরূপে গৌরের ভাববিভোরতায় ভক্তগণের আনন্দ উৎসাহে, নৃত্য কীর্ত্তনে ও সেবার ব্যস্ততায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যাগমে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া ও ধূপ দীপ জ্বালিয়া ঘোর ঘটায় গৌরের আরতি হইল।

শ্রীধরের ভক্তিলাভ।

খোলা-বেচা শ্রীধরের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইনি এক জন দীন দরিদ্র, তরকারি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতেন। নবদ্বীপের প্রান্ত-ভাগে ইঁহার ভগ্ন কুটীর। ইনি একজন মহাশয় ব্যক্তি; দরিদ্র হইয়াও মহা সত্যবাদী। তাঁহার কাছে বিক্রিত দ্রব্যের এক ন্যায্য দর। সমস্ত দিন পরি-শ্রম করিয়া জীবিকা আহরণ করিতে হয়; সেজন্য দিবাভাগে সাধন ভজনের সময় পাইতেন না; সারা রজনী জাগিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। পাষণ্ডী-গণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া বলিত 'বেটা মহা চাষা; ভাতে পেট ভরে না; তাই সারা রাত্রি ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে চেঁচাইয়া মরে।'

পরমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র আদেশ করিলেন, "ভক্তগণ! শীঘ্র যাও, শ্রীধরকে ডাকিয়া আন। সে আসিয়া আমার আজ্‌কার প্রকাশ দেখুক।

আদেশ শ্রবণমাত্র দুই চারি জন ভক্ত ছুটিয়া শ্রীধরের পর্ণকুটীরে যাইয়া উপনীত হইল এবং গৌরের মহাপ্রকাশের কথা বলিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে লইয়া গৌরসন্নিধানে পৌঁছিল। শ্রীধরকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনে শ্রীধরের সঙ্গে যে কৌতুকাদি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন "শ্রীধর! বল তো আজ্‌ অষ্টসিদ্ধিকে তোমার দাসী করিয়া দি।" শ্রীধর এই কথা শুনিয়া গৌরের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। শ্রীধর বলিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে কোমল শ্যামল বংশীমোহন মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন; সম্মুখে লক্ষ্মীঃ যেন তাম্বূল দিতেছেন এবং পঞ্চমুখ, চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি দেবতাগণ স্তুতি করিতেছেন, অনন্ত মস্তকে ছত্র ধরিয়াছে. সনক নারদশুক প্রভৃতি গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। গৌরচন্দ্র শ্রীধরের গাত্রে হস্ত দিয়া মূর্চ্ছাপনয়ন করিয়া কহিলেন "শ্রীধর! তুমি আমার স্তব পাঠ কর।" শ্রীধর কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল চিত্তে বলিলেন "প্রভো! আমি মূর্খ, নীচ কুলোদ্ভব, আমি কি স্তব করিব?" এই বলিয়া শ্রীধর ভক্তিপূর্ণচিত্তে কত কথা বলিয়া ফেলিলেন; তাহাতেই এক অপূর্ব্ব স্তবমালা রচিত হইয়া গেল। মূর্খের মুখে এই সব অলৌকিক কথা শুনিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

বিশ্বম্ভর কহিলেন "শ্রীধর! বর লও; আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিতেছি।" শ্রীধর উত্তর করিলেন "আর আমাকে বৃথা ভাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছ কেন? এত দিন ভাড়াইয়াছ বটে; কিন্তু আর পারিবে না।"

বিশ্বম্ভর অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট; শ্রীধরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, "শ্রীধর! তোমাকে অবশ্যই বর লইতে হইবে।"

শ্রীধর উত্তর করিল 'যদি নিতান্তই বর লইতে হয়, তো এই বর দাও:—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত,
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল,
মোর প্রভু হউক তার চরণ যুগল।"

বলিতে বলিতে সরলমতি শ্রীধরের হৃদয় প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি দুই বাহু তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিয়া বলিলেন "শ্রীধর! বলতো এক মহা-রাজ্যে তোমাকে অধিপতি করিয়া দি।"

শ্রীধর প্রেমাবেগে বলিয়া উঠিলেন, "যাও আমি তোমার ও সব কথা কিছুই শুনিতে চাই না। আমার এই ইচ্ছা যে চিরজীবন তব গুণ গাইয়া বেড়াই।"

তখন গৌরচন্দ্র স্থিরগম্ভীর স্বরে সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন; "শ্রীধর! ধন্য তোমার দৃঢ় বিশ্বাস; কিছুতেই তোমার হৃদয় টলিল না। তুমিই ভক্তির উপযুক্ত অধিকারী; আজ তোমাকে আমি বেদের গোপ্য ভক্তিযোগ দান করিলাম।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী জয় জয় রবে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীধরের ভক্তিলাভ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস মহাশয় এইরূপে উপসংহার করিয়াছেনঃ—ধন জন পাণ্ডিত্য হীন চৈতন্যের মূর্খ ভৃত্যগণকে কে চিনিতে পারে? সে ধন মান যশে কি হইবে, যাহাতে অহঙ্কার বাড়ায়? কলা মূলা-বেচা শ্রীধর যাহা পাইল, কোটিকল্পে কোটীশ্বরেও তাহা পাইবে না।

মুরারি গুপ্তের প্রতি কৃপা।

বিশ্বম্ভর মহাবিভোর অবস্থায় মাথা ঢুলাইতেছেন, আর গদাধর পণ্ডিতের প্রদত্ত তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া 'নাড়া' 'নাড়া' বলিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কিছু বর চাই?" আচার্য্য বলি-লেন "না; যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি।" অদ্বৈতের সঙ্গে কথা

কহিতে কহিতে নাটকাভিনয়ের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় গৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রামচন্দ্রাবেশে মুরারি গুপ্তকে বলিলেন "গুপ্ত! একবার চাহিয়া দেখ দেখি?" মুরারি গৌরের দিকে তাকাইয়া দুর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপ, বামদিকে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও চারিদিকে বানরেন্দ্রগণ যেন স্তুতি করিতেছে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভর দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিলেনঃ—

"উঠ! উঠ! মুরারি আমার তুমি প্রাণ;
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান।"

মুরারি গুপ্ত চেতনা প্রাপ্ত হইলে গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহার নাম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "গুপ্তেতে হৃদয়ে মুরারি বাস করেন; এই জন্য উঁহার নাম মুরারি গুপ্ত।" আর গুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৈদ্য! বর লও।"

মুরারি বলিল 'প্রভু! এই বর দাও যেন চিরদিন তোমার পার্ষদ হইয়া থাকিতে পাই।'

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তথাস্তু।

হরিদাসের দর্শন।

এইবার হরিদাসের পালা। হরিদাস সকলের পশ্চাদ্ভাগে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হরিদাস! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা বড়, তোমার যে-জাতি আমারও সেই জাতি। যখন পাষণ্ড যবনগণ তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল; আমার প্রাণে তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল; আমি চক্রহস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে ও তাহাদিগকে দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম তাহারা তোমাকে মারিতেছে; অথচ তুমি তাহাদিগের কুশলকামনা করিয়া ভালবাসিতেছো, তখন আর তাহাদিগকে মারিতে পারিলাম না; কিন্তু তোমার পৃষ্ঠে যে প্রহার হইতেছিল, নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া লইলাম। আমার প্রকাশের কিছু বিলম্ব থাকিলেও তোমার এই ব্যাপারে তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্ত নির্যাতন সহ্য না করিলে আমার প্রকাশ হয় না; সুতরাং পাষণ্ডী নিস্তারের উপায়ও উদ্ভাবিত হয় না। হরিদাস! আমার নাড়াই তোমাকে যথার্থ চিনিয়াছে'।

বিশ্বম্ভরের ঈদৃশ করুণ বচন শ্রবণ করিয়া হরিদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে খেদ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাপ বিশ্বম্ভর! তুমি জগতের নাথ; আমি নীচকুলোদ্ভব অতি নীচ ও মহাপাতকী; আমাকে উদ্ধার করার ভার তোমার উপরেই আছে। তুমি বিপদ কালের বন্ধু! তোমার স্মরণে কি না হয়? পাপাসক্ত দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চাহিলে বিপন্না কুলকামিনী ব্যাকুল চিত্তে তোমাকে স্মরণ করিলেন; আর অনন্তরূপে তুমি বস্ত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলে। দুরন্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিপদ-সাগরে নিক্ষেপ করিলেও ভক্ত তোমার একমাত্র স্মরণপ্রভাবে হাসিতে হাসিতে নিষ্কৃতি পাইলেন। স্মরণ প্রভাবে অজামিল কি না পাইয়াছিল? আমি এমন দুর্লভ স্মরণে বিমুখ। তোমার প্রকাশ দেখার আমার অধিকার নাই।'

বিশ্বম্ভর।—তোমার যাহাতে অধিকার নাই; তাহাতে আর কাহারও অধিকার হইতে পারে না। হরিদাস! মনে যে অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর, পূর্ণ হইবে।

হরিদাস।—আমি পাপাসক্ত; আমার আর কোন বাঞ্ছা নাই, কেবল এই কর, যেন আমি ভক্তের উচ্ছিষ্ট খাইয়া ও দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারি।

বিশ্বম্ভর।—হরিদাস! বিনয় ছাড়; তোমার সঙ্গে যে মুহূর্ত্ত কাল বাস করিবে, সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমার শরীরে আমার নিত্য স্থিতি; এবং তোমার মত ভক্ত লইয়াই আমার ঠাকুরালি। আমি আজ এই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বৈকুণ্ঠের ভক্তিভাণ্ডার তোমারই।

অদ্বৈতের প্রতি।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের প্রতি পুনর্ব্বার কটাক্ষ করিয়া তাঁহার মনের কথা বলিতে লাগিলেন "আচার্য্য গোঁসাই! পূর্ব্বের কথা কি কিছু মনে হইতেছে? জগতে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যখন তুমি গীতা ও ভাগবত অধ্যয়ন করিতে; কোন শ্লোকের ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া যখন ব্যাকুলচিত্তে চিন্তায় নিযুক্ত হইতে ও যতক্ষণ সদর্থ ও সৎপাঠ আবি-

স্ফুত না হইত, ততক্ষণ অনাহারে উপবাসী থাকিতে; তখন কে তোমার প্রাণে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সত্য পাঠ ও ভক্তির অর্থ বুঝাইয়া দিত? তুমি তখন মনে করিতে বুঝি স্বপ্নে সিদ্ধিলাভ হইল।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যত শ্লোকে পূর্ব্বে আচার্য্যের দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল, সে গুলি নাকি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন ও পুনরায় বলিলেন "আচার্য্য! সকল পাঠই পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি; কিন্তু একটী বলি নাই; আজ তাহা বলিব; গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এই:—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"

"তাঁহার (ব্রহ্মের) হস্ত ও চরণ সর্ব্বত্র; তাঁহার চক্ষুঃ ও মুখ সর্ব্বত্র; এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

অদ্বৈতের চিরদিনের সন্দেহস্থল মীমাংসা হইল; মনের মধ্যে এক স্বর্গের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন:— 'আমি আর কি বলিব? আমার মহত্ব এই যে তুমি আমার প্রভু।'

ইহার পর বিশ্বম্ভর ভক্তদলকে সাধারণ ভাবে বলিলেন যে "যাহার যে অভিলাষ থাকে বর যাচ্ঞা কর; আমি পূর্ণ করিব।" তখন যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহা বলিতে লাগিলেন ও বিশ্বম্ভরও হাসিতে হাসিতে তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

মুকুন্দ দত্তের দণ্ড।

যে ঘরে এই সব রঙ্গ অভিনীত হইতেছিল, তাহার প্রকোষ্ঠান্তরে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত অধোবদনে আসীন। যাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে ভক্তদল মুগ্ধ হইতেন; যিনি কীর্ত্তন করিলে গৌরচন্দ্রের পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি মহাভাবের তরঙ্গ সকল উঠিয়া পড়িত; আজ মহাপ্রকাশের মহানন্দের দিনে সেই প্রিয় 'মুকুন্দ' কেন নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিষণ্ণচিত্তে উপবিষ্ট? এ কথার রহস্য গৌরচন্দ্র ভিন্ন কেহ জানে না। মুকুন্দ জানিতেন; কিন্তু বিনানুমতিতে তাঁহার প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। বিশ্বম্ভর একে একে সকলকেই ডাকিলেন অথচ মুকুন্দের নাম পর্য্যন্ত করিলেন না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সাহসে ভর করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

'প্রভু! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই; এ আনন্দের দিনে সকলেই আনন্দ করিতেছে; মুকুন্দ কেন বিষণ্ণহৃদয়ে প্রকোষ্ঠান্তরে বসিয়া আছে? মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলের প্রাণ; তাহার গানে কে না মোহিত হয়? তার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, দণ্ড দিয়া সংশোধন করিয়া লও; নিজ ভক্তকে পরিত্যাগ করা কি উচিত?' বিশ্বম্ভর ক্রোধভরে উত্তর করিলেন 'ও বেটার জন্য তোমরা কেহ কিছু বলিও না; উহাকে আমি সম্মুখে আসিতে দিব না। খড় লওয়া, জাঠি লওয়ার কথা কি পূর্ব্বে শুন নাই? এ বেটার প্রকৃতি সেইরূপ। ও একবার দন্তে তৃণ লয়, আবার জাঠি মারে। আমি ও খড় জেঠিয়াটাকে দেখিতে চাই না।'

শ্রীবাস পুনর্ব্বার কহিলেন "তোমার প্রহেলিকা কথা বুঝিতে পারিলাম না; আমরা তো মুকুন্দের কোন দোষ দেখিতেছি না।"

বিশ্বম্ভর। "তোমরা কি বুঝিবে? ও বেটা যখন যে মজ্‌লিসে যায়, তখন সেই মত কথা বলিয়া গোড়ে গোড় দেয়। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে থাকিয়া যখন সে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া দন্তে তৃণ করিয়া ভক্তিভাবে নাচিতে থাকে; আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সভায় অন্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া আমার হৃদয়ে জাঠি মারে। ও বেটা ভক্তিস্থানে ঘোর অপরাধী; সে জন্য তাহার দর্শন বাধ পড়িয়াছে।"

মুকুন্দ বাহির হইতে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া চিরকালের জন্য গৌরদর্শন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল ভাবিয়া অঝর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন; এবং শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পণ্ডিত! সত্য সত্যই আমি গুরুর অনুরোধে বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছি; ইহাতে সত্য সত্যই আমার ভক্তি স্থানে মহা অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধী প্রাণ রাখা যুক্তিযুক্ত নহে; অবশ্যই আমি এ শরীর ছাড়িব।" মুকুন্দের রোদনে ভক্তমণ্ডলী কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "আর কোটি জন্ম পরে মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে।"

এই কথা শুনিবা মাত্র বিশ্বাসী মুকুন্দ 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের বিশ্বাসভাব দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। তথাচ মুকুন্দের গৌরসম্মুখে আসিবার সাহস হইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিলে মুকুন্দ নির্ব্বেদ সহ-

স্বারে বিশ্বম্ভরচরণে লুটাইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন "মুকুন্দ! আর কাজ নাই, উঠ। তোমার দৃঢ়বিশ্বাস তিলার্দ্ধ মধ্যে আমার সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ করিয়াছে; আমার পরাজয়, তোমারই জয়। সঙ্গদোষে তোমার যে পাপ হইয়াছিল, আজ তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাহা দূরীভূত হইল। তুমি আমার পরিহাস পাত্র, পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিলাম, তাহাতে দুঃখ করিও না। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমার কণ্ঠস্বরে ও রসনায় আমি নিরন্তর বাস করিতেছি"।

গৌরের এই সব প্রেমের কথা শুনিয়া মুকুন্দের নির্ব্বেদ দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল; তখন তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য ও আপনার দোষ কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর কিছু লজ্জাবনত মুখে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

নারায়ণীর সপ্রাদভোজন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রেমের হাট বসিয়াছে; এই আনন্দবাজারে যে যাইতেছে, সে আর রিক্ত হস্তে ফিরিতেছে না। প্রেমান্নে, আনন্দান্নে তাহার আত্মার উদর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শ্রীবাসের দাসদাসী যত ছিল, সকলেই এ আনন্দের অংশীদার হইল। কেবল শুষ্ক জ্ঞানাভিমানী ভট্টাচার্য্যগণ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। না পারিবারই তো কথা; অহঙ্কার ও পাণ্ডিত্যাভিমানের নিকট ভক্তিদেবী অপ্রকট থাকেন। যাহা হউক, রজনী প্রভাতে গৌরের ভাবতরঙ্গ থামিয়া আসিল; পূর্ণিমার জোয়ারে ভাটা আরম্ভ হইল; মহাভাবের আবেগ কমিয়া স্থায়িভাবে পরিণত হইল। তখন আপনার গলদেশস্থিত পুষ্পমালা লইয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে একে একে বাঁটিয়া দিলেন এবং নিজ ভোজনের অবশেষ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা চারি বৎসর বয়স্কা বালিকা নারায়ণীকে খাইতে দিলেন।

বালিকা মহানন্দে প্রসাদ খাইতে লাগিল দেখিয়া ভক্তগণ তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তাহার ভোজন সমাধা হইলে গৌর বলিলেন 'নারায়ণি! একবার কৃষ্ণানন্দে কাঁদ দেখি?' কথিত আছে নারায়ণী 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া প্রেমে কাঁদিয়া ভক্তগণ কে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই নারায়ণী চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের গর্ভধারিণী। এইরূপে সে দিনকার মহালীলা শেষ হইল।

পাঠক মহাশয় এই প্রস্তাবে অনেক অলৌকিক বৃত্তান্ত, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি এবং ভাবুকতার পরিচয় পাইলেন। স্থানে স্থানে যে অলৌকিক কথা বলা হইল, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে না, এ কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; এবং তদ্রূপ অবিশ্বাসনিরাকরণ জন্য এই প্রস্তাবের বহুল স্থানে অবিশ্বাসীদিগকে বিধিমত প্রকারে ভর্ৎসনা করিয়াছেন ও নরকের ভয় দেখাইয়াছেন।

"এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত;
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত"।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লীলা রহস্য।

একদিন শ্রীবাসমন্দিরে ভক্তবৃন্দের সমক্ষে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, 'নিতাই! তুমি বড় চঞ্চল হয়েছো; আমার ভয় হয় পাছে তুমি কাহার সহিত ঝগড়া কর'।

নিতাই তদ্রূপ পারিহাসব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন "বিষ্ণু! বিষ্ণু!" আমি মহাগম্ভীর ব্যক্তি, আমার উপর তোমার এরূপ দোষারোপ করা অন্যায়। তুমি কিসে আমার চঞ্চলতা দেখিলে? গৌরচন্দ্র কহিলেন,—'চঞ্চলতা আর কিসে? কেবল আহারের সময় ঘরময় অন্নবৃষ্টি করা।'

নিত্যানন্দ। 'পাগলেই ভাত ছড়ায়; আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াবো? তা বুঝেছি এই ছলে আমাকে ঘরে ভাত না দিয়ে তুমি সুখে একাকী খেতে চাও? আচ্ছা খাবে খাও, নিজের অপকীর্ত্তি নিজে বলে আর কেন চলাচ্ছো।'

গৌর। 'ওহে তা নয়; তোমার অপকীর্ত্তি দেখিলে আমার কি না লজ্জা হয়; তাই এত গলা ফাড়া ফাড়ি করি'।

নিত্যানন্দ তখন ভাবান্তর পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা! ভাল ভাল; আমার চপলতা দেখিলে তুমি খুব শিক্ষা দিও। ওহে গৌর! তুমি ঠিক বলেছো ভাই! আমি নিশ্চয় বড় চঞ্চল হয়েছি।"

বলিতে বলিতে মহানন্দে নিতাইয়ের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন

দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া দিগ্বাস হইলেন এবং অঙ্গনমধ্যে যোড় পায়ে লম্ফ দিতে দিতে হাসিতে লাগিলেন।

গদাধর, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন। গৌরচন্দ্র কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ— "নিতাই! সাবধান, এ ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী, বুঝিয়া কাজ কর। এখনই বলিলে যে, আমি কি পাগল? সে কথা কি ভুলে গেলে? এ পাগলের কাজ নয় তো আর কি? এই বলিয়া স্বহস্তে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ আনন্দসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া সে সব কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

বেলা দুই প্রহর। বিশ্বম্ভর নিজ গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠে দিব্য খট্টায় আসীন। নিকটে পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া এক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে স্বামীর করকমলে তাম্বূল দিতেছেন। গৌরচন্দ্র তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে কত ধর্ম্মের কথা, প্রেমের কথা, সংসারের কথা, কত মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইতেছেন। সরলমতি অবলা স্বামীর মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে বৈকুণ্ঠের সুখ অনুভব করিতেছেন; মাঝে মাঝে মৃদুমোহন স্বরে দুই একটী কথার উত্তর করিতেছেন; এবং আপনার অতুল রূপরাশি বিকাশ করিয়া ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। গৌর! এ রূপ কি তোমার মনে ধরে? লোকে যে বলে তুমি তোমার স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী পত্নীকে ভালবাস না; বাসিলে তাঁহাদিগকে সংসারের অকূল-সাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাস লইতে না। এ কথা কি সত্য? আমরা সংসারের ক্ষুদ্রচেতা জীব, তাই তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়া এরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকি। অথবা প্রণয়িনী বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ তোমার মনে ধরে বইকি? নইলে আজ এমন ক'রে তাঁর সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করিয়া সুখানুভব করিবে কেন? বুঝিয়াছি, এই ভালবাসা ভগবৎপ্রেমসিন্ধুর বিন্দু বলিয়া তোমার নিকট এত খাতির।

পুত্র ও পুত্রবধূকে এক সঙ্গে থাকিতে দেখিলে শচীমাতার মনে বড়ই আনন্দ হইত। তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া গৌরচন্দ্র আরো এইরূপ করিতেন। আজ বধূর সঙ্গে গৌর যে ভাবে বসিয়া কথা কহিতেছেন, শচীদেবী তাহা প্রকোষ্ঠান্তর হইতে দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। "নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া ঘর ছাড়িয়া যাইবেন—" বহুদিন পূর্ব্বে তিনি এই

স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা মধ্যে মধ্যে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া তাঁহাকে বড়ই যন্ত্রণা দিত। আজও তাঁহার সে স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আজ তাহা তিনি অমূলক বোধে উড়াইয়া দিলেন। কেন না, যখন বধূর সঙ্গে পুত্রের এত ভালবাসা হইয়াছে, তখন কি আর সন্ন্যাস সম্ভবে? আহা! সরলমতি জননী বুঝিলেন না যে তাঁহার পুত্রের দাম্পত্যপ্রেম মাতৃভক্তির তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি এই প্রগাঢ় মাতৃভক্তিই তাঁহার গৃহে থাকার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দাম্পত্যপ্রেমে কি তাঁহাকে আট্‌কাইতে পারে?

এই সময়ে বাহির প্রাঙ্গণে মনুষ্যের পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া একটু কুণ্ঠিত হইলেন। আর কিছু বলিবার অবসর না হইতেই প্রেমানন্দে বিহ্বল ও বাল্যভাবে চঞ্চল হইয়া নিত্যানন্দ দিগম্বরবেশে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। লজ্জাবনত মুখে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ঠিক না পাইয়া কপাটের আড়ালে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; আর গৌরচন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া এক খণ্ড বস্ত্র লইয়া নিতাইয়ের কটিদেশে পরাইতে গেলেন। অন্য কোন ব্যক্তি হইলে আজ গৌরের নিকট সমুচিত শিক্ষালাভ না করিয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু নিত্যানন্দচরিত্র গৌরের নিকট অব্যক্ত ছিল না। তিনি জানিতেন যে, নিতাই হরিপ্রেমে বিভোর, ভেদাভেদজ্ঞানশূন্য ও অমায়িক সরলতায় পরিপূর্ণ। নিতাইয়ের বিশাল হৃদয়ে ভগবৎভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব স্থান পায় না; তাই আজ এরূপ অসহনীয় ধৃষ্টতা সত্ত্বেও গৌরচন্দ্র তাঁহাকে প্রেমচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। নিতাইয়ের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রেমভাবে ও সস্মিত বদনে নিত্যানন্দের সঙ্গে রহস্যকৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিতাই তখন হরিপ্রেমে পূর্ণ হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য; সুতরাং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যের ন্যায় কি বলিতে লাগিলেন, গৌরচন্দ্র তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিত্যানন্দ! দিগম্বর হয়ে এসেছো কেন?"

নিতাই কিছু না বলিয়া, হাঁ! হাঁ! এইমাত্র উত্তর করিলেন।

গৌরচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতাই? কাপড় পরিবে না কি?"

নিতাই। 'আমি যা—বো।'

গৌর ঈষৎ কোপের সহিত বলিলেন;—'তোমার এ কি ব্যবহার?'

নিতাই। 'আর খাইতে পারি না।'

গৌর। 'এক কথার অন্যরূপ জবাব দাও কেন?'

নিতাই। 'দশ বার যাবো'?

তখন গৌরচন্দ্র পরাস্ত হইয়া কৃত্রিমকোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'দেখ নিতাই! ইহার পর আর আমার দোষ দিতে পারিবে না'।

নিত্যানন্দ তখন একটু সাব্যস্ত হইয়া চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মা কোথায়? তিনি তো এখানে নাই।" শচীমাতাকে নিত্যানন্দ জননী সম্বোধন করিতেন। গৌরচন্দ্র তখন বধূকে লক্ষ্য করিয়া একটু মিনতি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "নিতাই! যথেষ্ট হয়েছে, এখন কৃপা করে বস্ত্র পরিধান কর।"

নিতাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন—"আমি কিছু খাবো।"

গৌরচন্দ্র তখন স্বহস্তে নিতাইকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। দূর হইতে শচীমাতা এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছিলেন। যে দিন হইতে নিতাই তাঁহাকে জননী সম্বোধন করিতেন, সেই দিন হইতে তিনি তাঁহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। নিতাই ভোজনের অভিলাষ জানাইলে শচীমাতা গৃহ হইতে পাঁচটী সন্দেশ আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। নিতাই বাল্যভাবে মগ্ন; সন্দেশ পাইয়া আনন্দের সীমা নাই; কতক খাইতে লাগিলেন ও কতক চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। শচী এই ব্যবহার দেখিয়া একটু তিরস্কার করাতে নিতাই বলিলেন "আরও আনিয়া দাও।"

শচীমাতা বলিলেন, ঘরে আর সন্দেশ নাই।

নিতাই। যাও তো, অবশ্য পাইবে।

তখন শচীদেবী গৃহ মধ্যে যাইয়া যথাস্থানে সজ্জিত ঐরূপ পাঁচটী সন্দেশ দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং নিতাইকে তাহা আনিয়া দিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন। নিতাই 'দূর! দূর!' বলিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেলেন।

বৃন্দাবন দাস মহাশয় নিত্যানন্দশিষ্য; সেজন্য তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অনেক স্থানে স্বীয় অভীষ্টদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক অনেকগুলি অদ্ভুত আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। তাহার সবিস্তর বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ জননী জ্ঞানে মা বলিতেন ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন। মালিনী দেবীও তাঁহাকে পুত্রজ্ঞানে লালনপালন ও সেবা সুশ্রুষা করিতেন। কথিত আছে যে, নিতাই নিরবধি মালিনীর স্তনপান করিতেন। নিতাই নিজ হাতে ভাত খাইতেন না; ছোট ছেলেকে যেমন করে ভাত খাওয়ায়, মালিনী তেমনি করিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিতেন।

একদিন ঠাকুরসেবার ঘৃতপাত্র, একটী ছোট পিতলের বাটী কাকে লইয়া গিয়াছিল; ক্ষণকাল পরে সেই কাক ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, তাহার শূন্যমুখ, বাটী নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরসেবার জিনিষপত্র সম্বন্ধে অতি যত্নশীল; তাহার কিছু অপচয় হইলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না। মালিনী বাটীর জন্য অত্যন্ত আকুল হইলে নিত্যানন্দ হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল অবস্থা অবগত হইলেন এবং মালিনীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, কিছু চিন্তা নাই, তিনি বাটী আনাইয়া দিবেন। তৎপরে নাকি তিনি কাককে বাটী আনিতে বলিলে কাক উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল ও ক্ষণকাল পরে বাটী মুখে করিয়া প্রত্যাগমন করতঃ যথা স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল। মালিনী দেবী তখন নিত্যানন্দপ্রভাব অবগত হইয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন। ভক্তমণ্ডলীতে তাঁহার সম্মান বাড়াইবার জন্য তিনি এক দিন নিতাইয়ের এক খানি পরিধেয় কৌপীন চাহিয়া লইলেন এবং তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া সকল ভক্তকে বিতরণ করিয়া দিয়া মস্তকে বাঁধিতে বলিলেন এবং শত মুখে নিতাইয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রচার আরম্ভ।

এতদিন গৌরচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হইতেছিল। বাহিরের লোক ইহার ভিতরের তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারে নাই। নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা ছাড়িয়া বৈষ্ণবদলে মিশিয়া নাকি সংকীর্ত্তন করিতেছে,

ইহা ভিন্ন তাহারা আর কিছু জানিত না। তাঁহার অলৌকিক ভক্তির উচ্ছ্বাস, মহাভাবের প্রকাশ, প্রেমবিহ্বলতা প্রভৃতি গুণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেই কেবল সুবিদিত ছিল।

এক দিন ভাবাবেশ কালে গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুন নিত্যানন্দ! হরিদাস! তোমরা দুই জন আজ হইতে এই নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ কর। যাহাকে দেখিবে, তাহাকে মিনতি করিয়া হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের, স্ত্রীপুরুষের ভেদ করিবে না। সকলেই সমান অধিকারী। আর দিনান্তে তোমাদের প্রচারবৃত্তান্ত আমার নিকট আসিয়া বলিবে।

প্রচারের আদেশ শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী মহা আনন্দলাভ করিল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়া নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই উদাসীন সন্ন্যাসী; বাহিরের পরিচ্ছদও তদ্রূপ; সুতরাং তাঁহাদের প্রচারে কিছু কিছু ফললাভও হইতে লাগিল। তাঁহাদের ব্যাকুলতা ও সরলতাপূর্ণ উপদেশে অনেক লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহারা যে গৃহস্থের বাটীতে যান্ বা পথে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ—'শুন ভাই! যে হরি প্রাণের প্রাণ, যাঁহা হইতে জীবন, ধন, পিতা মাতা সকলই পাইয়াছ, সেই হরির নাম, প্রাণ-মন ভরে বল। তোমাদের পায়ে ধরে মিনতি করে বলি একবার হরিগুণগান করো, হরিভজন করে তাপিত প্রাণ জুড়াও, মানবজীবন সার্থক কর'।

যে প্রচারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হইয়া এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াছিল; যাহার প্রভাবে কোটি কোটি লোক সাধুজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল, তাহার সূত্রপাত এইরূপে হইল। বঙ্গদেশে এরূপ ধর্ম্মপ্রচার করা তখন নূতন; সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রচার যাত্রা লইয়া নগরে অনেকটা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। যাঁহারা সুবুদ্ধি ও নিরীহ প্রকৃতির লোক, তাঁহারা এই সাধু অনুষ্ঠান দেখিয়া বৈষ্ণবদিগের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ চিরপ্রথার বিরুদ্ধাচরণে চিরকালই অসহিষ্ণু; তাঁহারা এই অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতাদিগের ভূয়সী নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা চৈতন্যের কীর্ত্তনের বিদ্বেষী, যাহারা কীর্ত্তন শুনিতে

গিয়া প্রবেশ পায় নাই, তাহাদের বাড়ীতে প্রচারকদ্বয় গেলে তাহারা 'মার, মার' করিয়া আসিত ও কটুকাটব্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিত। কেহ বলিত 'তোমরা সঙ্গদোষে পাগল হইয়াছ, আমাদেরও কি পাগল করিতে এসেছো না কি?' অপর গৃহস্থ আবার প্রথম ব্যক্তিকে বলিত 'ওহে! বুঝিতেছ না, বেটারা চোর, রাত্রিতে চুরি করিবে বলিয়া দিনে গৃহস্থের বাড়ীর খোঁজতলাস করিতে আইসে, বেটাদের দেয়ানে ধরিয়া দেওয়া উচিত'। 'কেহ বা বলিত বেটাদের বাড়ীঘর কোথায় ঠিক নাই, ছত্রিশ জাতি এক হয়ে এক কাণ্ড কর্‌তে বসেছে; যা বেটারা তোদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হবে না। চোরের মুখেসাধুর কথা!' নিত্যানন্দ হরিদাস হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

এ দৃশ্য জগতে নূতন নয়। চিরকালই লোকে ধর্ম্ম প্রচারকের নামে এই পুরস্কার দিয়া আসিতেছে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কটূক্তি বর্ষণ তো সামান্য কথা। কাঁটার মুকুট শিরে, জুতার মালা গলায়, প্রজ্জলিত হুতাশনে নিক্ষেপ, ক্রুশে হত্যা, বাইশ বাজারে প্রহার, আর কত বলিব? এই সকল সুন্দর সুন্দর ব্যবহার ভগবদ্ভক্তের জন্য। অপরাধ এই, তাঁহারা জগতের দুঃখে কাতর হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য ভগবৎ মহিমা প্রচার করেন। এ অতি ভয়ানক অপরাধ বটে; সুখ ভোগাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়সেবার মধ্যে হরিনাম! একি সামান্য অপরাধ যে উপেক্ষা করা যায়? সাবাস্‌ সংসার! তোমার ব্যবহারে বলিহারি যাই! আর তোমরা ভগবৎপ্রিয় সাধুগণ! লোকে হরিনাম গিলিবে না, তোমরা কি বল করিয়া বালককে তিক্ত ঔষধ খাওয়ানের ন্যায় গিলাইয়া দিবে? ধন্য তোমাদের অধ্যবসায় ও ভগবন্নিষ্ঠা! দণ্ড? দণ্ড তো তোমাদের বাঞ্ছনীয়, তোমরা কি দণ্ডভয়ে ভীত? ঈশ্বরের দণ্ড, প্রসাদ বলিয়া আদর করে বুক পেতে লও। তা না হলে কি, যে বংশে নির্যাতন করে, তাহাদেরই পরবংশীয়েরা তোমাদের পূজা করে? মনে করিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়; তোমাদের সম্বন্ধে জগতের ব্যবহার যেন মনসার স্তুতি।

"যে মুখে বলেছিলাম চাঁই মুড়ি কাণী;
সেই মুখে বলিতেছি জয় ব্রাহ্মণী।"

জগাই মাধাই।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস পূর্ব্বোক্তরূপে সমস্ত নগরে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়ান এবং সন্ধ্যার সময় ভক্তগণ পরিবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আসিয়া সমস্ত দিনের বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। এক দিন গঙ্গার পথে আসিতে আসিতে তাঁহাদের নয়নগোচর হইল যে, দুইটা বিকটাকার মাতাল রাজপথে ছুটাছুটী করিতেছে; কখন বা বিকট হাস্য করিয়া পরস্পর কোলাকুলি করিতেছে, কখন উভয়ে কিলাকিলী করিয়া মল্লযুদ্ধ করিতেছে, কখন পথে গড়াগড়ি যাইতেছে আর দূরস্থিত সমবেত লোকদিগকে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করিয়া গালি দিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্রোধভরে প্রহার করিতে ধাবিত হইতেছে।

নিত্যানন্দ মহাকারুণিক; দুই জনার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্তে পথিকদিগকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুকের মধ্যে কেহ বলিল, 'মহাশয়! ইহারা অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বংশ মর্য্যাদায় ইহারা নবদ্বীপ মধ্যে অতি গণ্য মান্য; কিন্তু বাল্যকাল হইতে মদ্যপের সঙ্গে সঙ্গ করিয়া দেখুন ইহাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে? ইহারা না করিয়াছে এমন পাপই নাই; মদ্যপান, গোমাংসভক্ষণ, চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ, লোকের ঘর পোড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি পাপ ইহাদের অঙ্গের আভরণ; আর নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতিরও অন্ত নাই। ইহাদের আত্মীয় স্বজন ইহাদিগকে সংশোধন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; এখন ইহারা এইরূপ করিয়া বেড়ায়। সমস্ত নবদ্বীপ ইহাদের ভয়ে সশঙ্কিত, কখন কাহার কোন্ সর্ব্বনাশ করে। ইহাদের ভয়ে লোকের গঙ্গা-পথে আসাই দুষ্কর; স্ত্রীলোকদের তো মোটেই আসিবার যো নাই।'

নিতাই প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা রাজা তো আছেন; ইহাদের কেন রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সংশোধন করা হয় না?

আগন্তুক।—আর মহাশয় রাজদণ্ড! রাজদূত ধরিতে পারিলে তো? জগাই মাধাইকে ধরে দিয়ানে এমন লোক নাই।

নিতাই।—বলুন দেখি, ইহাদের চরিত্রে কোন গুণভাগ আছে কি না? আমার বিবেচনায় মনুষ্য-চরিত্র এরূপ কলঙ্কিত হইতে পারে না যে, এক-বারে গুণ শূন্য হয়।

আগন্তুক।—সাধুর যেমন মন, তেমনি কথা। আপনার মনের ভাবা-নুসারে আপনি বলিতেছেন; কিন্তু কৈ! জগাই-মাধাইয়ের তো কোন গুণ

দেখিতে পাই না। একটু চিন্তা করিয়া আগন্তুক কহিলেন,"রসুন মহাশয়! হাঁ! আপনি ঠিক্ বলেছেন; ইহাদের একটা গুণ আছে, তাহা বলা উচিত। ইহারা নিন্দা-পাপ-বর্জ্জিত। পরনিন্দা মহাপাপ; ইহারা পরনিন্দা করিয়াছে, এমন কেহ কখনও শুনিতে পায় নাই। সম্মুখে দেখিলে যাহা বলুক; কিন্তু পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করে না।

নিতাই। তবে দেখুন দেখি? আপনি বলিতেছিলেন, ইহাদের কোন গুণ নাই। এই বলিয়া মহাপ্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন ইহাদের কি নিস্তারের কোন উপায় নাই? শ্রীগৌরাঙ্গ তো প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া পাপী উদ্ধার করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প। এ দুইজনকে কি তাঁহার কৃপা হইবে না? যদি না হয় তবে এমন পাপীই বা আর তিনি কোথায় পাইবেন, যাহাতে প্রেমের মহিমা পরীক্ষা হইতে পারে? আচ্ছা; আমি আজ প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এই দুই পাপীকে ভাল করিবই করিব। এখন যেমন ইহাদের লোকে ঘৃণা করিতেছে, এইরূপ ইহাদের দর্শনে যদি পুণ্য মনে না করে, তবে বৃথা আমার সন্ন্যাস! বৃথা গৌরের ভক্তি প্রকাশ! আমার মনে আশা হইতেছে যে, এমন দিন আসিবে যখন এই দুই মাতাল এখন যেমন মদ্যপানে মাতলামি করিতেছে, তখন তেমনি শ্রীহরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতাই হরিদাসের মন পরীক্ষার্থ কহিলেন "হরিদাস! দেখ দেখ এ দুই জন লোকের কি দুর্গতি! আহা! পরকালে ইহাদের কি দশা হইবে? চিন্তা করিতেও আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। তুমি মহাপ্রেমিক! যবনগণ তোমার প্রাণান্ত করিতেছিল, অথচ তুমি তখন তাহাদের শুভকামনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে। এ দুইজনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের শুভানুসন্ধান কর, তাহা হইলে ইহাদের ভাল হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রভু তোমার কথা অন্যথা করেন না; তুমি ইহাদের নিস্তারের জন্য প্রার্থনা করিলে অবশ্যই ইহারা উদ্ধার হইবে।"

হরিদাস নিত্যানন্দের মনের অভিলাষ বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "শ্রীপাদ গোঁসাই! আপনি যখন উহাদের উদ্ধার কামনা করিয়াছেন, তখন আর তাহাদের পরিত্রাণের বাকী কি? আপনার ইচ্ছা ও প্রভুর ইচ্ছায় কি ভেদ আছে? আমাকে আর কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন? নিতাই হরিদাসকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ওহে হরিদাস! তবে এক

কর্ম্ম করা যাক্; আমাদের প্রতি আদেশ আছে, আচণ্ডালে কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে; চল এই দুই জনের নিকট প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিগে।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগের ঈদৃশ দুঃসাহস দেখিয়া নিষেধ করিতে লাগিল "মহাশয়! সাবধান, কদাচ ঐ দুটা মাতালের নিকট যাইবেন না। উহাদের নিকট গেলে প্রাণসংশয়। উহারা কি সন্ন্যাসীর মান্য, না ধর্ম্মপ্রচার বুঝিবে? কত ব্রহ্মবধে গোবধে যাহাদের চৈতন্য নাই, তাহারা কি তোমাদের খাতির করিবে? ধর্ম্মবীর দুইজন এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও যেখানে জগাই মাধাই ভূলুণ্ঠিত রহিয়াছে, সেইখানে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন:—"ভাইরে! দুর্লভ মানবজীবনের এমন অসদ্ব্যবহার কেন করিতেছ? পরকালে কি হইবে? একবার ভাবিয়া দেখ। শ্রীকৃষ্ণই সকলের পিতা, মাতা, ধন প্রাণ সকলই, অনাচার কুবুদ্ধি ছাড়, শ্রীকৃষ্ণ ভজ, প্রাণ শীতল হবে, দুঃখ চলে যাবে।"

এই উপদেশ বাক্য শুনিয়া পাপী দুইজন 'ধর তো বেটাদের' বলিয়া লম্ফ দিয়া উপদেষ্টাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ও ভীম-রব শুনিয়া উভয়ে অনন্যগতি হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ দর্শকবৃন্দ হায়! হায়! করিয়া বলিতে লাগিল "আহা! বিদেশী সন্ন্যাসী দুইটী প্রাণে মারা যায় দেখিতেছি।" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "সাবধানবাক্য না শুনিলে এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। ধর্ম্ম প্রচারের আর জায়গা ছিল না যে, ঘোরতর দৈত্য দুইটার নিকটে গেলেন।" পাষণ্ডীগণ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল "খুব হয়েছে; এমনি করে ভণ্ড বেটাদের প্রাণ যায় তো আপদ্ যায়।" নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাড়িত হইয়া পলাইতে পলাইতে কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাতাল দুইটা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে বটে; কিন্তু নেশার ঝোঁকে পদস্খলিত হওয়ায় প্রচারকদিগকে ধরিতে পারিতেছে না।

নিত্যানন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে হরিদাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"ভাল বেটাদের বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম; আজ যদি ইহাদের হাত এড়াইয়া যেতে পারি, তবেই মঙ্গল।"

হরিদাস ততোধিক রহস্য ব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, "আরে যাও!

তোমার বুদ্ধিতেই তো আজ অপমৃত্যুতে প্রাণ গেল। যেমন মাতালের কাছে কৃষ্ণনাম উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম, তেমনি শাস্তি হইল। আমারই দুর্বুদ্ধি যে জেনে শুনে চঞ্চল লোকের সঙ্গে এসেছিলাম।”

নিতাই কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া কহিলেন “ওহে হরিদাস! আমাকে তুমি কিসে চঞ্চল দেখিলে? তুমি কি আমার কথায় না সেই বামুনের কথায় এসেছিলে? যেন রাজপুত্রের মত হুকুম! তারই কথায় তো গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর হুকুমই বা কেমন? যত চোর বদ্‌মাইস লোকের নিকট কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে হইবে। যদি না শুনি তাহা হইলে রক্ষা থাকে না, আর শুনিলেও এই দশা। তুমি তাহার দোষ না দেখে মিছা-মিছি আমাকে দোষভাগী কর্‌ছো কেন?” এই বলিয়া নিত্যানন্দ খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হরিদাস বলিলেন, ‘আমি বুড়ো মানুষ, আর চলিতে পারি না; ওই দেখ এলো।’ এই সময়ে দস্যু দুইজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “আর যাবে কোথা! জগা মাধার হাত থেকে উদ্ধার হয়ে যেতে হবে না।” যাহা হউক, এই সময়ে বিশ্বম্ভরের বাটীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উভয়ে বাটী প্রবেশ করি-লেন। মাতাল দুইজন প্রবেশপথ না পাইয়া অনেকক্ষণ চীৎকার করিল; পরে উভয়ে জড়াজড়ি ও কিলাকিলী করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন হরিদাস ও নিত্যানন্দ পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে হাসিতে গৌরাঙ্গ সভায় চলিলেন।

ভক্তমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া গৌরচন্দ্র বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসীন। এমন সময়ে হরিদাস ও নিত্যানন্দ যাইয়া সে দিনের রহস্য কথা আমূল বিবৃত করিলেন। গৌরের প্রশ্নমতে গঙ্গাদাস শ্রীবাস প্রভৃতি জগাই মাধাইয়ের জীবনের সমস্ত পরিচয় দিলে গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন :—“আবার যদি মাতাল দুইটা এখানে আসে, তবে তাদের কেটে খণ্ড খণ্ড করিব।’

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন “আচ্ছা! তুমি খণ্ড খণ্ড কর; আমি কিন্তু তাদের ছেড়ে কোথাও যাইব না। কিসের তোমার ভক্তির বড়াই? যদি এই পাপী দুইটাকে তরাইতে না পারিবে। ধার্ম্মিক লোক ত স্বভাবতঃই হরিভজন করে; তাতে ভক্তির মহিমা বুঝা যায় না। এমন পাপী উদ্ধার না হলে হরিনামের মহিমা কোথায়?”

বিশ্বম্ভর এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন “যখন তাহারা

তোমার দর্শন পেয়েছে ও তুমি তাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই কৃষ্ণ তাহাদের উদ্ধার করিবেন।"

গৌরাঙ্গের আশ্বাস বাক্যে নিত্যানন্দ আনন্দিত হইলেন; ভক্তগণ সকলে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহানন্দের কোলাহলে বাটী পূর্ণ হইয়া গেল। আজকার আনন্দবাজারে বৃদ্ধ হরিদাসও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই অদ্বৈতের নিকটে নিত্যানন্দ প্রচার যাত্রায় বাহির হইয়া যে যে কাজ করিয়াছেন, রসিকতার বুক্‌নি চড়াইয়া তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন:—"মহাশয়! প্রভুর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাই মহা চঞ্চলটার সঙ্গে আমাকে প্রচারে পাঠাইয়াছিলেন। আমি কোথায় থাকি? আর সে বা কোথায় যায়? গঙ্গায় কুমীর ভাসিতে দেখিলে সাঁতার দিয়া ধরিতে যায়, পথে ছেলে দেখিলে ধরিতে যায়, আর তাদের মা বাপ ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসে; আমি তাদের চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া বিদায় দিই। গোয়ালা ভারে করিয়া দধি ঘৃত বেচিতে যাইতেছে দেখিয়া সে কাড়িয়া লইয়া পলায়, তাহারা উহাকে ধরিতে না পারিয়া আমাকে মারিতে আইসে। ছোট ছোট মেয়ে দেখিলে তাদের বিবাহ করিতে চায়; কখন ষাঁড়ের উপর চড়িয়া আপনাকে শিব বলিয়া পরিচয় দেয়; কখন বা গাভীর দুদ দুহিয়া খাইতে যায়; আমি নিষেধ করিলে বলে তোর অদ্বৈতকেই বা কে মানে? গৌরাঙ্গকেই বা কে ডরায়? এমন পাগলের সঙ্গেও মানুষ যায়? তার কথায় ঘোর মাতাল দুটার কাছে হরিনাম প্রচার করিতে গিয়ে কি বিপদেই পড়ে ছিলাম।"

অদ্বৈতাচার্য্য হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "মাতালের সঙ্গে মাতালের যোগ হইবারই কথা; মাঝখানে নৈষ্ঠিক চরিত্র তুমি কেন? ও নিজে মাতাল, দলশুদ্ধ মাতাল না করিয়া ছাড়িবে না। দিন দুই পরে দেখিবে, সেই মাতাল দুইটা এসে নিতাই ও নিমাইয়ের সঙ্গে নাচিবে। এই বেলা এসো তুমি আমি জাত লইয়া পলাই।"

ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জগাই মাধাই উদ্ধার।

পুণ্য সত্ত্বাবাচক; পাপ অসত্ত্বাবাচক বা অভাবাত্মক। আলোক সত্ত্বা বাচক, অন্ধকার অভাবাত্মক। আলোকের অভাবই অন্ধকার, পুণ্যের অভা-বই পাপ। পাপ অবস্তু, শূন্য, প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়। পুণ্য বস্তু বা সত্ত্বা। পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্যে পুণ্য বা ধর্ম্ম মানবাত্মার চিরসহচর বা অচ্ছেদ্য গুণ-রূপে প্রতিষ্ঠিত। যাবৎ সৃষ্টি লীলা তাবৎ ইহার স্থিতি। জীব প্রকৃতির সহিত ইহা ওতপ্রোতরূপে অনুস্যূত। জীবাত্মা হইতে কেহ পুণ্যের সত্ত্বা এক-বারে উন্মূলিত করিতে পারে না। যিনি যত ইহা হইতে দূরে থাকুন, তিনি যে একেবারে পুণ্যহীন হইবেন, তাহা অসম্ভব। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, পবি-ত্রতা, রতি, মতি, দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষমা, আনন্দ প্রভৃতি যে সমুদায় অসংখ্য বিচিত্র শক্তির বীজ মানবাত্মার অন্তর্ভূত আছে, যাহাদিগের বিকাশ হইলেই জীবের বিকাশ হয়, সে সকল সৎগুণকেই আমরা পুণ্যনামে অভিহিত করিলাম। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের নামই পুণ্যতত্ত্ব। এই অর্থে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা প্রভৃতি নিকৃষ্ট শক্তি গুলিও পুণ্যপদ বাচ্য; কারণ তাহারাও সৃষ্টির অন্তর্গত। পাপের প্রকৃতি কিন্তু এরূপ নহে; পাপ সৃষ্টি ছাড়া, বিধা-তার রাজ্যমধ্যে তাহার স্থান নাই। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সমস্ত প্রকৃতির অপরি-স্ফুট অবস্থা যে পাপের অবস্থা, তাহা নহে; কিন্তু ঐ সকলের অযথা প্রয়ো-গই পাপ। তবেই দেখা যাইতেছে যে পাপের রাজ্য কল্পনার বা মোহের রাজ্য। কল্পনা কখন বস্তু নয়, সুতরাং পাপ অবস্তু। পুণ্যবান্ ব্যক্তি যেমন বস্তু লাভ করিয়া লীলাময়ের লীলা রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন, পাপী তেমনি পাপ করিয়া ভগবানের রাজ্য ছাড়িয়া মরীচিকাময় স্বীয় কল্পনার ও স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। একজন বস্তুলাভ করে, আর একজন অব-স্তুতে ডুবিয়া মরে। এই জন্য প্রকৃত ভগবৎপরায়ণ সাধু পাপের নিত্যত্বে কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যাঁহারা পাপের বস্তুত্বে বিশ্বাস করেন, পাপের সৃষ্টি বিষয়েও সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাস করিতে হয়। আবার অনন্ত পুণ্যের আধার ভগবান্ পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা পাপপ্রসবিতা সয়তান বা পাপপুরুষের নিত্যত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। ইহার ফল সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, পাপীর পাপ দূরীভূত না হইলে উহা

জীবাত্মার অনন্ত কালের সহচর হইল। কাজে কাজেই দুর্ভাগ্য জীবের কপালে অনন্ত নরক ভোগ বই আর কি হইতে পারে? প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম এই মতের পক্ষপাতী। ঐ ধর্ম্মে এই পাপ মোচনের যে উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা যিনি অবলম্বন করিতে পারিলেন, তিনি সৌভাগ্যবান্। কিন্তু যাঁহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না, বা সেই পরিত্রাণ বিধান যাঁহারা জানিতে পারেন নাই, অথবা যাঁহাদের জীবিতকালে ঐ বিধান পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, তাঁহাদের কপালে অনন্ত নরক লিখিত হইল। মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান কিন্তু এই মতে সায় দিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তের নিকট পাপ অবস্তু, সুতরাং চিরস্থায়ী নহে। মরীচিকার স্থায়িত্ব কোথায়? স্বপ্নের স্থায়িত্ব অসম্ভব। সুতরাং চিরকাল কেহ পাপী থাকিতে পারে না। যে যতই কেন মনুষ্যত্ব বিহীন দুরাচার পাপী হউক না, তাহার মোহ ছুটিবেই ছুটিবে, স্বপ্ন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে, ভ্রান্তি যাইবেই যাইবে। এ জীবনে না যায় তাহাতে কি? অনন্ত জীবন পড়িয়া আছে।

কি সুখের সংবাদ! কি আশার কথা! এমন না হইলে কি পাপীদের মাথা রাখিবার স্থান থাকিত? পাপের এই আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দুরাচার পাষাণ হৃদয় কঠিন পাপীদেরও আশু উদ্ধারকল্পে নিরাশ হওয়া যায় না। যেমন স্বপ্ন সঞ্চারণকারীর স্বপ্নটী ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা যায়, তেমনি পাপের মোহ ছাড়াইতে পারিলেই পাপী আপন জীবনগতি দেখিতে পায়; পুণ্য পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, এবং এত দিন কল্পনা ভ্রমণের জন্য অনুতাপ করে। এই রোগের সাধু চিকিৎসক যাঁহারা, তাঁহারা এই চমক ছাড়াইবার জন্যই যুগে যুগে যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভূতের রোজা মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়ায়, এ কথায় আজ কাল সকলে বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু পাপ ভূতের রোজাগণ অলৌকিক মন্ত্রবলে যে মহাপাপীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কে অবিশ্বাস করিতে পারে? এক দুই দশ দিনে বা দু'বছর, দশ বছরে নহে, এক মিনিটের মধ্যে পাপের মরীচিকা দূরীভূত হইয়াছে; কল্পনা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তাহার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। পাপ বস্তু বা সত্য হইলে ইহা কথনই সম্ভব হইত না। রত্নাকর—বাল্মীকি, দুরাত্মা সদ—সাধু সদ, লম্পট বিল্বমঙ্গল—প্রেমিক লীলাশুখ, নৃশংস ব্যাধ—পরম ভক্ত, হইতে পারিত না। যে মহামন্ত্র বলে এই

সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা ভগবানের নাম। নিত্যানন্দ এই সমস্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; তাই জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার সাধনে পূর্ণ আশা করিতেছিলেন।

নিত্যানন্দ যে দিন হরিদাসের সঙ্গে নাম প্রচারে যাইয়া মদ্যপদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহাদিগের উপর তাঁহার কেমন একটা টান হইয়াছিল; তাহাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যখন তখন তাহাদিগের নিকট যাইতেন ও গোপনে থাকিয়া তাহাদের কার্য্য কলাপ পরীক্ষা করিতেন। জগাই মাধাই তখন ঘোর উন্মত্ত অবস্থায়, সুতরাং নিতাইয়ের এই সব সাধু চেষ্টা জানিতে পারে নাই। এই অবস্থায় এক দিন রজনীযোগে নিত্যানন্দ নগরভ্রমণ করিয়া আসিতে আসিতে পাপী দুইটার সমীপবর্ত্তী হইলেন। আগন্তুকের পদশব্দ শুনিয়া মাতাল দুই জন, 'কে রে?' 'কে রে?' করিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর নাম কি?' নিত্যানন্দ প্রেমভাবে উত্তর করিলেন 'আমার নাম অবধূত'। 'আর যাস্ কোথা' বলিয়া মাধাই নিকটস্থিত কলসীভাঙ্গা মুট্‌কী কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুররূপে ছুড়িতে লাগিল। মুট্‌কী নিতাইয়ের মস্তকে লাগিয়া ফুটিয়া দর দরিত ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।

নিতাই মুট্‌কীর আঘাত খাইয়া ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, আপনার মাথা দিয়া যে দর বিগলিত ধারে শোণিত পড়িতেছে, তাহা গ্রাহ্য নাই; জগাই মাধাইয়ের দুষ্কৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, শুধু তাহা নহে; সেই রুধিরাপ্লুত কলেবরে তাহাদের আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মার খাইয়া যেমন প্রেমভাবে তাহাকে আদর করে, মহাপ্রেমিক নিতাই তেমনি বাহু বিস্তার করিয়া আলিঙ্গন করিতে গেলেন :—

"মাধাই রে! আয় ভাই! মেরেছিস্ কলসীর কাণা; হাঁরে! তা বলে কি প্রেম দিব না?"

ধন্য প্রেম! জগতীতলে তুমিই ধন্য! ভগবানের জীবন্ত শক্তি! তুমিই ধন্য! আর নিতাই! ধন্য তোমার প্রেম শিক্ষা! এ প্রেম কি তুমি প্রেমময়ীর পাঠশালায় শিখেছিলে? নইলে স্বার্থপর জগতে ইহার ছবি তো দেখিতে পাই না। প্রেমময়! তুমিই ধন্য যে দুর্বৃত্ত মানবজাতীর মধ্যে

এমন স্বর্গের জিনিষ পাঠাইয়াছিলে। এ প্রেম না হলে কি অসুরকুল উদ্ধার হতো? সাধুর রক্তে যে পাপীর পরিত্রাণ, একথা আর অবিশ্বাস করিব কেমন করে? ঈশার রক্তে পৃথিবী উদ্ধার হইল, হরিদাসের শোণিতে নিষ্ঠুর যবনকুল দ্রবীভূত হইল, আর নিত্যানন্দের শোণিতে আজ জগাই মাধাই তরে গেল; তবে আমরা পাপীদের উদ্ধার হইতে আর বাকি কি থাকিল? তাই আজ আনন্দে সকলে হরি! হরি! বল।

নিকটে থাকিয়া জগাই এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে ছিল; বিদ্যুদ্বেগে যেন এক মহাশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিল। চকিতালোকে তাহার পাপজীবনের পাপপূর্ণ প্রতিকৃতি যুগপৎ মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইল; কে যেন জোর করিয়া তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ জীবনচ্ছবির সহিত তাহার ঘৃণিত ও কলঙ্কিত জীবনের তুলনা করিয়া দিল। অমনি পাপের বিঘোর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, মোহের চট্‌কা ছুটিয়া গেল এবং স্বপ্ন সঞ্চারীর স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমত হয়, সে আপনার অবস্থা তেমনি দেখিতে পাইল। পাপের প্রলেপ যত কেন ঘনীভূত হউক না, উহা অবস্তু, ভুয়া বই তো নয়; তাই অস্তিত্বপূর্ণ পুণ্য-রূপিণী ভগবচ্ছক্তিকে কখন চিরকাল আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। সেই জন্য মাধাই নিত্যানন্দকে বিনা দোষে যে নির্ঘাত প্রহার করিল, তাহা দেখিয়া জগাইয়ের প্রাণে দয়া হইল; সে মাধাইকে পুনর্ব্বার মারিতে উদ্যত দেখিয়া মারিতে না দিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল:—"ওরে মাধাই! দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে এমন করে মারিলি কেন? ইহাকে মেরে তোর কি লাভ হইল? ইহার মাথায় শোণিত ধারা পড়িতেছে দেখিয়া তোর প্রাণে কি একটু দয়া হয় না?'

যেখানে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, সেখান হইতে বিশ্বম্ভরের বাড়ী অধিক দূর নহে। গৌরচন্দ্র তখন বহির্ব্বাটীতে স্বদলে বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেছিলেন; এমন সময়ে এক জন লোক যাইয়া মাধাই কর্ত্তৃক নিত্যানন্দের প্রহারবৃত্তান্ত জানাইল। গৌরচন্দ্র সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তৎ-ক্ষণাৎ ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন, বহুজন সমাকীর্ণের মধ্যে নিত্যানন্দ দণ্ডায়মান, মস্তক দিয়া দরদরিতধারে রক্ত পড়িতেছে। অদূরে জগাই মাধাই দাঁড়াইয়া আছে, আর নিতাই সেই রক্তাক্ত কলেবরে হাসিতে হাসিতে আততায়ীদিগকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছেন।

নিতাইর অঙ্গে রক্ত-ধারা দেখিয়া, গৌরচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া পাপীদিগকে সংহার করিবার জন্য 'চক্র! চক্র!' বলিয়া সুদর্শন চক্রকে নাকি স্মরণ করিলেন। কথিত আছে যে, ভক্তগণ চক্রের আগমন দেখিতে পাইয়া প্রমাদ গণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিত্যানন্দ গৌরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "মাধাই মারিতেছিল বটে, কিন্তু জগাই করুণা-পরবশ হইয়া মাধাইকে মারিতে দেয় নাই; আমি বিশেষ কোন আঘাত পাই নাই; দৈবে রক্ত পড়িয়াছে; তাহাতে কিছু হানি হয় নাই। যাহা হউক, তুমি স্থির হও; আমার অনুরোধ এ দুই জনকে কিছু বলিতে পাইবে না।' 'মাধাই মারিতে জগাই রাখিয়াছে' এই কথা শুনিয়া গৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি জগাইকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন:—'জগাই রে! তুই আজ কি কাজই করেছিস্, নিতাইকে বাঁচাইয়া তুই আমাদের কিনিয়াছিস্; কৃষ্ণ তোরে কৃপা করুন, স্বর্গের প্রেমভক্তি তোর লাভ হউক।'

নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেমপ্রভাবে ইতিপূর্ব্বেই জগাইর প্রাণে সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল; যে টুকু বাকী ছিল, তাহা গৌরের প্রেমালিঙ্গনে পূর্ণ হইয়া গেল। সত্য সত্যই জগাইয়ের পাপ মোহ ছুটিয়া গেল; চিরকালের সঞ্চিত পাপরাশি স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে তাহার প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল; জীবনের জঘন্যতা স্মরণ করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; এবং সাক্ষাৎ পাপ পুরুষ বিকটাকার দেহ ধরিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। জগাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। ধন্য শ্রীহরি! তোমার প্রেমের মহিমা; মুহূর্ত্তমাত্র যুগপ্রলয় উপস্থিত। একনিমিষে ঘোরতর মহাপাপী উদ্ধার হইয়া গেল। মূর্চ্ছিতাবস্থায় জগাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে সকল সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, তাহারা রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধরিয়া আলুলায়িত কেশে বিকট হাস্য করিতে করিতে তাহাকে যেন বিষ্ঠাগর্ত্তে ডুবাইতেছে; যে অবলার অবৈধ গর্ভোৎপাদন করায় কলঙ্কিনী কলঙ্ক লুকাইতে আত্মহত্যা করিয়াছিল, সে যেন তপ্ত লৌহ শলাকা তাহার চক্ষুর গহ্বরে ফুটাইয়া দিতেছে; যেন ভয়ানক তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে; আর ইতিপূর্ব্বে যাহাদের সে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহারা হাসিতে হাসিতে যেন দুর্গন্ধময় আগ্নেয় মূত্র

আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছে, সে যেন দুর্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছে। ইহার মধ্যে সে দেখিল যেন অতি দূর হইতে "ভয় নাই! ভয় নাই!" বলিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে নিত্যানন্দ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন এবং ক্ষণকাল পরে দেখিল যেন বিশ্বম্ভর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চতুর্ভুজধারী বিষ্ণুরূপে হাসিতে হাসিতে আসিয়া স্বীয় পাদপদ্ম তাহার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন; অমনি সেই পিশাচ রাক্ষস সকল অন্তর্হিত হইয়া গেল ও নরকের ভীষণ দৃশ্যের পরিবর্ত্তে স্বর্গের অনুপম শোভা চারিদিকে প্রকাশিত হইল। এই অবস্থায় চৈতন্য লাভ হইলে পুরাতন ও কঠিন পাপী জগাই বিশ্বম্ভরের চরণ ধরিয়া নিস্তারের জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। জগাই ও মাধাইয়ের শরীর মাত্র পৃথক, দুইজনে একপ্রাণ; বাল্যাবধি যত পাপ করিয়াছে, দুইজনে একত্র। যেমন জননীর এক স্তন্য-ধারায় যুগল তনয় পুষ্ট হয়, তেমনি পাপপিশাচীর একই কলুষ কালকূটে উভয় পাপী সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। একজন পুণ্যবান্ হইল; আর একজন পাপী থাকিয়া যাইবে; তাহা তো হইতে পারে না। মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়া নিকটে বসিয়াছিল; জগাইর ঈদৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়া ও অনুতাপের ক্রন্দন শুনিয়া তাহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। জগাইয়ের প্রাণের পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিয়া যেন তাহার হৃদয়েও লাগিল। কে জানে কি শক্তি প্রভাবে তাহারও পাপের নেশা ছুটিয়া গেল। তখন সে ব্যাকুল চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিতে লাগিল:—"আমরা দুইজনে এক সঙ্গে চিরকাল পাপ করিয়া আসিতেছি; সুখ দুঃখ যখন যাহা ঘটিয়াছে, উভয়ে সমানাংশে ভোগ করিয়াছি; এখন জগাই পুণ্যবান্ হবে, আর আমি পাপী থাকিয়া যাইব, তাহা হইতে পারে না; আর তোমারই অনুগ্রহ বা কেমন যে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিবে? আমি দুরন্ত পাতকী; গৌর! তুমি ভিন্ন আমাকে আর কে উদ্ধার করিবে? আমাকে রক্ষা কর।

বিশ্বম্ভর বজ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, 'তোমার নিষ্কৃতি নাই; তুমি সাধু দেহে রক্তপাত করিয়াছ; সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।'

মাধাই দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে কহিল, 'আমার উদ্ধার না হইলে তোমাকেই বা ছাড়ে কে? শুনিয়াছি, তুমি পাপ রোগের সুচিকিৎসক; আমার রোগের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিসের তোমার চিকিৎসানৈপুণ্য? এখন আমার গতি কি হবে, বলিয়া দাও।'

বিশ্বম্ভর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'সাধুর রক্তে পাপীর পাপ-প্রায়শ্চিত্ত হয় শুনিয়াছি ; তাই আজ নিত্যানন্দের রক্তপাতে পাপী দুইটা উদ্ধার হইতেছে।' প্রকাশ্যে মাধাইকে বলিলেন, 'তুমি নিত্যানন্দস্থানে অপরাধী ; তিনি ভিন্ন তোমার পাপ ক্ষমা করিতে কাহারও সাধ্য নাই।"

মাধাই তখন কাঁদিতে কাঁদিতে নিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বিশ্বম্ভর বলিলেন 'শুন নিতাই! তোমার অঙ্গে ও রক্তপাত করেছে ; উহাকে ক্ষমা করা না করা তোমার হাত ; আমি বলি যখন ও চরণে পড়ছে তখন তোমার ক্ষমা করা উচিত।'

উদার প্রেমিক নিতাই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন 'এই তো কথা। শুন গৌর! আমি বলি আমার যদি কোন জন্মের কিছুমাত্র সঞ্চিত পুণ্য থাকে সে সব মাধাইর। আমার স্থানে ইহার অপরাধ থাকার ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। তুমি এখন চতুরালি ছেড়ে ইহাকে কৃপা কর।'

বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'আচ্ছা! নিতাই! তবে মার খেতে খেতে যে আলিঙ্গনটা দিতে গিয়েছিলে, সেটা আর বাকি থাকে কেন? যদি, হলো তো ভাল করেই হউক'। "সে তো অনেক দিন হয়ে গিয়েছে!" এই বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ অনুতপ্ত মাধাইকে কোলে করিয়া লইলেন। সাধুদেহ-সংস্পর্শে মাধাইর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তখন পাপী দুইজন কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর নিতাইয়ের স্তব করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বলিলেন "শুন জগাই! মাধাই! আর তোমরা পাপ করিও না।"

তাহারা অনুতাপের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল "বাপ! আবার?"

বিশ্বম্ভর পুনরায় তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শুন! তোমরা যদি আর পাপপথে গমন না কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্মজন্মান্তরের কলুষরাশি কৃষ্ণ মার্জ্জনা করিয়া পরম মঙ্গল করিবেন, তোমাদের দেহে নিত্য বিরাজ করিবেন ; এবং পূর্ব্বে তোমাদের স্পর্শে যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিয়াছেন, এখন তোমাদের অঙ্গ স্পর্শে, তাঁহারা গঙ্গাস্পর্শের ন্যায় পুণ্য মনে করিবেন। ভক্তের ইচ্ছা কখন বিফল হইবার নহে ; নিত্যানন্দের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে।"

জগাই মাধাই গৌরের ঈদৃশ প্রেমপূর্ণ ভাব শুনিয়া আনন্দে মোহ প্রাপ্ত হইল। তখন বিশ্বম্ভর ভক্তগণকে আদেশ করিলেন 'সকলে এ দুই

জনকে তুলিয়া আমার বাড়ীতে লইয়া চল। আজ এ দুই জনের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে নাচিতে হইবে।” ভক্তগণ তাহাই করিলে গৌরচন্দ্র স্বদলে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া বৈষ্ণব দল লইয়া মহা সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল লোক রাজপথে এই ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। অচিরকাল মধ্যেই নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, নিমাই পণ্ডিত দুর্দ্ধর্ষ জগাই মাধাইকে সাধু করিয়াছে। হাতে পাষণ্ডীদিগের অহঙ্কার চূর্ণ হইল ও নিমাইয়ের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

জগাই মাধাইয়ের গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনে মাতামাতি হইলে গৌরের প্রেমভক্তির জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া পাপী দুই জন একেবারে গলিয়া গেল, এক দণ্ডে নরক হইতে স্বর্গে উঠিয়া পড়িল, কত প্রকার দৈন্য করিয়া পাপের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিল এবং অশেষ প্রকারে নিতাই গৌরের স্তুতি বন্দনা করিল। কীর্ত্তনান্তে বিশ্বম্ভর সকল বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমাদের যাঁহার নিকট এ দুই জন যত অপরাধ করিয়াছে, তোমরা কায়মনোবাক্যে তাহা মার্জ্জনা করিয়া ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হও; আর আজ হইতে কেহ ইহাদিগকে মদ্যপ কি পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারিবে না; ইহাদের শরীরে আর পাপ নাই; তোমরা সকলে ইহাদিগকে আপন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিবে, ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আহার দিবে। যদি কখন কেহ ইহাদিগকে পরিহাস কর, আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বনাশ হইবে”।

প্রভুর আজ্ঞায় তখন জগাই মাধাই একে একে প্রত্যেকে বৈষ্ণবের চরণ তলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চরণধূলি লইতে লাগিল এবং সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গৌরচন্দ্র তখন সেই গভীর রজনীযোগে ভক্তদল লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন, এবং গঙ্গার প্রসন্ন জল মধ্যে অঙ্গমার্জ্জন ও শিশু বালকের ন্যায় পরস্পর জলকেলি ও সন্তরণ করিয়া সকলকে মাল্যচন্দন পরাইয়া বিদায় দিলেন। জগাই মাধাই ইহার আগে কত দিন গঙ্গাস্নান করিয়াছিল; কিন্তু আজিকার ন্যায় তাহারা গঙ্গাজল একদিনও শীতল ও পবিত্র বলিয়া অনুভব করিতে পারে নাই। আজি যেন আকাশে চন্দ্র মধুধারা বর্ষণ করিতেছিল, এবং প্রকৃতির ছবিতেও সুধা মাখান ছিল। সত্য সত্যই

আজ তাহারা জলাভিষিক্ত হইল। স্নানান্তে বিশ্বম্ভর নিজ হস্তে তাহাদের মাল্য চন্দন পরাইয়া দিলেন। সে রাত্রি জগাই মাধাই ভক্তদিগের আলয়েই যাপন করিলেন।

জগাই মাধাই সেই অবধি সাধু সঙ্গে বাস করিতে লাগিল এবং কঠোর সাধনব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাতেই সমস্তদিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই তাহারা সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া পরম ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিল। তাহাদের দৈনিক সাধনের নিয়ম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া দুই লক্ষ হরিনাম জপ করিত; আপনাদের পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদিত ও আপনাদের ধিক্কার দিত; সাধুদিগকে প্রণাম বন্দনা করিয়া পদধূলি লইত ও আপনাদের পাপের কাহিনী বলিয়া কাঁদিত। সদলে বিশ্বম্ভর নিরন্তর তাহাদের আশ্বাসবাণী শুনাইতেন ও উপদেশ দিতেন। মনের গ্লানিতে তাহারা পান ভোজন করিতে চাহিত না। বিশ্বম্ভর সম্মুখে বসিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। ইহাতেও উহারা প্রথম প্রথম প্রাণে সোয়াস্তি পাইত না।

মাধাই নিত্যানন্দকে যে প্রকার মারিয়াছিল, তাহার জন্ত সে নিরন্তর অনুতাপ ও ক্রন্দন করিত। নিতাই যদিও সে অপরাধ গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু মাধাইয়ের তাহাতে চিত্তে শান্তি হইত না। ইহার জন্ত সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত ও কখন কখন ছুটিয়া নিত্যানন্দের নিকট যাইয়া ক্রন্দন করিত। এক দিন নির্জ্জনে নিত্যাইয়ের দেখা পাইয়া সে আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল ও অশেষ প্রকারে নিতাইয়ের স্তুতি করিতে লাগিল। মার খাইয়া যে প্রেম দিতে পারে, তাঁহাকে সে আর সামান্ত মানুষ জ্ঞান করিতে পারিল না। নিতাই বলিলেন—'মাধাই! তুমি আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়; পুত্র মারিলে কি পিতার তাহাতে ব্যথা লাগে?'

মাধাই বলিল, 'প্রভো! যদি আমায় এত দয়া করিলেন, তবে আমাকে আর একটী উপদেশ বলিয়া দিন্। আমি যত প্রাণীর হিংসা করিয়াছি, তাহাদের সকলকে চিনি না, চিনিলে প্রত্যেকের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। সেই সকল অপরিচিত জনের সম্বন্ধে আমার অপরাধ কিসে যাইবে?"

নিতাই ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ইহার জন্ত চিন্তিত হইও না, এই নবদ্বীপ নগরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গঙ্গা স্নান করিয়া থাকেন;

তুমি স্বহস্তে গঙ্গার ঘাটগুলি সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে যাহাতে সকলে অনায়াসে ঘাটে বসিয়া স্নান করিতে পারেন, এবং যাঁহারা স্নানে আসিবেন, তাঁহাদের সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দৈন্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এই পর-সেবাতেই তোমার সকল পাপ অন্তর্হিত হইবে।”

মাধাই আর বাক্যব্যয় না করিয়া নিত্যানন্দকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সেবায় ব্রতী হইল। স্বহস্তে কোদালি লইয়া সে ঘাটে ঘাটে ঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং যাহাকে দেখে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় অপ-রাধের কথা বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল। মহাত্মা মাধাই গঙ্গাতীরে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াদিল। যেখানে ভাগ্যবান্ মাধাই তপস্যা করিত, এখনও লোকে তাহাকে মাধা-ইয়ের ঘাট বলে।

এদিকে গ্রামের মধ্যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল, যে এ দুই মহাপাপীকে সচ্চরিত্র সাধু করিতে পারে, সে কখনই সামান্য মানুষ নহে। পাষণ্ডীদিগের মস্তক অবনত হইল; এবং লোকে বিশ্বম্ভরের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। আর জগাই মাধাই নিত্যা-নন্দ গৌরাঙ্গের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

চৈতন্য ভাগবত-গ্রন্থাবলম্বনে উপরি উক্ত ঘটনা বিবৃত হইল। চৈতন্য-মঙ্গলের বৃত্তান্ত ইহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। চৈতন্যমঙ্গলকার লোচন দাস বলেন যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সদলে নগরসংকীর্ত্তন করিতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সংকীর্ত্তন মধ্যস্থিত নিত্যানন্দের মস্তকে মাধাই কলসীর মুটকী প্রহার করিয়াছিল। নিত্যানন্দ তাহাতে কোপ করা দূরে থাকুক, ক্রুদ্ধ গৌরচন্দ্রকে সান্ত্বনা করিয়া পাপীদিগকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে সংকীর্ত্তনের দল চলিয়া গেলে জগাই মাধাই অনু-তপ্ত হৃদয়ে বিশ্বম্ভরের আলয়ে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। তখন গৌরসুন্দর তাহাদিগকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া গঙ্গাজল ও তুলসী সংযোগে তাহা-দিগের পাপ উৎসর্গ করাইয়া নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাপী দুইজন নবজীবন লাভ করিল। পাপের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইল; পুণ্য প্রেমভক্তির জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং জগতের সকল পাপীর নিকটে আশাপ্রদ সুমঙ্গল সমাচার প্রচারিত হইল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।
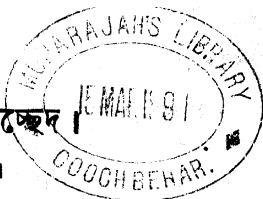
শ্রীবাস মন্দিরে নিশাভাগে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইতেছে। নিজ-গণ ব্যতীত আর কাহারও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। কাহা-রও বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে একজন দুয়ার খুলিয়া দিয়া আবার তখনি রুদ্ধ করিতেছেন। আর বাহির হইতে কাহারও আসিবার প্রয়োজন হইলে, নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত করিলে বা পরিচয় দিলে কপাট মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। আজ গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনে নাচিতেছেন বটে; কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় তাঁহার উল্লাস মত্ততা হইতেছে না, এবং কীর্ত্তনও জমিতেছে না। গৌরচন্দ্র থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছেন "আজ কি জন্য আমার প্রেমোল্লাস হইতেছে না? গৃহমধ্যে কেহ কি লুকাইয়া আছে?"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ একে একে বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণ খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন খানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; শচীনন্দন আবার নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারেও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় তিনি বলিতে লাগিলেন "উঁ হুঁ! প্রাণে সুখ পাই না কেন? আজ কি কৃষ্ণ আমারে কৃপা করিবেন না?" প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তদল সকলেই চিন্তিত হইলেন, এবং মনে মনে করিতে লাগিলেন, হয় তো তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে।

যে গৃহে কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহার এক কোণে তণ্ডুলাদি রাখিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড ডোল ছিল। বিশ্বম্ভরের চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একেবারে সেই ডোলের নিকট যাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ও খুঁজিতে খুঁজিতে দেখেন যে, তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণী সেখানে লুকাইয়া রহিয়াছেন। শ্রীবাসের বৃদ্ধা শাশুড়ীর গৌরের নৃত্য দেখিতে বড় সাধ হইত; কিন্তু কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বেই পণ্ডিতজী বাড়ীর পরিবারদিগকে সাবধান করিয়া প্রকোষ্ঠান্তর করিতেন; সে জন্য এত দিন তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। আজ তিনি কৌশল করিয়া বেলা অপরাহ্ন হইতেই এই ডোলের পশ্চাতে লুকাইয়া ছিলেন। প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হইলে শ্রীবাসের দুঃখের অবধি থাকিত না; গৌরাঙ্গকে

সুখী করিবার জন্য তিনি আপন প্রাণকেও যৎসামান্য মনে করিতেন; সুতরাং বাড়ীর স্ত্রীপুত্রদিগকে একেবারে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রভুর নৃত্যকীর্ত্তনের সময় তাহাদের কর্তৃক কিঞ্চিন্মাত্রও উৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি তদ্দণ্ডেই জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তাই তিনি আজ স্বীয় শাশুড়ীর এই সামান্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আজ্ঞা দিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ীর কেশাকর্ষণ করিয়া বাহির করাইলেন।

গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধা মহিলা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত আছেন। বোধ হয়, কেবল কৌতুক করিবার অভিপ্রায়েই তিনি এইরূপে রহস্যভেদ করাইলেন। বুড়ীকে গুপ্তস্থান হইতে কেশাকৃষ্টা হইয়া বাহির হইতে দেখিয়া গৌরের আনন্দের সীমা নাই; তিনি উল্লসিত মনে কীর্ত্তনমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তদলও হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আর শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে কীর্ত্তনে নাচিতে লাগিলেন। তখন একটা মহা রঙ্গ রসের আন্দোলন উঠিয়া গেল।

বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা এই প্রস্তাবের অবান্তর ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌরের নৃত্যদর্শনে ও কীর্ত্তন শ্রবণে ভক্ত বিনা বহির্মুখ লোকের অধিকার নাই; তাই শ্রীবাসের শাশুড়ী এত করিয়াও পূর্ণকাম হইতে পারিল না।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর পরিচয় পাঠক মহাশয় জানেন। ইনি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া নবদ্বীপের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করেন। কিন্তু ইনি এক জন অকৈতব বৈষ্ণব, গৌরের ভক্তদলের এক জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং এমনই অন্তরঙ্গ যে, গৌরের নৃত্যের সকল অবস্থাতেই থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। আজ গৌরচন্দ্র ঈশ্বরভাবে বীরাসন করিয়া বসিয়া আছেন; ভক্তদল মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও ঝুলিটী স্কন্ধে লইয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাচিতেছেন, হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া বিবিধ রঙ্গভঙ্গী করিতেছেন। তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রু বহিয়া অনর্গল ধারে অশ্রুধারা পড়িতেছে, পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছে, এবং উল্লম্ফনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষার ঝুলি আন্দোলিত হইতেছে।

বিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারীকে স্নেহব্যঞ্জক স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, 'শুক্লাম্বর! এ দিকে এসো"। ব্রহ্মচারী নিকটে আসিলে গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তুমি

যুগে যুগে আমার দরিদ্র সেবক, সর্ব্বস্ব আমাকে সমর্পণ করিয়া ভিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ; কেমন তোমার মনে হয়? দ্বারিকার রাজপ্রাসাদে তুমি একবার গিয়াছিলে; আমি তোমার দত্ত ক্ষুদ খাইয়াছিলাম, আর লক্ষ্মী আমার হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আজ আমাকে আর চারিটী তণ্ডুল দাও; আর যদি না দাও আমি বল করিয়া কাড়িয়া লইব।” এই বলিয়া ঝুলির মধ্যে হস্ত দিয়া তিনি মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ব্যস্ততা সহ নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

“প্রভু! কর কি? ও তণ্ডুলে যে কত ক্ষুদ ও কোণ আছে? উহা কি তোমার যোগ্য?”

‘ভক্তের ক্ষুদই আমি ভালবাসি; অভক্তের অমৃতও ভাল লাগে না। ভক্তের জীবন পরমানন্দময়; তাঁহার ক্ষুদও আনন্দ মাথান; সে ক্ষুদ খাইতে আনন্দ হইবে না কেন? তুমি কি জাননা যে, তোমার হৃদয় আমার অভিন্ন; তুমি ভোজন করিলে আমার ভোজন হয়, তুমি পর্য্যটন করিলে আমার পর্য্যটনক্লেশ হয়। তুমি কি আমার পর যে তোমার ক্ষুদ খাইব না’?

শুক্লাম্বর কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন;—“আর না, ঢের হইয়াছে। এই অযোগ্য পাত্রে এত কৃপা কেন? আমি যে প্রেমভক্তিবিহীন অতি-কৃপা পাত্র।” গৌর উত্তর করিলেন ‘তুমি প্রেমভক্তিবিহীন, তো ভক্তিমান্ কে? তুমি নিশ্চয় জানিবে যে স্বর্গের অতুল প্রেমভক্তি তোমারই।” শুক্লাম্বরের বর শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

পাঠক মহাশয় দেখিয়াছেন যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবে মত্ত হইয়া আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় যোগে যুক্ত হইয়া ঈশ্বরভাবে বিভোর হইতেন, অথবা লীলাময়ের লীলাতরঙ্গে মগ্ন হইয়া থাকিতেন; যখন আমি, তুমি, আমার, তোমার, ইত্যাদি বিকল্প বুদ্ধি লোপ হইয়া কেবল এক সৎপদার্থে মন ডুবিয়া যাইত; তদীয় বন্ধুবর্গ কেবল তখনই তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবার ও ভগবানের প্রাপ্য ভক্তি সম্মান দেখাইবার সুযোগ পাইতেন। এ অবস্থা ভিন্ন অন্য সময়ে তিনি কিছুতেই আপনার প্রতি পূজা অথবা অযোগ্য সম্মান প্রদর্শন সহ্য করিতে পারিতেন না; যদি কাহাকেও তদ্রূপ আচরণ করিতে দেখিতে পাইতেন, অমনি, সমুচিত উপদেশের দ্বারা তাঁহার চৈতন্যোদয় করাইয়া দিতেন। গৌরচরিতের এই দুই ভাবকে বৈষ্ণবেরা বিভিন্ন

নামে অভিহিত করিয়াছেন; একটীর নাম ঐশ্বর্য্যভাব, দ্বিতীয়টীর নাম দাস্যভাব। কিন্তু তাঁহারা এই উভয়কেই গৌরের ঈশ্বরত্বের পরিচায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

গৌরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভাবাবেশ কালে তাঁহার ধর্ম্ম বন্ধুগণ ঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে তিনি মনে মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতেন এবং নানা সময়ে নানা প্রকারে বন্ধুদিগকে তাহা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু কে বা তাঁহার উপদেশ শুনে? এ বিষয়ে তাঁহার বয়স্যগণ এক প্রকার অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। গৌরের ধর্ম্ম-জীবনের অসামান্য প্রতিভাই যে তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাম্যাবস্থায় কোনরূপ অবিহিত আচরণ দেখিলে বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিত না। এ জন্য অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ কেবলই তাঁহার মহাভাবের অবস্থার সুযোগ খুঁজিতেন এবং চুরি করিয়া পদধূলি গ্রহণ, পদতলে মস্তক লুণ্ঠন, পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি করিয়া আপন আপন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতেন। অদ্বৈতই এইরূপ প্রেমিক দলের অগ্রণী জানিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক দিন কীর্ত্তনে নাচিতে নাচিতে কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন "আজ আমি নৃত্যে সুখ পাইতেছি না কেন? বোধ হয় কাহারও স্থানে আমার অপরাধ হইয়াছে; কেহ কি চুরি করিয়া আমার প্রতি অযথা আচরণ করিয়াছ বা আমার পদ-ধূলি লইয়াছ? যদি কেহ তাহা করিয়া থাক প্রকাশ করিয়া বল।"

সকলেই ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন এবং উত্তর দিতে সাহসী না হইয়া মৌনা-বলম্বন করিলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য সাহসে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া যোড়হস্তে বলিতে লাগিলেন:—'শুন প্রভু! সাক্ষাতে না পেলেই চুরি করিতে হয়। আমি চুরি করিয়া তোমার পদধূলি লইয়াছি, ইহাতে যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা কর। তোমার যাহাতে অসন্তোষ, তাহা আর কখন করিব না।'

এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিল না; তিনি ক্রোধ-ব্যঞ্জক স্বরে অদ্বৈতকে মিষ্ট ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

'আচার্য্য গোঁসাই! আপনার এ কি ব্যবহার? আপনি যে সংসার শুদ্ধ সংহার করিতে বসিয়াছেন? আমিই কেবল সংসারের অবশেষ আছি,

আমাকে সংহার করিতে পারিলেই বুঝি আপনার সুখ পূর্ণ হয়? যে আপনার নিকট কৃতার্থ হইতে আইসে, তাহার চরণে ধরিয়া বুঝি সংহার করাই আপনার ব্রত। নির্দ্দয়! আপনার কি মনে নাই পূর্ব্বে মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব আপনার কাছে ভক্তি শিক্ষার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল, আপনি তার কি দুর্দ্দশা করেছিলেন? তাহার চরণ ধূলি লইয়া তাহার চিরন্তনশক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্তিযোগ ছিল, ভগবান্ কৃপা করিয়া সবই তো আপনাকে দিয়াছেন। তথাপিও আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের উপর অত্যাচার কেন? আমাকে কি সংহার করিবেন? আপনি চোরের বড় চোর, মহা ডাকাইত! আপনিই আমার প্রেমসুখ চুরি করিয়াছেন।'

শ্রীগৌরাঙ্গের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, "আপনি এক জন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ বৈষ্ণব, মহাভক্ত এবং কৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপাত্র। আপনার এ কোন্ ব্যবহার যে সামান্য ভক্তিপ্রার্থী আপনার নিকট ভক্তিলাভ জন্য আসিলে অযথা বিনয়ে তাহাকে পূজা করেন? তাহাতে তাহার ভক্তিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, আপনার স্থানে অপরাধ হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।" কিন্তু বৈষ্ণবেরা অদ্বৈতকে সংহারকর্ত্তা রুদ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাই বৃন্দাবন দাস মহাশয় বিশেষ নিপুণতা সহকারে কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে যে কেবল দ্ব্যর্থ আছে তাহা নহে; এক 'সংহার' শব্দ বিভিন্নার্থে প্রযুক্ত হইয়া ভাব-বৈচিত্র্যের সুকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, বিশ্বম্ভর অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি অদ্বৈতকে বলিলেন,—'তুমি আমার প্রেম চুরি করিয়াছ; আমি কি পারিনে? এই দেখ চোরের উপর বাটপাড়ীকরি'।

যে কথা সেই কাজ; গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতের চরণ যুগল ধরিয়া বল পূর্ব্বক আপন মস্তকে লইয়া ঘসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিতে লেপিতে বলিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! দেখ দশ দিন চোরের, এক দিন সাধুর। আজ চোর ধরিয়াছি, অল্পে ছাড়িব না; পূর্ব্বাপহৃত সকলই আদায় করিয়া লইব।"

অদ্বৈত গৌরের সহিত বলে না পারিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! ছাড়; তোমার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করা কাহার সাধ্য? তুমি যাহার শাস্তি দাও,

কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। আমার এ প্রাণ মন দেহ সকলই তোমার, বিনা অপরাধে আমাকে কেন অপরাধী করিয়া নষ্ট করিতেছ ?”

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন “এমন কথা মুখে আনিবেন না ; আপনি ভক্তির ভাণ্ডারী ও সকলের গুরু ; ভক্তিলাভ জন্য আপনার সেবা করিতেছি। আপনার চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে কৃষ্ণপ্রেমরসসাগরে ভাসিতে পারা যায়। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি ভক্তি না দিলে আমাদের উহা পাইবার উপায় নাই।”

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিলে দর্শকমণ্ডলী মনে করিলেন “অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা, আর আমরা ধন্য যে এইরূপ ভক্তের উপদেশ লাভ করিতেছি।” যে উদ্দেশে বিশ্বম্ভর এই কার্য্য করিয়াছিলেন, ভক্তগণের অন্ধবিশ্বাসে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। গৌরাঙ্গ আপনার সামান্যত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই আচরণ দেখাইলেন ; ভক্তগণ তাহা অসামান্যত্বে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিল। এই রূপেই ধর্ম্ম জগতের কুসুমকাননে কুসংস্কার কণ্টকলতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

নিত্যানন্দের সমভিব্যাহারে শচীনন্দন মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ন সময়ে নগর ভ্রমণে যাইতেন। এক দিন ভ্রমণ সময়ে এক দল পাষণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের এক জন বলিল “ওহে নিমাই পণ্ডিত! ভাই তোমার একটা অমঙ্গল সংবাদ শুনিলাম ; তাই বন্ধুভাবে তোমাকে জানাইতে যাইতেছিলাম। তুমি রাত্রিতে গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন না কি কর ? লোকেরা বাড়ীর মধ্যে যাইতে না পারিয়া তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়াছে ; শুনিলাম দেওয়ান হইতে তোমাকে ধরিবার জন্য পাইক আসিতেছে।” গৌর হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, “অনেক দিন হইতে আমারও রাজদর্শন করিতে ইচ্ছা আছে ; এত পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্রাদি পড়িলাম, বালক জ্ঞানে কেহ তাহার আদর করে না ; রাজসমীপে বিদ্যালোচনা করিতে পাইলে আমার বিদ্যার পুরস্কার হইতে পারিবে।”

পাষণ্ডী বলিল—“রাজা যবন, তোমার বিদ্যাচর্চ্চা শুনিবে না, তোমার কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিতে রাজদূত আসিবে।”

“আচ্ছা ! দেখা যাইবে” অবজ্ঞার সহিত এই কথা বলিয়া বিশ্বম্ভর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রিকালে যথা সময়ে শ্রীবাসগৃহে ভক্তগণ একত্রিত হইলে গৌরচন্দ্র বলিলেন, “আজ নগরে পাষণ্ডীসম্ভাষ হইয়াছে ; ভাল করিয়া

কীর্ত্তন কর, হৃদয়ের অবসাদ ঘুচিয়া যাউক।" কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে বিশ্বম্ভর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আজ আমার হরিনামে প্রেম হইতেছে না কেন? পাষণ্ডীসম্ভাষা হইয়াছে বলে? না তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া? যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অপরাধ হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর।"

অদ্বৈতাচার্য্য এক দিকে নৃত্য করিতেছিলেন, তিনি পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, "প্রেম আর কোথা পাবে? তোমার সব প্রেম যে অদ্বৈত শুষিয়া লইয়াছে?" তাহার পর একটু অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"এখন আর শ্রীবাস, অদ্বৈত কোথায় প্রেম পাইবে? এখন যে তিলি মালীর সঙ্গে বাজারে বাজারে প্রেমের বিলাস হচ্চে; আর অবধূত প্রেমের ভাণ্ডারী হয়েছে। দেখ প্রভু! যদি সত্য সত্যই আমাদের প্রেমযোগে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার সব প্রেম শুষিয়া লইব।"

গৌরচন্দ্র কাহারও কোন অযথাচরণ দেখিতে পারিতেন না। অদ্বৈতের এই স্বার্থ ও হিংসাপূর্ণ বাক্যে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিল না। সভাস্থ সকলেই এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। গৌরচন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে দ্বারমুক্ত করিয়া বেগে দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার হৃদয়ের গভীরভাব বুঝিতে পারিয়া পাছে পাছে দৌড়িয়া চলিলেন; কিন্তু তাঁহারা যাইবার পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর "প্রেমশূন্য দেহ রাখিয়া কি কাজ?" বলিয়া গঙ্গার জলস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন। নিত্যানন্দ, হরিদাস পাছে আসিতে আসিতে শব্দ শুনিয়া সেই খানে লম্ফ দিয়া পড়িলেন ও নিতাই তাঁহার দীর্ঘ কেশ ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, আর হরিদাস সাঁতার দিতে দিতে চরণ যুগল ধরিয়া স্কন্ধে করিয়া লইলেন। সৌভাগ্য, ক্রমে কোন অত্যাহিত হইল না। অন্ধকার রজনী, সে জন্য বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না। যখন দুই জন তাঁহাকে তীরে তুলিলেন, তখন গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন:—'তোমরা আমাকে তুলিলে কেন? প্রেমহীন জীবন রাখার ফল কি?' নিতাই উত্তর করিলেন:—"মরিবে কেন?"

গৌর। তুমি পরম উদার, সদাই হরিপ্রেমে বিহ্বল; তাই এরূপ বল্‌ছো।

নিতাই। প্রভু ক্ষমা কর; যাহাদের অপরাধের সকল শাস্তিই দিতে

পায়, তাদের একটা কথার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়া কি শোভা পায়? অদ্বৈত না হয় অভিমান করিয়া দুকথা বলেছেন, তা বলে কি এরূপ কাজ করা উচিত? তুমি মরিলে কি তিনি বাঁচিবেন? অসময়ে এই প্রেমের হাট ভেঙ্গে দিলে যে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

গৌরাঙ্গ মনে মনে নিত্যানন্দের উদার প্রেমের শত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "নিত্যানন্দ! হরিদাস! তোমরা আমার পরম বন্ধু; তোমাদের কথা আমি কখন অন্যথা করিতে পারি না। কিন্তু তোমাদিগকে আমার এই অনুরোধ যে, আজকার বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পাইবে না; আমার সঙ্গে যে তোমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এ কথাও যেন অদ্বৈত প্রভৃতি জানিতে না পারেন; আর তোমরা এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান কর, আমি আজ এইখানে কাহারও বাড়ীতে রজনী যাপন করিব।"

নিত্যানন্দ হরিদাস অগত্যা এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে বিশ্বম্ভর ধীরে ধীরে নিকটস্থ নন্দন আচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। আচার্য্য গৌরের ভক্তদলভুক্ত; তাঁহাকে আর্দ্রবস্ত্রে উপস্থিত দেখিয়া অতি ব্যস্তে বস্ত্রত্যাগ করাইলেন এবং সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। সমস্ত রাত্রি গৌরচন্দ্র নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে কৃষ্ণকথা রস-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে শ্রীবাসের গৃহে ভক্তদলমধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। অদ্বৈতাচার্য্য দুঃখে, অনুতাপে বড়ই অপ্রতিভ হইয়া গৃহে যাইয়া অনশনে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তদল অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরের দেখা না পাইয়া শোকে বিমর্ষে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন মতে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতেঃ গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব রাত্রির অনুষ্ঠিত স্বীয় বিকর্ম্ম স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং অল্প কারণে অদ্বৈতের মনে কষ্ট দিয়াছেন মনে করিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হইয়া নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন "তুমি গোপনে একা শ্রীবাস পণ্ডিতকে এখানে ডাকিয়া লইয়া আইস।" কিছুকাল পরে নন্দন পণ্ডিতজীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলে শ্রীবাস গৌরচন্দ্রের দর্শনমাত্র কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "রোদনের প্রয়োজন নাই, আচার্য্য কেমন আছেন বল।"

"আরও আচার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা কর? তিনি কাল হইতে উপবাসী থাকিয়া কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছেন, তাহা বর্ণনাতীত। শুধু আচার্য্য

কেন? ভক্তগণ সকলেই শোকসাগরে মগ্ন। তুমি যে সকলের প্রাণ, তাও কি জান না? তোমাকে ছাড়িয়া কি জীবিত থাকা যায়?”

“আচ্ছা তবে চল আচার্য্যের ওখানে যাইয়া মিলজুল করা যাক্।”

অতঃপর তিন জন অদ্বৈতভবনে যাইয়া দেখেন যে, আচার্য্য শয়নকক্ষে শায়িত; আপনাকে মহা অপরাধী জ্ঞানে মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। গৌরচন্দ্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, “আচার্য্য! উঠিয়া দেখুন বিশ্বম্ভর অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাহিতেছে।” অদ্বৈত প্রথমতঃ লজ্জায় কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না; গৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ডাকিলে উত্তর করিলেন, “আমি আর কি বলিব প্রভু? আমার কি আর কথা কহিবার মুখ আছে?”

গৌর। “গত ব্যাপার সব ভুলিয়া যান্; উঠিয়া নিত্যকৃত্য সমাধান করুন্ এবং সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করুন্।”

অদ্বৈত্য। “আমার এই পাপমতি বিশুদ্ধ না হইলে আর কিছুই করিব না। তুমি প্রভু! আর আর সকলকে কেমন দাস্যভাব দিয়েছ; আর যত কুমতি, অহঙ্কার, রাগ আমার ভাগ্যে দিয়েছিলে; যাহা কিছু মন্দ, তাই আমার কাজ! তা তুমি যখন এই সব কুপ্রবৃত্তি দিয়া কুকার্য্যে মন লওয়াও, তাহার সমুচিত দণ্ড না দিলে উদ্ধার হইব কেন? আর সে দণ্ড বহন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেই বা চলিবে কেন? আমি সত্য বলিতেছি এই দেহ, মন প্রাণ, ধন সকলই তোমার। এ সব লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার। তবে আমার প্রার্থনা এই যে, আমাকে দাস্যভাব দিয়া দাসীপুত্র করিয়া চরণে স্থান দাও।”

গৌর। ‘আমাকে আপনি এরূপ কেন বলিতেছেন? এক কৃষ্ণই মহারাজ রাজেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের সকলই তাঁহার শাসনাধীন; ব্রহ্মা, শিব, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য; তিনি যাহাকে যাহা করিতে শক্তি দিয়াছেন, সে তাহাই করিতে পারে। শুভ কর্ম্মের পুরস্কর্ত্তাও তিনি, মন্দ কর্ম্মের দণ্ডদাতাও তিনি। কিন্তু তাঁহার দণ্ড জীবের মঙ্গল উদ্দেশেই হইয়া থাকে। আমি মনে করি, তাঁহার প্রসাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি অধিক সৌভাগ্যশালী। দণ্ড না পাইলে মোহমুগ্ধ জীবের প্রভুর আজ্ঞা পালনে ইচ্ছা হয় না; মঙ্গলের দিকে চেতনা হয় না। কোন দণ্ড না লইয়াই বা তাঁহার কোন্ দাস জগতে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে

পারিয়াছেন? যাঁহারা তাঁহার প্রিয় ভৃত্য, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া কেবল তাঁহাদেরই দণ্ড দিয়া থাকেন; দণ্ড তাঁহাদের নিকট প্রসাদ। দাস ভিন্ন এই মহা প্রসাদ অন্যের পাইবার অধিকার নাই।

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে,
জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিনু তোমারে।"

বিশ্বম্ভরের এই সার গর্ভ উপদেশ শ্রবণে অদ্বৈতের বিমর্ষ ভাব চলিয়া গেল, হৃদয় হঠাৎ উৎসাহে পূর্ণ হইল। এবং তিনি এক লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে ভূমিতে নামিয়া হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে উপরোক্ত মহাবাক্য আবৃত্তি করিতে লাগিলেন:—

"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে,
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে।"

অদ্বৈত তখন উৎসাহপূর্ণবাক্যে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ! সুসমাচার শ্রবণ কর, তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলে যে, কৃষ্ণ কেবল পাপীরই দণ্ড দাতা; তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ যে তাঁহার দণ্ডার্হ, তাহা আর কখন শুন নাই। তোমরা এখন বুঝিতে পারিলে যে দণ্ড মহাপ্রসাদ। যখন আমরা দণ্ড পাইব, তখনই সৌভাগ্যশালী কৃষ্ণদাস মনে করিব। আর চিন্তা কি? পাষণ্ডীদিগেরই বা ভয় কি? আমরা যখন দণ্ড প্রসাদ পাইয়াছি, তখন আমাদের ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? বন্ধুগণ! এস গগন মেদিনী পূর্ণ করিয়া আজ সিংহরবে হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব নাট্য-রঙ্গ।

একদিন বৈষ্ণব সভায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচার করিয়া দিলেন "আজ বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া খুব ঘটা করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে হইবে; আমি রুক্মিণী ও আদ্যাশক্তির বেশে নৃত্য করিব; নিত্যানন্দ আমার বড়াই সাজিবেন। গদাধর গোপিকা হইবেন, ব্রহ্মানন্দ সুপ্রভা নামে তাঁহার সখী সাজিবেন; এবং ভক্তগণকে যথোপযুক্ত সাজ সাজিতে হইবে।" গৌরের এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না, সভামধ্যে

আনন্দ পূর্ণ কোলাহল হইতে লাগিল এবং সকলেই নূতন উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া আপন আপন সাজের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আমি কি সাজিব?"

"তুমি বৈকুণ্ঠের কোটাল।"

শ্রীবাস বলিলেন "আমার সাজটা কি?"

"তুমি দেবর্ষি নারদ।"

অদ্বৈত অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "আপনারই তো সব, যখন যে সাজ পরিতে ইচ্ছা হইবে, তাই পরিবেন।"

অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাই; বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া তখন ভ্রূকুটি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন; এবং মহা বিদূষকের ন্যায় পরিহাসজনক অসম্বদ্ধ কথা কহিতে লাগিলেন, শুনিয়া বৈষ্ণবদলের মধ্যে হাসির তরঙ্গ উঠিয়া গেল। শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শ্রীমান্ পণ্ডিত সভার এক প্রান্তে বসিয়া ছিলেন; একে একে যখন সকলেরই সাজের কথা শেষ হইয়া গেল, অথচ কেহই তাঁহার নাম করিল না; তিনি হর্ষবিষাদে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমি আর কি সাজিব? আপনারা সকলে সাজিয়া গুজিয়া নাচিবেন, আমি হাড়ীর মত মশালজী হইয়া আপনাদের মশাল ধরিব।"

এই কথায় একটা মহা হাসির প্রবাহ উঠিয়া পড়িল।

তখন বিশ্বম্ভর একটু গম্ভীরভাবে কার্য্য প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দলের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান্ ধনাঢ্য ও গণ্যমান্যব্যক্তি; তাঁহার দিকে তাকাইয়া গৌর বলিলেন "আপনাকে এই ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করিতে হইবে, শঙ্খ, কাঁচুলি, পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারাদি বেশভূষা, যাহা লাগিবে, সে সমুদায়ের আপনি সরবরাহ করিবেন; চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বৃহৎ প্রাঙ্গণে রঙ্গভূমি হইবে; সেখানে দশ বারটী চন্দ্রাতপ খাটাইয়া একটী পটমণ্ডপ করিতে হইবে এবং অভ্যাগতদিগের আসনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আর আমাদিগের দলস্থ বৈষ্ণবদিগের পরিবারের মহিলাদিগকে দর্শন শ্রবণ জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে; তাঁহাদিগের বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থান যবনিকাচ্ছাদন দিয়া রাখিতে হইবে। আপনার সাহায্যের জন্য যাঁহাকে যাঁহাকে প্রয়োজন, লইয়া সত্বরেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।" বুদ্ধিমন্ত খান, সদাশিব প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যোদ্যোগে যাত্রা

করিলেন। তখন গৌরচন্দ্র মুকুন্দ দত্তকে বলিলেন "সংকীর্ত্তন, গান, বাজনার ভার তোমার উপর থাকিল; যে প্রকারে তাহা সুসম্পন্ন হয়, তাহার দায় তোমার।" এই বলিয়া যে যে ভাবের যেমন যেমন গান করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিলেন। অপরাহ্নে বৈষ্ণবগণ চন্দ্রশেখরের গৃহে একত্রিত হইলে বুদ্ধিমন্ত খান গৌরচন্দ্রকে লইয়া রঙ্গস্থল, সাজঘর, সাজসজ্জা, ও বসিবার স্থানাদি একে একে সকল দেখাইলে, তিনি সকল কার্য্যের অতি সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সকল ঠিক্ ঠাক্ হইলে গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী মধ্যে বলিলেন, 'কিন্তু একটা কথা আছে; জিতেন্দ্রিয় ভিন্ন এই অভিনয় দেখিতে কাহারও অধিকার নাই। যাহারা ইন্দ্রিয় ধারণে অসমর্থ, এবং রমণীয় রমণী মূর্ত্তির লাবণ্যকলা, হাব ভাব কটাক্ষ, এবং নৃত্যগীত দর্শনে যাহাদের মনে কুভাব উত্তেজিত করে; অদ্যকার রঙ্গস্থলে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই।'

নূতন বিধানে নূতন রঙ্গ হইবে শুনিয়া বৈষ্ণবদলের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল; কিন্তু এই কথা শুনিয়া এখন সকলেই বিষণ্ণভাবে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি অজিতেন্দ্রিয়; এ রঙ্গ দর্শনসুখ তবে আমার কপালে নাই।' অদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে একটী রেখা টানিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তবে আমার নৃত্য দর্শনে কাজ নাই, আমি তো ইন্দ্রিয় ধারণে সমর্থ নই।'

শ্রীবাস বলিলেন 'আমারও ঐ কথা।' তখন আর আর বৈষ্ণবেরাও বলিয়া উঠিলেন, 'আমাদেরও ঐ কথা।'

গৌরচন্দ্র তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন "তোমরা না গেলে কাহাকে লইয়া নৃত্য? তোমাদের লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হয় নাই; বহির্মুখ লোকদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তোমরা মহা যোগেশ্বর, তোমাদের কেন মোহ হইবে?" গৌরের এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। এ দিকে সন্ধ্যা হইলে সকলে রঙ্গস্থলে সমাগত হইলেন; গৌরের সংকীর্ত্তনদলের পূর্ণশক্তি আজ উপস্থিত; লোকে পটমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গেল। শচী মাতা বধূ সঙ্গে, মালিনী দেবী মাতা ও জাতাদিগকে লইয়া, সীতা ঠাকুরাণী পরিজনদিগের সমভিব্যাহারে একে একে আসিয়া যবনিকার অন্তরালে বসিলেন; এবং আর আর বৈষ্ণবমহিলাগণও আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের পত্নী তাঁহাদের যথাযোগ্য

সমাদর করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি আচার্য্যের গৃহদেবতা গোপীনাথ-বিগ্রহকে সাজাইয়া সিংহাসনে বার দিয়া বসান হইল। প্রথমে বন্দনা সংকীর্ত্তনের পর নাট্য আরম্ভ হইল। পালাটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম প্রহরের নাট্য ও দ্বিতীয় প্রহরের নাট্য। পাঠক মহাশয় মনে করিতে পারেন যেন একখানি নাটকের দুইটী অঙ্ক। বন্দনা-সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে রঙ্গস্থল নীরব, সকলেই সাজঘরের দিকে তাকাইয়া পাত্র সন্নিবেশের অপেক্ষা করিতেছেন; অদ্বৈতাচার্য্য বহির্ভাগে দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঝম্প দিয়া নাচিতে নাচিতে কত মত মুখভঙ্গি করিতে লাগিলেন। তাহাতে দর্শকমণ্ডলী হাসিয়া অস্থির হইল, এবং সকলেই আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে হাস্যতরঙ্গ তিরোহিত হইলে হরিদাস ঠাকুর মুরারি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া কোটালবেশে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। কৃত্রিম মহা গোঁপ ওষ্ঠোপরি বিরাজ করিতেছে, মস্তকে একটী বৃহৎ পাগড়ী, পরিধেয় মালকোচামারা ধটী, এবং হস্তে এক গাছি স্থূল বৃহৎ যষ্টি শোভা পাইতেছে।

প্রবিষ্ট হইয়াই হরিদাস চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আরে ভাই! সাবধান! আজ জগৎপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মী-বেশে নাচিবেন; তোমরা সাবধানে রিপু সংযম কর; আর কৃষ্ণ বলে জেগে থাক।"

হরিদাসের বেশ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী হাসিতে লাগিলেন। একজন উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কে? এখানে কি জন্য?" হরিদাস দুই হাতে গোঁপ মুচড়াইতে মুচড়াইতে উত্তর করিলেন:—"আমাকে চেন না? আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল; চিরকাল লোক জাগাইয়া বেড়ান আমার কাজ। ভগবান্ সম্প্রতি প্রেমভক্তি লুটাইতে আসিতেছেন; আজি মহালক্ষ্মীর নৃত্য হইবে। তোমরা সব সাবধান পূর্ব্বক ভক্তিভাণ্ডার লুট কর।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিতে বলিতে তিনি রঙ্গভূমি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত দেবর্ষি নারদের বেশে সভাস্থলে উপনীত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তিলক, মালা শোভা পাইতেছে; আবক্ষলম্বিত দীর্ঘপক্ক শ্মশ্রুতে মুখমণ্ডল সজ্জিত; স্কন্ধে বীণা লম্বিত এবং হস্তে কুশাবলি। রামাই পণ্ডিত কক্ষে আসন ও হাতে কমণ্ডলু ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ ভৃত্য বেশে আসিলেন। সভামধ্যে আসিয়া রামাই আসন বিস্তার করিলে দেবর্ষি তদুপরি সমাসীন হইলেন।

শ্রীবাসের নারদবেশ দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন মহাগম্ভীর ভাবে দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আপনি কে ? এখানে কি নিমিত্ত আসিলেন ?"

নারদবেশী শ্রীবাস উত্তর করিলেন, "আমি কৃষ্ণের গায়ক, নারদ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই আমার গতিবিধি, হরিনামগান করিয়া সকলকে শুনাইয়া থাকি। সম্প্রতি আমি বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম, সেখানে শুনিলাম যে কৃষ্ণ এখন নদীয়া নগরে আসিয়াছেন। তাই অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলাম।"

অদ্বৈত। আমাদের একটা হরিনাম শুনান না কেন ?

তখন শ্রীবাস বীণাঝঙ্কার দিয়া অতি মধুর স্বরে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিকের ঐকান্তিকতামিশ্রিত সংগীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ফলতঃ নারদের সাজটী শ্রীবাসকে এমনি সুন্দর মানাইয়াছিল যে, তাঁহার রূপ দেখিয়া, কথা শুনিয়া এবং প্রয়োগ-পটুতা লক্ষ্য করিয়া কেহই তাঁহাকে দেবর্ষি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ভাবিতে পারেন নাই। মহিলামহলে পণ্ডিতের ভাবদর্শনে মহা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। সকলেই মালিনী দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিলেন। শচীমাতা সোজা সরলমতি ; তিনি আস্তে আস্তে মালিনীর নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "ও বউ! এই কি পণ্ডিত ?"

মালিনী মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিলেন, "লোকে তাই ত বলিতেছে।"

এদিকে রুক্মিণীর ভাবে বিভোর হইয়া ও রুক্মিণীর বেশধারণ করিয়া শচীনন্দন আস্তে আস্তে রঙ্গস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন ; তাঁহার সঙ্গে সুনন্দ নামে ব্রাহ্মণ অল্প দূরে দণ্ডায়মান। বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মকের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রুক্মী ও কন্যার নাম রুক্মিণী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে দর্শন করিয়া ও তাঁহার রূপ, গুণ, শৌর্য্য, বীর্য্যের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী অনেক দিন হইতে তাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। রাজা ভীষ্মক পরম্পর কন্যার এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঐ বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমার রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের এক জন পরম বিদ্বেষী। তিনি নানা প্রকারে

পিতার মত পরিবর্ত্তন করিয়া দামুঘোষের পুত্র শিশুপালের সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং বিবাহের দিন সুস্থির করিয়া মহা সমারোহে তাহার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ব্যাপারে বিদর্ভদুহিতার পরিতাপের অবধি থাকিল না। তিনি কৃষ্ণানুরাগে অনুরাগিণী হইয়া প্রাণমন সকলই কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছেন; সুতরাং দামুঘোষের পুত্রকে বিবাহ করিতে হইবে শুনিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল; নয়ন দিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল; এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহার চিন্তায় দিনযামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। রাজপুরীতে এমন কেহ নাই যে, তাঁহার সহিত সহানুভূতি করে বা তাঁহাকে সৎপরামর্শ দেয়। অবশেষে বালিকা এক দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। সুনন্দ নামে একজন বৃদ্ধ পরিচিত ব্রাহ্মণ বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন; তাঁহাকেই তিনি গোপনে আপন শয়নকক্ষে ডাকাইয়া সমস্ত অবগত করিয়া স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত দ্বারিকায় পাঠাইলেন। এই শয়নকক্ষের দৃশ্য নাটকে দেখাইবার জন্য শচীনন্দন রঙ্গস্থলে উপনীত। গৌর যখন যাহা করিতেন, তাহার সহিত একেবারে মনপ্রাণে মিশিয়া যাইতেন; সুতরাং তাঁহার অভিনয়ে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই। তিনি সত্য সত্যই আপনাকে বিদর্ভদুহিতা জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইয়া উঠিলেন। এবং ভাগবতের যে সাতটী শ্লোকে রুক্মিণীর পত্র বর্ণিত আছে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারই ভাবে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"হে ভুবন সুন্দর! তোমার সুশীতল গুণের কথা শ্রবণবিবর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলে, কাহার প্রাণ না পরিতৃপ্ত হয়? তোমার রূপ দর্শনে কোন্ নিধি না লাভ হয়? বিধাতা যাহাকে চক্ষুঃ দিয়াছেন, সে চিরদিন উহা দেখুক। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তোমার রূপ গুণের কথা শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হে মুকুন্দ! তুমি কি আমাকে নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিবে? না—তা তুমি পার না। বুদ্ধিমতী কন্যারা কি তোমাকে পতিত্বে বরণ না করিয়া থাকিতে পারে? হে বীর! আমি প্রাণমন সকলই তোমাতে অর্পণ করিয়া তোমার বস্তু হইয়াছি; নিজ বস্তু গ্রহণ কর। দেখো যেন চেদিরাজ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। সিংহের বস্তু কি শৃগালে লইবে? হে

অজিত! কল্য বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তুমি শীঘ্র আসিয়া বিপক্ষের সৈন্যনাশ করিয়া ভবানীর মন্দির হইতে আমাকে হরণ করিয়া রাক্ষস বিধানে বিবাহ কর। উমাপতি প্রভৃতি দেবগণ তোমার চরণ রজে স্নান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। ঐ পদধূলি দিয়া যদি দাসীকে এ সঙ্কটে রক্ষা না কর; তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, উপবাসাদি দ্বারা আমার এই শরীর কৃশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তাহাতে এক জন্মে না পাই, বহু জন্মেও তো তোমাকে পাইতে পারিব।" শচীনন্দন সজল নয়নে পত্রখানি পাঠ করিয়া সুনন্দের হাতে দিয়া মৃদু মন্দ স্বরে তাহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া দুঃখিনীর এই কথাগুলি জানাও।"

গৌরচন্দ্র নীরব হইলেন, চারিদিকে উল্লাসের সহিত হরিধ্বনি হইতে লাগিল; যবনিকার অন্তরাল হইতে পুরন্ধ্রীরা শঙ্খ নিনাদ করিতে লাগিলেন; মৃদঙ্গ করতাল যোগে মুকুন্দের দল সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিল; শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ বেশে নাচিতে লাগিলেন; হরিদাস কোটাল বেশে 'জাগো! জাগো!' করিয়া উঠিলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রথম প্রহরের নাট্য শেষ হইয়া গেল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর দ্বিতীয় প্রহরের নাট্য আরম্ভ হইল। এবারে মাধবনন্দন গদাধর পরম সুন্দরী গোপীবেশে রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ সুপ্রভা সখী সাজিয়া আসিয়াছেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রহরের পাত্রগণ আপন আপন বেশে শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে আসীন; কেবল নিতাই গৌর সভাস্থলে নাই। রমণীদ্বয় রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? এত রাত্রে এখানে যুবতী স্ত্রীলোক কেন?"

সুপ্রভাবেশী ব্রহ্মানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "রামচন্দ্র খানের আদেশে তোমার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসিয়াছি।" এই কথায় একটা হাস্য তরঙ্গ উঠিয়া গেল।

হরিদাস গম্ভীর স্বরে পুনরায় বলিলেন, "কে তোমরা বল?"

"আমরা বৃন্দাবনের আহীর নন্দিনী।"

"কোথায় যাইতেছ?"

"মথুরায়।"

শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোকুলের কাহার বনিতা?"

উত্তর—"সে কথায় তোমার কাজ কি?"

"জানিবার প্রয়োজন আছে।"

ব্রহ্মানন্দ শ্রীবাসের কথা পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, "জানিবার প্রয়োজন থাকিলেও আমরা তোমার কথার উত্তর দিব না।"

গঙ্গাদাস পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ রাত্রিতে থাকিবে কোথায়?"

"কেন তোমার বাড়ীতে?"

গঙ্গাদাস। 'স্ত্রীলোকটা বাচাল দেখ! দূর দূর।'

ইত্যবসরে অদ্বৈতাচার্য্য উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা কি বাক্‌চাতুরী করিতেছ? পরনারী মাতৃসমা, ইহাদের সঙ্গে কলহ করা ভাল দেখায় না।" এই বলিয়া রমণীদ্বয়কে বলিলেন, "ওগো বাছারা! তোমরা কি নৃত্যগীত করিতে জান? আমার বোধ হচ্ছে তোমরা সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদা।"

সুপ্রভা। কিসে আপনার বোধ হলো?

অদ্বৈত। এই রকম সকমে।

সুপ্রভা। আপনার তো খুব নাড়ীজ্ঞান দেখ্‌ছি?

অদ্বৈত। কম দেখ্‌লে কিসে?

সুপ্রভা। গৃহস্থের মেয়েকে নাচ্‌তে গাইতে বল্‌ছ, তাইতে?

অদ্বৈত। তোমরা গোপকন্যা। গোপীগণের মধ্যে হরিগুণ গান না করিতে পারেন, এমন কাহাকেও দেখি না। কেন মহারাসের রজনীর কথা কি মনে নাই?

গদাধর গোপীবেশে এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এখন বলিলেন 'মহাশয়! কৃষ্ণ ভিন্ন তো আমাদের নাচ গান হয় না। কৃষ্ণ কই যে নাচিব গা'য়িব?'

অদ্বৈত। কৃষ্ণ এইখানেই আছেন; তোমরা নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়া দিলেই তাঁর আবির্ভাব হইবে।

এবার রমণীদ্বয়ের আর কথা বলিবার যো নাই। আচ্ছা বলিয়া তাঁহারা মৃদু মন্দ কণ্ঠ ধ্বনিতে সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন; মুকুন্দ দত্তও আপনার কলকণ্ঠ তাঁদের স্বরের সহিত মিশাইয়া দিলেন। তখন মৃদঙ্গ মন্দিরা তাড়িত মনোহর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে মধুর সঙ্গীতলহরী নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল; শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্পন্দ বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। গদাধর রাধিকা আবেশে বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত সঙ্গীত ধানশীরাগে গাইতে লাগিলেন।

"সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়?
সোই পিরীতিঅনুভব বাখানিতে অনুক্ষণ নৌতুন হোয়।

জনম অবধি হাম্, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল;
লাখ লাখ যুগ হাম্, হিয়া হিয়ে রাখিনু,
হৃদয় না জুড়ন গেল।
বচন অমিয়া রস, অনুক্ষণ শুননু;
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি;
কত মধুযামিনী, রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝনু কৈছন কেলি।"

গাইতে গাইতে গদাধরের অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের উদয় হইল; নয়নযুগল দিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তখন তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়া আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া আবার গাইতে লাগিলেনঃ—

"বঁধু কি আর বলিব আমি?
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি;
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী।"

রাধিকারূপিণী গদাধর দিশাহারা হইয়া এই নিবেদন গাইতে গাইতে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুগঠিত অঙ্গ গুলি যখন মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইতে লাগিল; শ্রীরাধিকার মত শ্যামবঁধুর রূপদর্শনে যখন তাঁহার অধর ওষ্ঠ অর্দ্ধ বিকশিত কুন্দ কুসুমের ন্যায় হাসি বিস্ফারিত হইল; নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল; রোমাবলি কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তখন যে এক স্বর্গের ভাব আবির্ভূত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া শুনিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। এই ভাব দেখিয়া গৌর বলিলেন যে, সত্য সত্যই গদাধর শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠস্থ

পরিবারের প্রধানা প্রকৃতি। যাহা হউক, অনেকক্ষণ পরে মাধব নন্দনের নৃত্যাবসান হইলে গৌরচন্দ্র আদ্যাশক্তির রূপ ধারণ করিয়া বৃদ্ধা বড়াই-রূপিণী নিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়া রঙ্গে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কথিত আছে যে, গৌর এরূপ চমৎকার সাজ সাজিয়া ছিলেন যে, তাঁহার পরমাত্মীয়, এমন কি জননী পর্য্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। নিত্যানন্দ বড়াই সাজে অঙ্গ বঙ্ক করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মহাপ্রভুর আগে আগে আসিতেছিলেন বলিয়াই সকলে গৌরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ; নইলে সাজ দেখিয়া কাহারও চিনিবার যো ছিল না। গৌরের ভাব দর্শনে কোন্ শক্তি অবতীর্ণা হইলেন, বুঝিতে না পারিয়া নানা জনে নানা রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন 'একি সিন্ধুকন্যা কমলা আসিলেন ? না রামগৃহিণী জানকী ? আর একজন বলিলেন, 'বোধ করি হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতী।' তৃতীয়ব্যক্তি বলিলেন, 'না ; আমার বোধ হয় বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই।' আর এক জন কহিলেন 'আমার বোধ হয় ইনি মহা-যোগেশ্বরী।' অবশেষে কতক লোক বলিলেন 'স্বয়ং ভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া অবতীর্ণা হইয়াছেন।'

গৌরচন্দ্র তখন বিশ্বজননীর ভাবে বিভোর হইয়া নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন ; মুকুন্দাদি মাতৃভাবের সঙ্গীত গাইতে লাগিলেন। অন্যান্য দিনের ভাব হইতে গৌরের আজিকার ভাব সম্পূর্ণ নূতন। ভক্তমণ্ডলী তাঁহার অনেক ভাব দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন মাতৃভাবের সুকোমল ছবি কখন নয়নগোচর করেন নাই। নির্ব্বাত নিষ্কম্প জলধিজলের ন্যায় আজ আদ্যাশক্তিভাবের জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

পাঠক মহাশয়! সমুদ্রের স্থির জলরাশিতে ঈষৎ বায়ুবিকম্পে যে তরঙ্গমালা ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহার শোভা কখন দেখিয়াছেন কি ? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে আজিকার গৌরাঙ্গের ভাবসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ; মহাশক্তির জমাটভাবে সঙ্গীতাদি জনিত সাময়িক উদ্দীপনায় যে বিবিধ ভাববৈচিত্র তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহার নিকট সাগর-তরঙ্গের শোভা কোথায় লাগে ? বড়াইরূপিণী নিত্যানন্দের হস্ত ধরিয়া গৌর নৃত্য করিতেছেন। কখন রুক্মিণীর ভাবে নয়নধারা বহিতেছে, কখন রাধিকা-ভাবে তিনি বড়াইকে বিনয় করিয়া নিধুবন সমাগমে লইয়া যাইতে কাকুতি

করিতেছেন, কখন কাদম্বরীপানে উন্মত্তা হইয়া রেবতীর ন্যায় যেন ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন, কখন কখন অট্ট অট্ট হাসিয়া মহাচণ্ডীর ভাব প্রকাশ করিতেছেন, আর কখন মহাযোগেশ্বরীর ন্যায় বীরাসনে বসিয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া প্রগাঢ় যোগে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন। ফলতঃ আজি-কার ব্যাপারে সকল শক্তিই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভক্তমণ্ডলীর সমুচিত জ্ঞান উদ্দীপন করাই এই অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার প্রথম শিক্ষা এই, ব্রহ্মাণ্ডের আদিশক্তিই জগজ্জননী, মঙ্গলদায়িনী ও আনন্দদায়িনী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত শক্তি আছে, সকলই তাঁহাতেই সমাবিষ্টা। তিনিই সকলের কেন্দ্র-স্থানীয়া। কি ভৌতিকী, কি মানসিকী, কি আধ্যাত্মিকী আর কি লৌকিকী, বৈদিকী, পৌরাণিকী বা তান্ত্রিকী, সকল শক্তিরই তিনি মূলাধারা। তাঁহাকে জানিতে না পারিলে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি হইতে পারে না।

তাঁহার দ্বিতীয় শিক্ষা, শক্তিপূজা ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপূজা হইতে পারে না। অতএব শক্তিপূজাকে কেহ ঘৃণা করিতে পারিবে না। দেশ-মধ্যে শাক্তেরা বৈষ্ণবকে ঘৃণা করেন। গৌরচন্দ্র এই ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভাব দূর করিয়া উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভিনয়ে আদ্যাশক্তির অবতারণা করিলেন। বৈষ্ণবেরা ভগবানের আনন্দ ও প্রেমস্বরূপের পূজা করিয়া থাকেন বলিয়া শক্তি-উপাসনা জড়োপাসনার ন্যায় নিকৃষ্টবোধে বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন। গৌরচন্দ্র প্রতিপন্ন করি-লেন যে, আনন্দ, প্রেম, শক্তিময়; শক্তি ভিন্ন আনন্দের অস্তিত্ব নাই, ও শক্তিলাভ ভিন্ন কখন আনন্দ, প্রেম লাভ হইতে পারে না। লীলাময়ের লীলারাজ্যে যিনি যতটুকু শক্তিতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই ততটুকু পরিমাণে আনন্দ, প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম। আবার যিনি যে পরিমাণে প্রেমানন্দ লাভ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সেই পরিমাণে মঙ্গল ও কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। এক ভগবানেই শক্তি, প্রেম, আনন্দ, কল্যাণ, শিব, সিদ্ধি, সকলই ওতপ্রোতভাবে সমাবিষ্ট; কোনটীকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যোগ ও বৈচিত্র্যই ভগবৎস্বরূপের ঐশ্বরিক ভাব। বিচিত্রতাও থাকিবে, যোগও থাকিবে; ইহাই লীলাতত্ত্বের গূঢ় ভাব। সুতরাং এই অর্থে যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে শাক্ত হইতেই হইবে। আবার যিনি প্রকৃত শাক্ত, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব হইবেন। কেহই কাহাকে ছাড়িতে

পারেন না। ছাড়িতে গেলেই যোগ বৈচিত্র ছিন্ন হইয়া কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইবে।

"শক্তি দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ; শক্তিসহ কৃষ্ণ পূজা করিলে সে সুখ।"

মহাশক্তির প্রবলপ্রভাবে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন; সম্মুখে শ্রীমান্ পণ্ডিত মশালচীর বেশে মশাল ধরিয়াছেন; হরিদাস কোটালের বেশে চারি দিকে সাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন; হঠাৎ নিত্যানন্দ মহাভাবে বিভোর হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কোথায় তাঁহার বড়াই সাজ গেল? একেবারে সংজ্ঞাহীন হইলেন। চারিদিকে ভক্তগণ ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমানন্দে কাঁদিতে লাগিলেন, ও কেহ কাহার গলা ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন; আর শচীনন্দন সম্মুখস্থ গোপীনাথ বিগ্রহের সিংহাসনে উঠিয়া জগজ্জননী আবেশে শ্রীমূর্ত্তিটী কোলে করিয়া বসিলেন। দর্শকমণ্ডলী মাতৃভাবে বিভোর হইয়া কেবল চারিদিক্ হইতে মা! মা! শব্দে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন; মুকুন্দের দল 'জয় মা! আনন্দময়ী বিশ্বজননী' বলিয়া খোল করতাল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; পুরন্ধ্রীগণ প্রেমানন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে 'মাগো! দয়া কর' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ মাতৃ স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। জয় জয় জগৎ জননি! সন্তাপ হারিণি! সন্তাপিত সন্তানের দুঃখ দূর কর মা! জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি! জগৎ স্বরূপিণি! সর্ব্বশক্তিময়ি! জ্ঞান, বিদ্যা, শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা; ভক্তি প্রভৃতি শক্তি সকল তোমারই মূর্ত্তি ভেদ মাত্র! তুমি সকল প্রকৃতির পরা শক্তি! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জননী! অচিন্ত্য অব্যক্ত স্বরূপা। তুমিই যুগে যুগে অবতীর্ণা হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার কর। সৃষ্টিপ্রকাশহেতু তুমি ত্রিগুণময়ী; বেদও তোমার কথা বলিতে গিয়া পরাস্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বাশ্রয়া, অখিলজীবের জীবনরূপিণি! তোমার স্মরণে ভববন্ধন খণ্ডন হয়। সাধুজনগৃহে তুমি লক্ষ্মীরূপে থাকিয়া ধন, ধান্য, শোভা, সৌভাগ্য, শান্তি, মঙ্গল, বিধান করিয়া থাক; আর অসাধুর গৃহে ভীষণ ভৈরবীরূপে অশান্তি, যন্ত্রণা, সন্তাপ, বর্দ্ধিন কর। তুমি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণি! তোমাকে না ভজিলে জীবের দুর্গতির সীমা থাকে না। তুমিই বিষ্ণুশক্তি রূপে বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা উদয় করিয়া দাও। আমাদের উদ্ধার জন্য এবার তোমার

প্রকাশ হইয়াছে; সংসারসন্তাপিত সন্তানদের চরণপল্লবের ছায়া দানে সুশীতল কর। ক্ষুধিত পুত্রদের স্তন্য দিয়া পোষণ কর। তোমার কৃপা বিনা আমাদের ভজন, সাধন, তন্ত্র, মন্ত্র, সব বৃথা।"

স্তবপাঠান্তে রঙ্গস্থল নীরব। সকলেই মহাসমাধিতে মগ্ন। বালবৃদ্ধ বনিতা সকলে নিস্তব্ধধ্যানানন্দে বিভোর। অত বড় প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ; কিন্তু একেবারে নীরব; সূচি পড়িলে শব্দ শুনা যায়। কথিত আছে যে, ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থায় সকলেই দিব্যদর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রত্যেকে দেখিতে লাগিলেন, যেন বিশ্বজননী ভুবনমোহিনী রূপ ধরিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হাসিতে হাসিতে স্তন্য সুধাপান করাইতেছেন। আর পুত্র কন্যাগণ এক দৃষ্টিতে মায়ের প্রসন্নমুখ চাহিয়া দেখিতেছে। এইরূপে ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া যখন বৈষ্ণবগণ সুখসাগরে ভাসিতেছেন, আস্তে আস্তে রজনী অবসান হইল; ক্রমে অরুণোদয় হইয়া সকলের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াদিল। নিশি অবসান দেখিয়া বৈষ্ণবদলের যত দুঃখ হইল, লোকের শতপুত্রশোকেও তত হয় না। সকলেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রাত্রিকে ভৎসনা করিতে লাগিল; কেহ উন্মত্তের ন্যায় শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল; এবং সুখরজনী চলিয়া গেল বলিয়া খেদ করিতে লাগিল।

কথিত আছে, অভিনয়ের পর সপ্তাহ পর্য্যন্ত আচার্য্য রত্নের গৃহে এক মহাতেজ প্রকটিত ছিল; যে আসিত, তাহার চক্ষু ঝলসাইয়া যাইত ও প্রাণ মনে অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত হইত।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতের দণ্ড।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদের ঘটনার পর অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের নিকট বিদায় লইয়া হরিদাসের সঙ্গে শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং শিষ্যমণ্ডলী লইয়া অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এবারে কিছু নূতন প্রণালীতে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াদিলেন। যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি শিষ্যদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, ভক্তি হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানব্যতীত ভক্তি কখন দাঁড়াইতে পারে না। জ্ঞান পথ দেয়, ভক্তি

তবে যাইতে পায়। ভক্তিদর্পণ, জ্ঞান চক্ষুঃ স্বরূপ। যেমন চক্ষুহীন ব্যক্তির সম্মুখে দর্পণ ধরিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না; সেইরূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারে না। হরিদাস এই সব ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। যিনি চারিদিক্ প্রেমভক্তি শূন্য দেখিয়া পৃথিবীতে ভক্তি অবতীর্ণ করাইবার জন্য এক সময়ে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; যিনি ভক্তিহীন জগতে ভক্তিপ্রচারার্থে গীতাভাগবতের ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া কত লোকের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন; আজ কেন তিনি ভক্তিকে খাটো করিয়া জ্ঞানকে মুখ্য সাধন বলিলেন? এ গূঢ় রহস্য কে বুঝিবে?

বিশ্বম্ভর ভক্তিবিরোধী কথা শুনিতে পারেন না, আবার আচার্য্যও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কি এই দোকানদারী? অথবা বৃদ্ধ আচার্য্য বিশ্বম্ভরের পুরস্কারপ্রসাদ খাইয়া তাহাতে বীততৃষ্ণ হইয়া আপন কল্যাণের জন্য কিছু দণ্ডপ্রসাদ খাইতে অভিলাষী হইয়া এই ছলা পাতিয়াছেন? বৃন্দাবন দাস মহাশয় এবিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন:—

"ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার;
হেন ভক্তি না মানিব এই মন্ত্র সার।
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাশরি;
প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি।"

এদিকে একদিন অতিপ্রত্যূষে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "নিতাই! চল শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে যাই, তিনি আমাদের দেখিয়া সুখী হইবেন।" নিতাই সম্মত হইলে উভয়ে সেই পথে শান্তিপুরে যাত্রা করিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যপথে গঙ্গাতীরে মল্লকর নামক গণ্ডগ্রামের নিকট ললিতপুর নামে ছোট একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে পথের ধারে গঙ্গাতীরে একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর আশ্রম।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ আশ্রম কাহার?' নিতাই উত্তর করিলেন, 'এখানে একজন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করেন'। গৌর বলিলেন, 'তবে চল একবার দর্শন করিয়া আসা যাউক'। উভয়ে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী গৈরিক পরিধান করিয়া

আসনে উপবিষ্ট; তাঁর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কপালে বৃহৎ সিন্দুর ফোঁটা, গলাতে রুদ্রাক্ষ মালা। উভয়ে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের ধনলাভ, পুত্রলাভ হউক এবং সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ হউক।" বিশ্বম্ভর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া মনে মনে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "মহাশয়! এমন আশীর্ব্বাদ করিলেন কেন? আপনার নিকট এরূপ অকিঞ্চিৎকর শুভকামনা করিয়া আসি নাই। বিষ্ণুভক্তিলাভ হউক, বলিয়া যদি আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহা হইলে আপনার উপযুক্ত হইত। দেখুন কেবল বিষ্ণুভক্তিই অক্ষয়, অব্যয়; আর সকলই অসার।'

বিশ্বম্ভর নিরস্ত হইলে সন্ন্যাসী ব্যঙ্গভাবে উত্তর করিলেন, 'ভাল বলিলেন লোকে ঠেঙ্গা লইয়া ধায় এইরূপ যে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। আমি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলাম; তাহাতে কোথায় উপকার স্বীকার করিবে, না এ ছোক্‌রা রাগ করিতেছে। আরে গেল যা! আরে! এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি উত্তম কামিনীর সঙ্গে বিলাস না করিল, যার ধনলাভ না হইল, তাহার তো জন্মই বৃথা। বলি ওহে ব্রাহ্মণকুমার! আচ্ছা বলতো বাপু! ধন না থাকিলে কি খেয়ে বাঁচিবে? অন্নাভাবে মরিয়া গেলে তোমার বিষ্ণুভক্তিতে কি হইবে?"

বিশ্বম্ভর, এই কথায়, সন্ন্যাসী কি ধাতুর লোক বুঝিয়া লইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনি জ্ঞানী হইয়া এরূপ কেন বলিতেছেন? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। দেখুন সংসারের কোন্ ব্যক্তি না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে? যিনি আকাশের পাখী ও কাননের পশুদিগের জন্যও আহার দিতে কুণ্ঠিত নন; আর জীব জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব হইতে যিনি জননীর শরীরের রক্ত মাতৃস্তন্যে পরিণত করিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখেন; তাঁহার রাজ্যে আবার খাইবার ভাবনা কি? পশু, পক্ষী, শিশু, তো কোন যত্ন করে না, তবে কেমন করিয়া তাহারা প্রতিপালিত হয়? তবে যার যেমন প্রারব্ধ, সে তেমনি ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি কামনা করিয়া ধনবংশ লাভ করিয়াও কেন নির্ব্বংশ ও ধনহীন হইতেছে? আবার দেখুন রোগশোকের জন্য কেহই প্রার্থনা করে না; তবে কেন তাহাদের কপালে দুঃখ দুর্দ্দৈব ঘটিতেছে? যদি বলেন, শাস্ত্রে

যখন কামনাব্রতের বিধি রহিয়াছে, তখন তদ্রূপ বর দিতে হানি কি? বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, এ সব কেবল মূর্খ বা অল্পবুদ্ধি লোকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হরিভক্তি ভিন্ন আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, এবং হরিভক্তি ভিন্ন আর প্রার্থয়িতব্য বিষয়ও দেখেন না।'

বিশ্বম্ভরের এই সকল কথা অবোধ সন্ন্যাসীর বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তাই সে কিছু ক্রোধের হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল, "আরে! এ ছেলেটা কি পাগল হয়েছে নাকি? অহো! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! নইলে কি দুধের ছেলে আজ আমাকে শিক্ষা দিতে সাহসী হইত? আমি অযোধ্যা, মথুরা, বদরিকাশ্রম, কাশী, গয়া, গুজরাট, সিংহল প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই পর্য্যটন করিয়াছি; আমি কিছু জানি না, আর এই চেঙড়া ছোক্‌রাটা এত জ্ঞানী হলো?'

নিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীকে বলিতে লাগিলেন, 'গোঁসাই! আপনি বালকের সহিত কেন বিচার করিতেছেন? ক্ষান্ত হউন, এবং আমার জন্য ইহাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানি; এ বালক জানে না, তাই এরূপ বলিতেছে।'

সন্ন্যাসী এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে না পারিয়া আত্মপ্রশংসা বিবেচনায় অতি হৃষ্ট হইল এবং নিতাই গৌরকে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিল। নিত্যানন্দ বলিলেন, 'আমরা প্রয়োজনানুরোধে যাইতেছি, স্নানাহার করিতে গেলে কার্য্য হানি হইবে; তবে কিছু দি'ন, পথে স্নান করিয়া জল খাইয়া যাইব। সন্ন্যাসী তখন তাঁহাদের স্নান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় দুই ভাই স্নান করিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। জ্যৈষ্ঠ-মাস; সন্ন্যাসী অতিথিদ্বয়কে পাকা আম্ ও দুগ্ধ জলপান জন্য দিয়া নিত্যা-নন্দকে সঙ্কেতে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনাদিগের মত অতিথিলাভ বহু ভাগ্যের কথা; অনুমতি করেন তবে কিছু আনন্দ আনা যাউক।" নিত্যা-নন্দ বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। 'আনন্দের' কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী বামাচারী, মদ্যপান করিয়া থাকে ও তাঁহাদিগকে মদ্যপান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। বিশ্বম্ভর নিত্যা-নন্দকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে 'আনন্দ' অর্থে মদ্য। অমনি তিনি 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলিয়া আচমন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন; নিত্যানন্দও

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল। তখন দুই বন্ধু পথে চলিতে চলিতে যুক্তি করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ভাসিয়া চলিলেন, আর ডাঙ্গায় উঠিলেন না। সন্তরণ করিতে করিতে বিশ্বম্ভর মহাযোগে মগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন, এবং ঈশ্বরাবেশে গঙ্গাগর্ভ ভেদ করিয়া কত অলৌকিক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আমি নিশ্চিন্তভাবে যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়াছিলাম, আরে নাড়া! আমাকে এখানে আনিয়া এখন ভক্তি লুকাইয়া জ্ঞানব্যাখ্যা করিতেছিস্; দেখ্ আজ তোর কি শাস্তি করি?" নিত্যানন্দ মৌনভাবে এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে চলিলেন। শান্তিপুরের ঘাটে উঠিয়া উভয়ে একেবারে অদ্বৈতের ভবনে উপনীত হইলেন। অদ্বৈত তখন ছাত্রবৃন্দ লইয়া বাশিষ্ঠের জ্ঞানব্যাখ্যায় নিযুক্ত। বিশ্বম্ভর ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আরে নাড়া! বল্ দেখি জ্ঞান ভক্তির মধ্যে কে বড়?" অদ্বৈত হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "চিরকালই জ্ঞান বড়, ইহা কে না জানে?" আর কোথা যাবি? এই শুনিয়া শচীনন্দন ক্রোধে অধীর হইয়া পিঁড়া হইতে বৃদ্ধ আচার্য্যকে টানিয়া আনিয়া উঠানে ফেলাইয়া কিল চপেটাঘাত প্রভৃতি উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। আচার্য্যপত্নী 'প্রভু! কর কি? বুড়ো বামুন এখনি মরিয়া যাইবে; ক্ষান্ত হও,' বলিয়া কাতরস্বরে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন এবং ছাত্রবৃন্দ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। "আরে নাড়া! যদি তোর মনে এত ছিল, তবে ভক্তিশূন্য লোক দেখিয়া তখন অত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলি কেন? আর আমাকে আনিয়াই বা এত ভক্তির ছড়াছড়ি করার কাজ কি ছিল?' এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে ছাড়িয়া দুয়ারে যাইয়া বসিলেন, এবং ঐশ্বর্য্যভাবে পূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের অভিন্নভাবে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ দিকে অদ্বৈতাচার্য্য মার খাইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং হাতে তালি দিয়া প্রাঙ্গণে নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, "যেমন অপরাধ করেছিলাম, তেমনি শাস্তি পাইলাম; ভাল হলো যে এত অল্প দিয়ে গেল"। এই বলিতে বলিতে তিনি ভ্রূকুটীভঙ্গিতে বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "কেমন? আর আমাকে স্তুতি করিবে? এখন তোমার সে ঢাঙ্গাইতিপোনা কোথায়

গেল ? আমার নাম অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস ; তোমার মায়ায় ভুলিবার পাত্র নই। কেমন শাস্তি করাইলাম দেখ্‌লে ? এখন এস পদধূলি দাও।” অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের পদতলে পতিত হইলে বিশ্বম্ভর সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিলেন। এই ভাব দর্শনে নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতনন্দন অচ্যুত, সীতাদেবী প্রভৃতি সকলেই প্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈতের প্রাঙ্গণ যেন কৃষ্ণপ্রেমময় হইয়া টলিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর খুব উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, ‘শুন আচার্য্য! যদি কেহ আমার স্থানে সহস্র অপরাধেও অপরাধী হইয়া তোমার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া উদ্ধার করিব।’ অদ্বৈত উত্তর করিলেন “শুন! আমারও এই প্রতিজ্ঞা, তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যে আমায় ভজিবে, তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে তোমাকে না মানে, সে আমার পুত্র, কি কিঙ্কর, আর যেই কেন হউক না, আমি কখনই তাহাকে নিজজন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।” এই কথার পোষকে আচার্য্য এক পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলিলেন। বিশ্বম্ভর তখনও দেবভাবে মগ্ন ; অদ্বৈতের বাক্যাবসানে অহঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “সকলে শুন! আমার ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া যে মূঢ় আমাকে পূজা করে, তাহার সেই পূজা অগ্নিময় শেলের সম আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আমার যত সেবক আছে, সকলই সম্মান ও ভক্তির পাত্র ; যে কেহ তাহাদের নিন্দা করিবে, তাহারাই নষ্ট হইবে। তবে ভাই! হিংসা, নিন্দা, পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ নাম কর, অনায়াসে ত্রাণ পাইবে।” তখন সকলেই উচ্চৈঃস্বরে ‘জয়! জয়!’ ধ্বনিতে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ক্ষণকাল পরে বিশ্বম্ভর বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া কিছু লজ্জিতভাবে বলিতে লাগিলেন, “আমি কি কিছু চাঞ্চল্য করিয়াছি ? যদি করিয়া থাকি, তবে আপনারা তাহা ক্ষমা করিবেন।”

অদ্বৈতপত্নীকে বিশ্বম্ভর জননী সম্বোধন করিয়া বলিলেন “মা! আপনি পাক উঠাইয়া দি’ন, শীঘ্র ভোজন করিতে হইবে, আমরা স্নানে চলিলাম।” তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন, এবং স্নানান্তে কৃষ্ণের প্রণাম বন্দনার পর গৌরচন্দ্র অদ্বৈত চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন এবং একত্র ভোজনে বসিলেন। ঘরের মধ্যে তিন প্রভুর পাত হইল, দ্বারের নিকট হরিদাস বসিলেন। সীতাদেবী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজনের কিছু অবশেষ আছে, এমত সময়ে নিত্যানন্দ বাল্যভাবে বিভোর

হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন এবং সকল ঘরে ভাত ছড়াইয়া ইহার পাতের এঁটো তার পাতে, উহার পাতের এঁটো ইহার পাতে দিয়া একাকার করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বম্ভর "হায়! হায়! জাতিনাশ হইল" বলিয়া পরিহাস-ব্যঞ্জক স্বরে খেদ করিয়া উঠিলেন, হরিদাস হাসিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত ক্রোধে অধীর হইয়া নিতাইকে গালি পাড়িতে লাগিলেন :—"কোথা হইতে মাতালটা আসিয়া জুটিয়াছে? আরে মলো! পশ্চিমার ঘরে ঘরে ভাত খাইয়া আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিল।" আচার্য্য ক্রোধে দিগ্বাস হইয়া উঠিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন; নিতাই দুইটী অঙ্গুলী দেখাইয়া হাসি জুড়িয়া দিলেন, এবং গৌরচন্দ্র হরিদাস হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈতগৃহে শুদ্ধ হাস্য তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। তখন সকলে উচ্ছিষ্ট হাতে কোলাকুলী করিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত ভবনে তিন দিন এই রূপে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈত, হরিদাস ও নিত্যানন্দকে লইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইতো গেল বৈষ্ণবগ্রন্থের কথা। এবিষয়ে এক জনপ্রবাদ আছে যে, অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের ভক্তদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন শান্তিপুরে জ্ঞানপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাধব, শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যের অনেক শিষ্যও জুটিয়াছিল। গৌর-চন্দ্র এই কথা শুনিতে পাইয়া নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে আসিয়া নানা উপায়ে আচার্য্যের মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় স্বমতে আনিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও মত পরিবর্ত্তন হইল না। যাহারা ফিরিল না, তাহাদের মধ্যে মাধব ও শঙ্কর প্রধান। ইহারা স্বীয় গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসাম প্রভৃতি দেশে যাইয়া স্বতন্ত্ররূপে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। আসামের বর্ত্তমান বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইহাদেরই শিষ্য প্রশিষ্য। ইহারা চৈতন্যকে স্বীকার না করিয়া অদ্বৈতকেই কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং জ্ঞান ভক্তিকে সংযুক্ত করিয়া আপ-নাদের মত গঠিত করিয়াছিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন দিন দিন জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্ত নিশা সঙ্কীর্ত্তন হয়; ভক্ত ভিন্ন সাধারণ লোকের সেখানে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু নগরের আবাল-বৃদ্ধ বালিকা কীর্ত্তন শুনিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে, প্রতি রজনীতে বাটীর বাহিরে, পথে, গলিতে ও অন্তঃপুরে লোক ধরে না; সমুৎসুক চিত্তে নগরবাসিগণ নব ভক্তিবিধানের নবসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ব্যগ্র। এই সকল লোকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। কতক লোক কেবল উপহাস বিদ্রূপ করিবার জন্য আসিত; কিন্তু অনেকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া উপকার লাভের প্রত্যাশায় সমস্ত রজনী হিমভোগ করিয়া জাগরণ করিত। কীর্ত্তনের মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া ও প্রেমের স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া পক্ষপাতীগণ এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা পাষণ্ডী-দিগকে যথোচিত তিরস্কার করিত। মহিলাগণ গৌরের রূপ মাধুর্য্যে ও নৃত্যকীর্ত্তনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের গুরুজনের অনেক গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন। তাঁহাদের তৎকালের মনের ভাব কোন বিদগ্ধা মহিলা নিম্ন লিখিত গানে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"পাড়ার লোকে গোল করে গো!
আমায় সবে বলে গৌর-কলঙ্কিনী।
সঙ্কীর্ত্তনে গৌর নেচেছে,
তাতো পাড়ার লোক দেখেছে,
তখন আমি দাঁড়ায়ে নাছে,
(বাড়ীর বাহির হই নাই গো!)
কেবল দেখেছিলাম তাঁর চরণ দুখানি।
একদিন জাহ্নবীর ঘাটে,
গোরাচাঁদ দাঁড়ায়ে তটে,
যেন সূর্য্যচন্দ্র উভয় জোটে, গৌর অঙ্গেতে;

দেখে গৌর রূপের ছবি,
ভুলে গেল শাক্ত শৈবী,
দৈবে গেল মোর কলসী ভেসে,
এলোথেলো হলেম পাগলিনী।
আর একদিন শ্রীবাসের বাড়ী,
সঙ্কীর্ত্তনের হুড়াহুড়ি,
ভক্তগণ যায় গড়াগড়ি, শ্রীবাস অঙ্গনে;
(ভাবে কে কার গায়ে ঢলে পড়ে গো)
তখন আমি লুকায়ে,
ছিলাম এক ভিতে দাঁড়ায়ে,
পড়িলাম অচেতন হয়ে,
চেতন করে শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী।"

নগরের কতগুলি লোক শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এতই আসক্ত হইয়া পড়িল যে, তাহারা দিবাভাগে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। গৌরচন্দ্র ঐসকল লোকের শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া হরিনাম উপদেশ করিলেন এবং সন্ধ্যার সময় সকলকে একত্রিত হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিয়া দিলেন। তদবধি নবদ্বীপনগরে প্রতি পল্লীতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিয়া গেল। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমান্তে নগরীর লোক সকল যখন একত্রিত হইয়া মৃদঙ্গ মন্দিরাশঙ্খবাদ্য যোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিল,—"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমো, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন!" এই পদ সুমধুর স্বর সংযোগে যখন নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত, আর প্রগল্ভ নৃত্যের প্রেমতরঙ্গে চারিদিক আন্দোলিত হইত, তখন নবদ্বীপ এক নূতন শ্রী ধরিত। পাষণ্ডীগণের বিদ্বেষানল ইহাতে শতগুণ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে গোপনে কাজীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, নিমাইপণ্ডিতের কুপরামর্শে নগরের কতকগুলা অসচ্চরিত্র লোক নগরের স্থানে স্থানে জোটলা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া লোকের প্রতি উৎপাত করিতেছে; তাহাদিগকে দমন না করিলে শীঘ্রই নগরমধ্যে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা। কাজী দৃঢ়তা সহকারে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন কাজী সাহেব আপনার দলবল সহ সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে যাইয়া দেখিলেন যে,

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের রোলে নদীয়া টলমল করিতেছে। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া কাজীসাহেব এক দলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন; লোকদিগকে অশেষ প্রকারে অপমান করিলেন এবং আর কীর্ত্তন করিলে তাহাদের জাতি মারিয়া মুসলমান করিবেন, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন। দুই চারিদিন পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া এইরূপ করাতে সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, প্রেমভক্তিপ্রচারের শাণিতাস্ত্র আপাততঃ কোষমধ্যে লুকায়িত রাখিতে হইল, পাষণ্ডীদের জয় হইল, এবং ভগবদ্বিধান সয়তানের হস্তে পরাস্ত হইয়া গেল। সংসারে এইরূপ ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। ইহা দেখিয়া যাঁহারা অসত্যের জয় মনে করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী অবিশ্বাসী। বিশ্বাসীগণ এরূপ বাধাবিঘ্নের এক কড়ার মূল্যও দেন না। তাঁহারা নিশ্চয় জানেন "সত্যমেব জয়তে" সত্যের জয় হইবেই হইবে। তাই কীর্ত্তনকারী লোক সকল যখন দলে দলে যাইয়া গৌরচন্দ্রের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে নিরাশ অন্তরে কাজীর আচরণের কথা জ্ঞাপন করিল, তখন গৌরচন্দ্র ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন—"শুন নিতাই! সাবধানে বৈষ্ণবসমাজে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আজ অপরাহ্নে সমস্ত নবদ্বীপে নগরসঙ্কীর্ত্তন হইবে; দেখা যাউক কোন্ কাজি, কি বাদসাহ কি করিতে পারে? আমি সত্যই বলিতেছি যে, আজ বিশাল প্রেমভক্তির বৃষ্টি হইবে, তাহার তরঙ্গে কাজী ও পাষণ্ডীগণ ডুবিয়া মরিবে।" নগরবাসীদিগকে বলিলেন, "ভাই সব! যাও, আমার এই ইচ্ছা আজ নগরের ঘরে ঘরে প্রচার কর এবং তদুপযুক্ত আয়োজন কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আজ লীলাবিহারী ভগবানের অতি রহস্যলীলা প্রকাশিত হইবে। কিসের ভয় কাজীকে? আর কিসের ভয় বাদসাহকে? যিনি সকল ভয়ের ভয়ানক, যিনি ভীষণের ভীষণ, আমরা সেই উদ্যতবজ্র শ্রীহরির শরণাপন্ন। আমরা কি সামান্য মানুষের ভয়ে ভীত হইব? যাঁহার চরণাশ্রয় লইলে সকল ভয় চলিয়া যায়, তিনি সেনাপতি থাকিতে তাঁহার সৈন্যগণ কি ভয় করিবে? এই প্রেমভক্তির সময়ে আজ কত পাপী নিধন হইবে, সে রহস্য স্বচক্ষেই দেখিবে। এখন যাও, বিকালে সাজসজ্জা করিয়া আসিও।" গৌরচন্দ্রের সাহসপূর্ণ তেজস্বী বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সকলে স্তম্ভিত ও উৎসাহিত হইল। নগরবাসীরা বিদায় হইয়া গেল এবং নগরে মহাসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিবিধানে নগরসঙ্কীর্ত্তন এক মহাব্যাপার। ভাগীরথীর জলস্রোত যেমন প্রথমে হিমাচলের কয়েক খণ্ড প্রস্তরমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া গোমুখী হইতে প্রবল ধারায় প্রবাহিত হইয়া ভারতের নানা দেশের প্রান্তরগুলিকে শস্যপূর্ণ করিয়া ও কোটি কোটি নরনারীকে সুশীতল জলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে যাইয়া মিশিয়া গিয়াছে, সেইরূপ গৌরের সঙ্কীর্ত্তন-নদী, যাহা এত দিন কয়েকটি হৃদয়ে আবদ্ধ ছিল এবং শ্রীবাসের চণ্ডীমণ্ডপের চতুষ্কোণমধ্যেই যাহার তরঙ্গ খেলিত, আজ তাহা প্রবলবেগে সমস্ত নবদ্বীপে, পরে ভারতের নানা স্থানে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত প্রেমের সাগরে মিশিয়া একাকার হইতে চলিল। ইহা মনে করিলে কাহার না হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয়? ফলতঃ ধর্ম্মসংগ্রামে নগরসংকীর্ত্তন যে এক মহাস্ত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অস্ত্রের আঘাতে কত পাপীর হৃদয় যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কত জগাই মাধাই যে উদ্ধার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সমস্ত নগরে প্রচার হইয়া গেল যে আজ নিমাই পণ্ডিত প্রকাশ্য ভাবে নগরে নগরে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইবেন। নাগরিক লোক সকল মহোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন করিতে লাগিলেন। যুবকেরা রাশি রাশি ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল; কদলীতরু, আম্রশাখা ও পূর্ণ কুম্ভ দিয়া মনোহর তোরণ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল; বয়স্থেরা ছোট বড় নানা প্রকারের অসংখ্য মশাল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, তৈলের যোগাড় করিলেন; এবং বৃদ্ধেরা মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, রামসিঙ্গা ও পতাকাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; মহিলারা মালা চন্দন ও শঙ্খ লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন যে সংকীর্ত্তনের দল যখন বাটীর নিকটে আসিবে, তাঁহারা তখন শঙ্খধ্বনি করিয়া মালা চন্দন বৃষ্টি করিবেন। আজ আর লোক সকল কাজীর ভয়ে ভীত নয়, পাষণ্ডদের বিদ্রূপ গ্রাহ্য করে না এবং পিতা মাতা গুরুজনের নিষেধ মানে না। অনুরাগ ও উৎসাহের বিশালতরঙ্গ উঠিয়া সমস্ত নবদ্বীপকে যেন নাচাইতে লাগিল। রামের দেখে শ্যাম, শ্যামের দেখে হরি, হরির দেখে মধু, এইরূপে আবালবৃদ্ধবনিতা নবভক্তিবিধানের নূতন মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৃন্দাবনদাস মহাশয় এক মশাল রচনার কথাই কতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নানা সাজে সজ্জিত বৈষ্ণবমণ্ডলী ও নাগরিক লোক-সকলে গৌরের আঙ্গিনা পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখেই উৎসাহ আনন্দ মূর্ত্তিমান বিরাজ করিতেছে। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এক সামান্য ব্রাহ্মণকুমারের ইঙ্গিতে রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া এত লোক নগরে নগরে সংকীর্ত্তন গাইতে যাইবে? একি ভগবানের ভক্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে সমরযাত্রার মিছিল নাকি? বৃন্দাবন দাস সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে ভগবচ্ছক্তি বিনা ইহা কখনই হইতে পারে না। তথাচ অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে না। ধন্য ভগবন্! ধন্য তোমার বিধান চক্র! ধন্য বিধান প্রবর্ত্তকগণ! যে শক্তি আজ গৌরের এই বিশাল সংকীর্ত্তনদলে প্রতিষ্ঠিত; সেই লীলাময়ী ভগবচ্ছক্তিকে আমি অবনত মস্তকে বারবার নমস্কার করি।

সকল লোক একত্রিত হইলে গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈত আচার্য্যের দল, তৎপরে হরিদাসের, তৃতীয় শ্রীবাস পণ্ডিতের, ও সর্ব্বশেষে স্বয়ং গৌরচন্দ্রের দল কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিতাই কহিলেন 'আমার স্বতন্ত্র দলে নাচিবার শক্তি নাই; আমি তোমার পাশে পাশেই থাকিব।' সুতরাং পঞ্চমদল হইল না। সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তকদিগের বেশ-ভূষারই বা কি সৌন্দর্য্য! সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ও আবীরে চর্চ্চিত; ত্রিকচ্ছ ধুতি-পরিধান; মস্তকে, গলদেশে, বাহুমূলে সুগন্ধি পুষ্পমালা; হাতে মন্দিরা, করতাল, শঙ্খ আদি। খুব মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। গৌরের অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ, প্রভৃতি ভাবোদয় হইতে লাগিল, হরি-ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং থাকিয়া থাকিয়া সেই বিস্তীর্ণ লোক সমুদ্রের মধ্যে নানা প্রকারের ভাবতরঙ্গ খেলিতে লাগিল। এইরূপে বেলাবসান হইলে ভক্তমণ্ডলী কীর্ত্তন করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইলেন। তখন চারিদিকে কোটি অর্ব্বুদ মশাল জ্বলিয়া উঠিল, মহিলাগণ মঙ্গল সূচক শঙ্খধ্বনি যোগে খই, কড়ি, পুষ্প, বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এবং পুরুষদিগের হরিনামমিশ্রিত উচ্চ কণ্ঠধ্বনির সহিত বামাগণের হুলুধ্বনির কোমলকণ্ঠ মিশিয়া সান্ধ্য সমীরণকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। চারি সম্প্রদায়ে চারিটী নূতন রচিত পদ গীত হইতে লাগিল। আচার্য্য-প্রমুখদল 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমো, গোপাল গোবিন্দ রাম

শ্রীমধুসূদন।' হরিদাসের দলে 'হরি ও রাম! রাম, হরি ও রাম! রাম'; শ্রীবাস পণ্ডিতের দলে 'মুগধা গোবিন্দ বলরে, যাহা হৈতে নাহি হয় শমন-ভয় রে" এবং গৌরের দলে "তুয়ার চরণে মন লাগহুঁ রে শারঙ্গধর! তুয়ার চরণে মন লাগহুঁ রে" পদ প্রমত্ত ভাবে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে চারিটী সম্প্রদায় স্থির গম্ভীর ভাবে গাইতে গাইতে চলিল; কিন্তু নগরের পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, কীর্ত্তন যতই জমাট বাঁধিতে লাগিল, লোক সকল যতই মাতামাতি করিতে লাগিল, ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ যতই তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, সম্প্রদায় চতুষ্টয় ততই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সাগর সঙ্গমোন্মুখী নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে ধারে এক প্রশস্ত পথ ছিল; এই বিশাল সংকীর্ত্তন দল সেই পথে চলিল। প্রথমে গৌরের স্নানঘাটে কতক-ক্ষণ কীর্ত্তন হইয়া মাধাইর ঘাট ও বারকোণা ঘাট দিয়া সংকীর্ত্তন সিমুলিয়া নগরে প্রবেশ করিল। এই সিমুলিয়া নামক স্থানে কাজী ও রাজকীয় সমস্ত কর্ম্মচারী বাস করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা তখনকার অতি সমৃদ্ধি-শালী ও সৌষ্ঠবান্বিত স্থান। কি আশ্চর্য্য! কাজীর নিষেধ সত্বেও লোক-সকল কীর্ত্তন অভ্যর্থনার জন্য নানা প্রকারে স্ব স্ব বাড়ী ও পথ ঘাট সাজা-ইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কদলীর কাঁদি সহিত রম্ভাতরু, আম্রসার, নারি-কেল, গুবাক, পুষ্পমালা, অশোকমালা প্রভৃতি নানা সজ্জায় নগরী আজ সুশোভিত।

সিমুলিয়ার নিকটবর্ত্তী হইলে অসংখ্য অসংখ্য নগরীয় লোক কীর্ত্তনে যোগ দান করিল। প্রবল স্রোতস্বতী নদীজলে প্রখরবেগে নূতন বন্যার জল পড়িলে যেরূপ উত্তাল তরঙ্গ ও ফেণোদ্গম হইয়া ভীষণতর বেগ সমুত্থিত হয়, তখন সংকীর্ত্তনও সেইরূপ ভীষণ রূপ ধারণ করিল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যেন কৃষ্ণোন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কে কাহাকে কি বলে? কি করে? কিছুরই ঠিক নাই। কেহ কেহ নানা রঙ্গভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল, কেহ কেহ হরি বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ ধূলাতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ মুখে নানারূপ বাদ্য করিতে লাগিল, কেহ কাহারও স্কন্ধে উঠিয়া বসিল, কেহ মাতোয়ালের ন্যায় কাহারও চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ কেহ পরস্পর কোলাকুলী করিতে লাগিল, কেহ বলিতে লাগিল, আমি ভাই! নিমাই পণ্ডিত; জগৎ

উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, কেহ বলে আরে ভাই! কাজী বেটাকে ধরিয়া আন, তাহাকে শিক্ষা দিব; কেহ বলে আরে! ধর ধর পাষণ্ডী বেটাদের ধর; তাহারা যেন পলাইতে না পায়; কোন কোন বীর অবতার লম্ফ দিয়া গাছে উঠিয়া ডাল পালা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল; কেহ কেহ যম রাজাকে বাঁধিয়া আনিতে আদেশ দেয়। এইরূপে গৌরচন্দ্রের কীর্ত্তনে নবদ্বীপের লোকগুলা আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে। যাহাদের বহুদিনের মনোমালিন্য ও অসদ্ভাব ছিল, তাহারা আজ প্রেমে গলা ধরা ধরি করিয়া গাইতেছে, নাচিতেছে ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে; যে চিরজীবন পাপপথে ভ্রমণ করিয়াছে, দুষ্ক্রিয়ার মলিন পঙ্কে যাহার চরিত্রের বস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে, সে অবিরল অশ্রু ফেলিয়া অনুতাপের কান্না কাঁদিতেছে; যে সৌভাগ্যবান্ আজন্ম ভগবৎসেবা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ পুলকে দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ঘোষণা করিতেছেন "আরে ভাই! ভবপারে যাইবার আর ভয় নাই, পতিত পাবন শ্রীহরি স্বয়ং কাণ্ডারী সাজিয়া নাম তরী লইয়া সকলকে ডাকিতেছেন, তোরা সব চলিয়া আয়।"

পাষণ্ডীদিগের দল এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কত কি বলাবলি করিতে লাগিল। একজন বলিল "এই সময় কাজী সাহেব এখানে আসেন, তো আচ্ছা মজা হয়; কোথায় বেটাদের রঙ্গ ঢঙ্গ যায়? কোথায় বা গান বাজনা থাকে? আর কোথায়ই বা আম্রশাখা কলার গাছ পড়ে থাকে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল "তা'হলে যত দেখছো মহাতাপ, মশাল, খোল করতাল, ভাব কালী, গঙ্গাসই হয়ে যায়।"

তৃতীয় পাষণ্ডী বলিয়া উঠিল "তা'হলে ভাই! আমি গঙ্গার ধারে গিয়া ভাবুক বেটাদের ঢেকা মেরে জল সই করে দি। চলনা কেন সকলে যাইয়া কাজীকে ডাকিয়া আনি।"

তাহাদের মধ্যে রসিক রকমের একজন লোক ছিল সে বলিল "আরে! তাও কি করতে আছে? তাতে যে আমাদেরও বিপদ্ ঘটিতে পারে। এসো এক কাজ করা যাক্; কীর্ত্তনের নিকটে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিগে যে ঐ কাজী আস্‌ছে। তা'হলে মজা দেখো, সকল বেটাই চম্পট দিবে।"

এদিকে সঙ্কীর্ত্তনের দল আস্তে আস্তে সিমুলিয়ার মধ্যস্থানে আসিয়া

উত্তীর্ণ হইল। গৌরাঙ্গের তৎকালের ভাব যে দেখিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। নয়নযুগল দিয়া দর বিগলিত ধারে অশ্রু পড়িতেছে, 'হরিবোল' 'হরিবোল!' বলিয়া দুইটী বাহু তুলিয়া নাচিতেছেন, কখন ভাবাবেশে হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন, কখন আছাড় খাইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছেন, এবং কখন মহাভাবে গর গর হইয়া থর থর কাঁপিয়া উঠিতেছেন। এইরূপভাবে কীর্ত্তনের দল ক্রমশঃই কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরাও অল্প সময়ের জন্য সঙ্কীর্ত্তনদল হইতে বিদায় লইয়া কাজী সাহেবের দরবারে যাইবার জন্য পাঠককে অনুরোধ করিতেছি।

সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই কাজী কীর্ত্তনকারীদিগের চরিত্রের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কয়েকজন পেয়াদাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই আজ কাজীসাহেব দরবারঘরে প্রত্যাগত দূতদিগের নিকট গৌরাঙ্গের আচরণ শুনিতেছেন। একজন দূত হস্তযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "হুজুর! কি আর বলিব? নগরের লোকগুলা এমন করিয়া নগর সাজাইয়াছে যে আমাদের বাদসা নামদার আসিলেও তেমন ঘটা হয় না। কত লক্ষ লক্ষ লোক জুটিয়া যে দলবদ্ধ হইতেছে, তাহার ঠিকানা হয় না। মশালই বা কত? বাজনার শব্দে কাণ পাতা যায় না। অধিক কি বল্‌বো, পর্‌দার জানানা গুলাকে পর্য্যন্ত ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। তাহারা শাঁক বাজাচ্ছে, হুলু দিচ্ছে ও খই কড়ি ছড়াচ্ছে। বেটা যেন ঠিক্ বিয়ে কর্‌তে বেরিয়েছে। কি বলে ভূতের নাকি সয়তানের কীর্ত্তন হচ্ছে। আমরা সে দিন যে সকল লোককে শাস্তি দিয়া আসিয়াছি, তাহারাই আজ মার মার বলিতে বলিতে আসিতেছে। উহাদের সর্দ্দার ঐ নিমাই পণ্ডিত; তাহাকে জব্দ করিতে না পারিলে এ ভূতের বাসা ভাঙ্গিবে না। আল্লা হো আক্‌বর! হুজুরের এখন যেমন মর্‌জী।"

আর একজন দূত দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "ধর্ম্মাবতার! এক আশ্চর্য্য দেখিলাম; বাম্‌না কীর্ত্তন করে আর কাঁদে। তার দুই চখের পানিতে বুক ভাসিয়া যায়; আবার থাকিয়া থাকিয়া সে এমন চীৎকার করিয়া উঠে যে, দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন গিলিতে আসিতেছে। বাপরে! তাহাকে দেখিলে আমার বড় ভয় হয়।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "হুজুরের আদেশ শিরে ধরিয়া আমি একদিন কীর্ত্তন নিষেধ করিতে গিয়াছিলাম। বলিলে বিশ্বাস করিবেন না

আমি যেই লোকদিগকে শাসন করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি কোথা হইতে এক প্রকাণ্ড অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া আমার দাড়ী গোঁপ পোড়াইয়া দিল। এই দেখুন মুখে ব্রণ রহিয়াছে।"

এই সময়ে সভামধ্যে একজন যবন 'হরিবোল, হরে! কৃষ্ণ!' বলিয়া গান করিয়া উঠিল। কাজী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে! তোমাকেও ভূতে পাইয়াছে নাকি? হিন্দুরা কীর্ত্তন করে তাদের ধর্ম্ম, তুমি বাপু মুসলমানের ছেলে হয়ে ঐ নামগুলা কেন উচ্চারণ করিতেছ? যাও! কলমা না পড়িলে আর তোমার রক্ষা নাই।" সে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমি কি করিব? কীর্ত্তনের স্থানে যে যাইতেছে, সেই হরিনাম না শিখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে না। একটী দিনমাত্র সঙ্কীর্ত্তন নিষেধ করিতে যাইয়া আমার এই দশা হয়েছে। আমি কি জানি না যে মুসলমানের পক্ষে হরিনাম করা মহাপাপ। কিন্তু কি করি? সে ভাব যে একবার দেখেছে, সে নাম না লইয়া থাকিতে পারে না। কে জানে নিমাই বামনা কি জাদু জানে? হুজুর যদি সেখানে একবার যান, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনারও এই দশা হবে।"

কাজী দূতগণের মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে 'ভীরু' 'কাপুরুষ' বলিয়া অশেষ প্রকারে ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্র গম্ভীরস্বরে বলিলেন "ধিক্ তোমাদের মুসলমানবংশে জন্ম! সামান্য কাফেরকে এত ভয়? তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে এই মহানগরীতে ত্রয়োদশ জন মাত্র মুসলমান বীর হাজার হাজার কাফেরদিগকে পরাভূত করিয়া ইস্‌লামের বিজয়নিশান তুলিয়া গিয়াছেন? তোমরা তাঁহাদের বংশীয় হইয়া এত কাপুরুষ হইয়াছ যে একজন সামান্য বাম্‌নাকে ভয় কর্‌ছো? দেখি আজ কার মাথায় দশটা মাথা আছে যে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এত হিন্দুয়ানি করে?" এই সময়ে সভামধ্যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। রাজপ্রতিনিধির শেষ কথাগুলি কণ্ঠ হইতে নিঃশেষ হইতে না হইতে হঠাৎ তিনি বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। চারিদিকে হৈ চৈ উঠিয়া গেল। সকলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। এবং অনুচরবর্গ ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিত কাজীকে বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গেল। কেহই ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইল না।

এই কালে নগর সংকীর্ত্তনের দল কাজীর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল; মুসলমান কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। কাজীর মূর্চ্ছা, তাঁহার বাটীর তাৎকালিকের বিশৃঙ্খল অবস্থা, সংকীর্ত্তনের গাম্ভীর্য্য ও স্বর্গীয় ছবি, আর নগরের আবাল বৃদ্ধ যুবকের প্রেমোন্মত্ততা তাহাদিগকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। কতক লোক গোলমাল দেখিয়া পলাইয়া গেল, আর কতক লোক নিশ্চেষ্ট ভাবে দেখিতে লাগিল। এদিকে নগরবাসী লোকসকল ভাবে বিভোর ও উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া কাজীর পুষ্পবন বাগিচা প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ খুব মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইলে পর গৌরচন্দ্রের ইঙ্গিতে কিছু ক্ষণের জন্য স্থগিত থাকিল। তখন তিনি কাজীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং জনৈক ভব্য লোক দ্বারা তাঁহার আগমন বার্ত্তা বলিয়া পাঠাইলেন। ইহার পূর্ব্বেই কাজীর মূর্চ্ছাপনোদন হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন এবং সম্যক্ সম্মানের সহিত গৌরকে আপনার গৃহে লইয়া বসাইলেন। গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা! আজ আমি আপনার অভ্যাগত; কোথায় আপনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবেন? না আমাকে দেখিয়া অন্দরে পলাইয়া গেলেন। এরূপ আচরণের-কারণ কি?"

কাজী উত্তর করিলেন "তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা হইতেন; সে সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল, তুমি আমার ভাগিনেয়। দেহসম্বন্ধ হইতে গ্রামসম্বন্ধ আমার কাছে গৌরবের জিনিষ; সুতরাং তুমি আমার যে, সে, নও। বলিতে কি বাপু হে! তুমি ক্রোধ করিয়া আসিতেছিলে দেখিয়া আমি লুকাইয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম তোমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে; অমনি আসিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। ভাগিনা বলিয়া যেমন আমি তোমার ক্রোধ সহিলাম, তেমনি তুমি কি মাতুলের অপরাধ মার্জ্জনা করিবে না?"

গৌর। অবশ্য করিব; মামা ভাগিনাতে কি বিবাদ রাখিতে আছে? মহাশয়! আমি দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি; অভয় দিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

কাজী। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।

গৌর। আচ্ছা আপনারা গোবধ করেন কেন? যাহার সুমধুর দুগ্ধপানে শরীর পুষ্ট হয়, যাহার পরিশ্রমে জীবনোপায় শস্য সকল উৎপন্ন হয়,

আপনারা কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেই গাভী ও বৃষের প্রাণবধ করিয়া ভোজন করেন?

কাজী। তোমাদের বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় আমাদের কোরাণশাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দুইটী পথ আছে। নিবৃত্তি মার্গে জীবহিংসামাত্র নিষেধ, কিন্তু প্রবৃত্তিপথে গোবধের বিধি আছে। শাস্ত্রাজ্ঞায় আমরা গোবধ করি, তাহাতে দোষ কি? কেন তোমাদের বেদেও তো গোবধের বিধি দেখা যায়।

গৌরচন্দ্র কাজীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন 'বধ করিয়া পুনর্জীবিত করিতে না পারিলে বধ নিষেধ। পুরাকালে ঋষিগণ বৃদ্ধ বৃষকে মারিয়া খাইয়া পুনরায় তাহাকে যৌবনাবস্থায় পুনর্জীবিত করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের মারা হইত না। কলিযুগে ব্রাহ্মণদের সেরূপ ক্ষমতা নাই; সেই জন্য এ যুগে গোবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।' এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ গোহত্যার বিরুদ্ধে অশেষ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কাজীকে গোবধের অপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। কাজী তাঁহার অখণ্ডনীয় যুক্তিবলে পরাজিত হইয়া গেলেন। গৌরচন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "মামা! আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঠিক উত্তর দিবেন।"

কাজী উত্তর করিলেন, "যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর।"

গৌর। আচ্ছা! আপনি তো পূর্ব্বে মৃদঙ্গ করতাল ভাঙ্গিয়া দিয়া সংকীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার পরে এখন পর্য্যন্ত প্রবলতর রূপে কীর্ত্তন হইতেছে, তথাচ আর বাধা দেন না কেন? আপনারা মুসলমান, হিন্দুর আচার আচরণে বাধা দেওয়া ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন; তবে কেন এখন এত সদ্ব্যবহার করিতেছেন?'

কাজী উত্তর করিলেন "একটু নিভৃতে চল, এ কথার জবাব দিব।"

শচীনন্দন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ সকল লোক আমার অন্তরঙ্গ, যাহা বলিবার থাকে, নিঃশঙ্কে বলিতে পারেন।"

তখন অনুতপ্ত কাজী ধীর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেনঃ—"তোমার সংকীর্ত্তন আরম্ভের পর পাষণ্ডীরা তোমার বিরুদ্ধে আমাকে কত কথা জানাইয়াছে। তাহারা বলে, "নিমাই পণ্ডিত শাস্ত্রোক্ত হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিয়া কোথা হইতে এক অদ্ভুত কীর্ত্তন আনিয়াছে, অষ্টপ্রহর তাহা গাইয়া এবং লোকদিগকে শিখাইয়া নগরের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। তাহারা

মাতালের মত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় ও ধূলায় গড়াগড়ি যায় ও কত অসম্বদ্ধ বকে। পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির পূজায় কেবল রাত্রি জাগরণ হইত, এখন প্রত্যহই রজনী জাগরণ; তাহাদের দৌরাত্ম্যে রাত্রিতে কেহ ঘুমাইতে পারে না। আপনি বিচারক! আপনিই ইহার বিচার করুন।" আমি তাহাদের অভিযোগের তদন্ত জন্ত একদিন দুই এক স্থানে যাইয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু সেই রজনীতে স্বপ্ন দেখিলাম যে এক নরদেহ সিংহমুখ বিকটাকার পুরুষ আসিয়া তর্জ্জন করিয়া আমার বুকে বসিয়া বিশাল নখ ও দশন দিয়া আমার বুক বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং দন্ত কড়মড় করিয়া বলিতে লাগিল ঃ—"আরে! দুষ্ট! আমার কীর্ত্তনে তুই উৎপাত করিস্? এত বড় স্পর্দ্ধা? মৃদঙ্গের বদলে তোর বুক ফাড়িয়া দিব। আর যদি কিছু বলিস্, তবে সবংশে যবনকুল ধ্বংস করিব। আজ আর কিছু বলিলাম না।"

গৌর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তার পর?'

কাজী। "আমি স্বপ্ন অমূলকজ্ঞানে ভীত না হইয়া কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ত পেয়াদা নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথা হইতে অগ্নি উল্কা লাগিয়া তাহাদের দাড়ি গোঁপ পুড়িয়া যাওয়ায়, তাহারা ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবাবেশে মত্ত হইয়া হরে! কৃষ্ণ! বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে ও কেহ কেহ বা পাগল হইয়া গিয়াছে। আমি ইহাও আকস্মিক ঘটনাজ্ঞানে গ্রাহ্য না করিয়া আজ তাহাদের কত তিরস্কার করিতেছিলাম। কিন্তু সেই দৃশ্য! সেই ভীষণ সিংহ আবার আসিয়া যেন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত! এবার স্বপ্ন নয়, সত্যই দুর্জ্জয়সিংহ! তখন আমি জ্ঞানশূন্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম, অনুচরবর্গ ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই দেখ আমার বুকে তাহার নখ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।" এই বলিয়া কাজী বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বুক দেখাইলে সকলে সেখানে নখ দন্তের চিহ্ন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। কাজী আবার বলিতে লাগিলেন, "গৌরহরি! আমি এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে; আমি আর ইহাতে বাধা দিতে পারি না, দিলে দেবদ্রোহী হইব।" বলিতে বলিতে কাজীর নয়ন যুগল দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

তখন শচীনন্দন কাজীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া পরমাত্মীয়জ্ঞানে বলিতে লাগি-

লেন "মামা! তুমি বড় ভাগ্যবান্, তাই 'হরে কৃষ্ণ, নারায়ণ,' নাম গ্রহণ করিলে। যে নাম লইলে মহাপাপী উদ্ধার হইয়া যায়, তুমি তাহাই উচ্চারণ করিলে; তোমার শরীরে আর পাপ নাই।"

কাজী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "নিমাই! তোমার প্রসাদে আমার সব কুমতি দূর হইয়াছে; এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাতে আমার ভক্তি ও বিশ্বাস অচল থাকে।"

গৌর বলিলেন, "পতিতপাবন শ্রীহরি আপনার মঙ্গল করিবেন; কিন্তু মামা! আমাকে একটী ভিক্ষা দাও, যেন নবদ্বীপে আর হরিসংকীর্ত্তনের বাধা না হয়।"

কাজী উত্তর করিলেন, 'যাবৎ আমার বংশ থাকিবে, আমি তালাক দিতেছি, কেহই সংকীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না।'

কাজীর অধস্তন বংশীয়েরা বরাবর এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন। শুনিতে পাই এখনও ঐ বংশ বিদ্যমান্ আছে; এখনও নাকি ঐ বংশীয় মুসলমানেরা বৈষ্ণব অতিথি উপস্থিত হইলে পরম সমাদরে সেবা করিয়া থাকেন।

গৌরচন্দ্র কাজীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসংখ্য মৃদঙ্গ করতালের শব্দের সহিত অসংখ্য মানবকণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া পূর্ণিমার নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল; নবদ্বীপপুরী যেন সুখতরঙ্গে ভাসিতে লাগিল; আনন্দ-বিহারী সংকীর্ত্তন-দলে জীবন্তরূপে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন; ভক্তবৃন্দের চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; প্রেমবন্যার খরতর স্রোতে কত কত পাষণ্ডীদিগের চিত্তরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিল; সকল উৎপাত শান্তি হইয়া ভগবানের মহিমা মহীয়ান্ হইল; এবং গৌরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। গৌর আজ প্রেমানন্দে ভরপুর, কাজীর কণ্ঠ ধরিয়া হরিবোল বলিতে বলিতে রাজপথ দিয়া নাচিয়া চলিলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া কাজী গৌরের নিকট বিদায় হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাজীর উপাখ্যান সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতের বর্ণনার সহিত চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনার বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ভাগবতের মতে কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হওয়ায় চরিতামৃতের মতানুসারেই বর্ত্তমান প্রস্তাব

লিখিত হইল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, গৌরচন্দ্র কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে কাজীসাহেবের ঘর, বাড়ী, বাগান, ভাঙ্গিতে আর তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কাজী পলায়ন করিলে গৌরের উন্মত্ত দল কাজীর ঘর দুয়ার, বাগান, বাড়ী, ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শচীনন্দন ক্রোধে অধীর হইয়া কাজীর বাড়ীতে আগুণ লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলে ভক্তগণ নাকি স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। তাই কাজী রক্ষা পাইয়াছিলেন। অবশেষে গৌরচন্দ্র কাজীকে দণ্ড দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল কি না ও কি করিয়াই বা তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইল, ভাগবতের বর্ণনায় তাহার কোন কথা লেখা নাই। দণ্ড দেওয়ার অর্থ যদি কাজীর ঘর বাড়ী বাগান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; তবে প্রস্তাবটী বড়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে ও সংকীর্ত্তন প্রচারের মূল উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাত করা হয়। আর যদি ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া ও দগ্ধ করিয়া ফেলা রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কাজীর আসক্তির ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া পাপবনে আগুণ লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে প্রস্তাবিত কথার সামঞ্জস্য হইলেও উপাখ্যানটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কারণ কেমন করিয়া কাজীর পাপাসক্তি নষ্ট করিয়া তাহাকে উদ্ধার করা হইল; তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু যে ভাবের বর্ণনা দেখা যায়, তাহা হইতে আধ্যাত্মিক ভাব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। আমরা জানি যে বৃন্দাবন দাস মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর ভক্ত; গৌরচরিতে কঠোর অপ্রেমের দোষারোপ করা তাঁহার মনে থাকিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার বর্ণনা দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে এ কথা এখানে বলিতে হইল। ইহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, ভক্তপাঠক অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন।

সে যাহাহউক কাজী বিদায় হইয়া গেলে সঙ্কীর্ত্তনের দল শঙ্খবণিক পাড়া, তন্তুবায়পাড়া প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থান সকল প্রদক্ষিণ করিয়া গাদিগাছা, আহুদিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকল নগরই শোভনীয়রূপে মণ্ডিত, পথের দুই ধারে দীপমালা, আম্রশাখা ও কদলীতরুরাজি, নানাবিধ পুষ্পমালায় শোভা পাইতেছে, পুরাঙ্গনারা উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ করিতেছেন, আর খই, কড়ি, কুসুম স্তবক, বর্ষণ করিতেছেন; নগরবাসিগণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আজ মহামহোৎ-

সবে মাতিয়াছে। ভক্তদল মত্তমাতঙ্গের ন্যায় নাচিতে নাচিতে অবশেষে নগরের শেষপ্রান্তে শ্রীধরের ভগ্ন কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো উদয় হইল; ভগ্ন কুটীর রাজপ্রাসাদে পরিণত হইল। তাই তরকারীবিক্রেতা প্রেমানন্দে ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ঘরের দুয়ারে একটী নানা স্থানে তালি দেওয়া জলপূর্ণ লৌহপাত্র ছিল। বাহিরের কাজে লাগাইবার জন্য গৃহস্বামী ঐ পাত্রটী বাহির দুয়ারে রাখিতেন। গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের শ্রমে পিপাসিত হইয়া ঐ পাত্রের জল পান করিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া "মারিলে রে! মারিলে রে! আমাকে সংহার করিতে তুমি এখানে আসিয়াছ!" বলিতে বলিতে দৌড়িয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বলিলেন "প্রভু! উহা অপবিত্র জল, পান করিবেন না।" শচীনন্দন উত্তর করিলেন "কি? ভক্তের জল অপবিত্র? তবে পবিত্র কি? আজ আমি এই অমৃত জল পান করিয়া পরম পবিত্র হইলাম।" গৌরের নয়ন দিয়া আনন্দ ধারা পড়িতে লাগিল।

তখন শ্রীধরঅঙ্গনে একটা মহাপ্রেমের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। প্রভুর ক্রন্দনে ভক্তদল সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। হাজার হাজার লোকের রোদন ধ্বনিতে আকাশ তোলপাড় হইয়া গেল। এখন আর কীর্ত্তন নাই; কেবল ক্রন্দন আর লুণ্ঠন। এই স্বর্গের দৃশ্য যিনি দেখিলেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়া গেলেন। রজনীপ্রভাতে সংকীর্ত্তন দল গৌরের আঙ্গিনায় ফিরিয়া আসিলে, ভক্তগণ যে যাহার আবাসে চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ—বিশ্বরূপ দর্শন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রাতঃকালে ভক্তদলের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য গোপীভাবে নৃত্য করিতেছেন। বিশ্বম্ভর কার্য্যান্তরে নিজগৃহে অনুপস্থিত। নিত্যানন্দ নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। আজ অদ্বৈতের প্রেম-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। দন্তে তৃণ করিয়া অতি দীনভাবে তিনি ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। কখন কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন; এবং কখন মহাভাবে মগ্ন হইয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন। বেলা দুই প্রহর

হইয়া গেল, তথাচ তাঁহার ভাবের জমাট ছুটিল না। তখন সকল ভক্ত তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিছু স্থির হইয়া আচার্য্য বিষ্ণুমণ্ডপের দুয়ারে মৌনভাবে বসিলেন দেখিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে অদ্বৈতের ভাবসিন্ধু আবার উদ্বেলিত হইল। তিনি একাকী ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ বিশ্বম্ভর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া উভয়ে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন "আচার্য্য গোঁসাই! আজ কি দেখিতে চাও?"

অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "যাহা দেখিবার সাধ ছিল, সে সবই তো দেখিয়াছি; নূতন আর কি দেখাবে?"

বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'নূতন সাধ কি কিছুই নাই?'

অদ্বৈত। আছে—একটা সাধ; কিন্তু যদি মনে কর যে আমি তোমাকে পরীক্ষা কর্‌ছি, তবে না বলাই ভাল।

বিশ্বম্ভর। তা' হলে এ টুকুও তো না বলাই ভাল ছিল।

অদ্বৈত। তবে শুন। রথোপরি শ্রীকৃষ্ণের যে বিরাট্ রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ দেখিতে বড় সাধ হয়। এই কথার প্রতিধ্বনি আকাশে বিলীন হইতে না হইতে আচার্য্য সেই ক্ষুদ্র গৃহে কুরুপাণ্ডবের সমরভূমি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যস্থলে অর্জ্জুনের রথ সংস্থাপিত; তাহার উপরে ভগবান্ বিরাট্-রূপ ধারণ করিয়া সমাসীন; কুন্তীনন্দন ভয়ে ত্রস্ত হইয়া জোড় হাতে ভগবানের স্তব করিতেছেন। ভগবানের দেহমধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, চরাচর স্থাবর-জঙ্গম সমাশ্রিত; কোটি কোটি সৌরজগতের অগণ্য সিন্ধু, গিরি, নদ, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য, বন, উপবন, পশু, পক্ষী, নর, নারী, শোভা পাইতেছে; সহস্র সহস্র হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা, গ্রীবা, উর্দ্ধে তদূর্দ্ধে বিলীন হইয়াছে; মস্তক সমূহের কিরীট অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে; সহস্র সহস্র হস্ত, পদ, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; আকাশ, কাল, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, শোভা, সৌন্দর্য্য, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, কাম, ক্রোধাদি, শম, দম, তিতিক্ষাদি, অনন্ত শক্তিরাজি ক্রীড়া করিতেছে; লোকভঙ্গনিবারণার্থে ভগবান্ সেতু-স্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আচার্য্য গোঁসাই এইরূপ

দেখিয়া বিহ্বল হইয়া গেলেন ও দন্তে তৃণ করিয়া বিশ্বম্ভরের চরণযুগলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাহির দিক্ হইতে কপাটে আঘাত পড়িতে লাগিল; বিশ্বম্ভর বুঝিলেন, নিতাই নগরভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি শীঘ্রগতি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে নিত্যানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিতাইও বিরাট্‌রূপের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে দেখিতে ভাবসাগরে ডুবিয়া গেলেন। বিশ্বম্ভরের ঐশ্বর্য্যভাব উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইতে লাগিল। তিনি প্রশান্ত বাক্যে উভয়কে সম্বোধন করিয়া 'দেখ! দেখ!' বলিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দেখিতে দেখিতে নিমীলিত নেত্রে ভূমিতে পড়িয়া গেলে, বিশ্বম্ভর কোলে তুলিয়া নানা রূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সুস্থ করিলেন। অনন্তর কিছুকাল পরে ভাবের নেশা ছুটিয়া গেলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রেমকলহ বাঁধিয়া গেল। অদ্বৈত বলিলেন, "কোথা হইতে মাতালটা আসিয়া সব গোলমাল করিয়া দিলে? ও কি দেখিতে কি দেখে? কি বলিতে কি বলে? তাহার কিছুরই ঠিক নাই। ওর জাত নাই, কুল নাই, যার তার ভাত খায়, আবার বলে আমি পরমহংস। পরমহংসগণ আত্মারাম যোগী। ওটা কেবল ব'কে ব'কে মরে ও যা'তা অসম্ভব কথা বলে।"

নিতাই জবাব দিলেন "বটে বুড়ো বামন্! তোর ভীমরথি হয়েছে; নইলে দেবতার ঘরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখিস্ ও আবার সাহস করে বলিস্ যে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছিস?"

অদ্বৈত সুর করিয়া "আমি তো দেখেছি! দেখেছি! দেখেছি।" বলিতে বলিতে নাচিতে লাগিলেন।

নিতাই। "তবে আমিও তো দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি," বলিয়া তেমনি করিয়া নাচিতে লাগিলেন।

বিজয়দাস আখরিয়া।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন—'ব্রহ্মচারিন্! আজ তোমার গৃহে আমাদের মধ্যাহ্ন নিমন্ত্রণ। তুমি স্বহস্তে পাক করিও, যেন আর কাহাকেও রাঁধিতে ডাকিও না।" শুক্লাম্বর ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; বিশ্বম্ভরের এই কথা শুনিয়া মহাচিন্তিত হইলেন। কেমন করিয়া তাঁহার স্পৃষ্টপাক নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় ব্রাহ্মণপুত্র খাইবেন, ইহাই তাঁহার ভাবনা

হইল; অথচ তিনি প্রভুর আদেশ অন্যথাও করিতে পারেন না। ভক্তগণ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া পরামর্শ দিলেন যে, 'গঙ্গাজলে আলগোছে পাক চড়াইয়া দিবে, প্রভু যাইয়া স্বহস্তে তাহা নামাইয়া লইবেন।' ভিক্ষুক তাহাই করিতে চলিল। গঙ্গাতীরে ঘাটের উপরে তাহার কুটীর। সেই কুটীরের পিঁড়াতে উনুন পরিষ্কার করিয়া গর্ভথোড় ভাতে দিয়া সে পাক চড়াইয়া দিল। গর্ভথোড় ব্যতীত সে দিন তাহার আর কোন তরকারী সংগ্রহ হইল না। যথাকালে নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বম্ভর স্নানান্তে আর্দ্র বসনে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "শুক্লাম্বর! ভোজনের কি আয়োজন করেছো?" ব্রহ্মচারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"প্রভু! আমি দরিদ্র ভিক্ষুক, তোমার ভোজনের যোগ্য সামগ্রী কোথায় পাইব? গর্ভথোড় মাত্র সম্বল ছিল, তাহাই ভাতে দিয়া ভাত চড়াইয়াছি; তুমি নামাইয়া লও" এই বলিয়া উনুনের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি নামাইয়া দাও না কেন?"

শুক্লাম্বর। "বাপ্ রে! তা পার্‌বো না; অনেক করেছি, এই পাপ হস্তে তোমাকে অন্ন দিতে পারিব না। তোমার চরণে ধরি প্রভু! আমা হইতে এ কাজ হইবে না। তুমি নামাইয়া খাও।"

বিশ্বম্ভর ভিক্ষুকের গতিক দেখিয়া নিজেই ভাতগুলি ঢালিয়া লইয়া উপস্থিত কয়েক জনের জন্য পরিবেশন করিয়া ভোজনে বসিলেন। দুই একগ্রাস খাইয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন "অহে শুক্লাম্বর! আমি সত্য বলিতেছি, এমন সুস্বাদু গর্ভথোড় তো কখন খাই নাই; আচ্ছা বল দেখি আলগোছে এমন সুস্বাদু পাক কেমন করিয়া করিলে? সন্ন্যাসী ভয়ে ও সঙ্কোচে জড় সড় হইল; মনে করিল, বুঝি গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু সে যখন দেখিল যে, তাহার রন্ধনের সুখ্যাতি করিতে করিতে গৌরের গণ্ড দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল, তখন তাহার আর কোন সন্দেহ থাকিল না। অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। এদিকে বিশ্বম্ভরের প্রেম-ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভিক্ষুকের কুটীরে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ সঙ্গে বিশ্বম্ভর সেইখানেই শয়ন করিলেন। বিজয়দাস নামে জনৈক ভক্ত বিশ্বম্ভরের পার্শ্বে শুইলেন।

বিজয়দাসের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও পরিষ্কার; এবং তিনি অতি অল্প সময়ে অনেক লিখিতে পারিতেন। তাঁহার ব্যবসায় পুঁথি লেখা। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় এক শ্রেণীর লোককে গ্রন্থ লিখন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। ইহাদিগকে সচরাচর 'আথরিয়া' বলিত। বিজয়দাস এই শ্রেণীর লোক। সে ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভরকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছে। পুস্তক লিখনবিষয়ে তাহার ক্ষিপ্রহস্ততা ও লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া গৌরাঙ্গ তাহার নাম 'রত্নবাহু' রাখিয়াছিলেন। সে প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র; তাই আজ তাঁহার পার্শ্বে শুইতে জায়গা পাইয়াছে। কিছুকাল পরে সকলেই নিদ্রিত হইলেন। গৌরচন্দ্র নিদ্রাবেশে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিজয়ের অঙ্গে চাপাইয়া দিলে বিজয় অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইল। সে দেখিল, স্তম্ভের ন্যায় অতি দীর্ঘ ও সুবলিত একখানি হস্ত আসিয়া তাহার উপর পড়িল; উহাতে নানা রত্ন অলঙ্কার বিভূষিত ও সূর্য্যকান্তমণি ও চন্দ্রকান্তমণি জ্বলিতেছে; আর তাহার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিজয় আনন্দ ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া আর সকলকে ডাকিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে বিশ্বম্ভর তাহার মুখে হস্ত দিয়া নিবারণ করিয়া বলিলেন, "যত দিন আমি নবদ্বীপে থাকি, তত দিন এ কথা কাহা-কেও বলিও না।" তথাচ বিজয় সুস্থির থাকিতে পারিল না; সে লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিল। তাহার হুঙ্কার শব্দে ভক্তগণ আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া 'কি হইল? কি হইল?' জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন। বিজয় কোন উত্তর না দিয়া পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া বসাইতে গেলে অমনি সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তগণ বুঝিলেন, হয়ত সে প্রভুর কোন বৈভব দর্শন করিয়া থাকিবে। গৌরচন্দ্র এতক্ষণ শুইয়া ছিলেন; গোলযোগ শুনিয়া উঠিয়া বিজয়কে তদ-বস্থ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন যে "বিজয়ের গঙ্গার উপর বড় অনুরাগ, হয়ত গঙ্গার মহিমা-পূর্ণ কোন ঐশ্বর্য্য দেখিয়া থাকিবে; নচেৎ শুক্লাম্বরের এই গৃহে দেবাধিষ্ঠান আছে। নইলে এমন হইবে কেন? কৃষ্ণই ইহার গূঢ় রহস্য জানেন।" ভক্তগণ প্রভুর এই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগি-লেন। তখন বিশ্বম্ভর বিজয়ের অঙ্গে হাত দিয়া নানা প্রকারে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। চেতনা লাভ করিয়াও বিজয় প্রকৃতিস্থ হইল না; কতক দিন পর্য্যন্ত সে আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

জড়ের ন্যায় নির্ব্বাক্ অবস্থায় নবদ্বীপের পথে পথে বেড়াইতে লাগিল। অনেক যত্নের পর বহুদিন পরে সে স্বাস্থ্য লাভ করিল; কিন্তু বিশ্বম্ভরের আজ্ঞানুসারে প্রকৃত রহস্য কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলিল না।

শ্রীবাসের পুত্রশোক।

সন্ধ্যার সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাসের বাহির বাটীতে প্রমত্ত ভাবে সংকীর্ত্তন হইতেছে। গৌরচন্দ্র প্রেমে বিভোর হইয়া খুব নৃত্য করিতে-ছেন। ভক্তগণ নিমগ্ন ভাবে প্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন, আর সংকীর্ত্তন করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে শ্রীবাসের একটী বালক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শয্যাগত ছিল; আজ হঠাৎ তাহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় বাটীর মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন; রোদনের শব্দ শুনিয়া কারণ বুঝিতে পারিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে দ্বার উন্মোচন করিয়া উঠিয়া আসিলেন। গৌরচন্দ্র কৃষ্ণানন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে ছিলেন; সুতরাং কিছু বুঝিতে পারিলেন না। পণ্ডিতজী মহাজ্ঞানী, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত; বাটীর মধ্যে আসিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে স্ত্রীদিগকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ আয়ুঃক্ষয় হইলে কেহ তাহাকে রাখিতে পারে না। এই শিশুর যত দিন কর্ম্ম নির্ব্বন্ধ ছিল, সে তত দিন আমাদের পুত্র হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল; এক্ষণে তাহার কর্ম্মবন্ধ শেষ হইল, এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল। ভাবিয়া দেখ, কে কাহার পুত্র? আর কেই বা কাহার পিতা মাতা? অন্তকালে যে কৃষ্ণের নাম শুনিলে মোক্ষ লাভ হয়, সেই প্রভু স্বয়ং আমাদের গৃহে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন। ইহাতে কি আর শোক করিতে আছে? এই শিশুর পরম ভাগ্য যে এমন সময় পরলোকগামী হইল।" মহিলাগণ ইহাতেও ক্রন্দন সম্বরণ করিল না দেখিয়া শ্রীবাস কিছু দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যদি তোমরা মায়াভিভূত হইয়া একান্তই রোদন সম্বরণ না করিতে পার, তবে আমার এই অনুরোধ যে কিছুক্ষণ পরে কাঁদিও। তোমাদের ক্রন্দন ধ্বনিতে যদি প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ছেলে তো গেলই; আমিও সেই সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব।" এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা অগত্যা চুপ করিল। মৃত শরীরের নিকট তাঁহাদের বসিয়া থাকিতে বলিয়া বিশ্বাসী

শ্রীবাস বাহির বাটীতে যাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। ধন্য পণ্ডিত! তুমিই ধন্য! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা ও প্রভুভক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত একে একে ভক্তগণ সকলেই পণ্ডিতের পুত্রবিয়োগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পাছে প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেহই কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। রজনী প্রায় শেষ হইলে মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল। তিনি সকলের মুখপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাদের সকলেরই মুখ মলিন দেখিতেছি কেন? পণ্ডিতের গৃহে তো কোন অমঙ্গল হয় নাই?" শ্রীবাস উত্তর করিলেন, "যাহার ঘরে তোমার প্রসন্ন মুখ, তাহার দুঃখ কিসের?" কিন্তু আর সকলে পণ্ডিতের পুত্র বিয়োগের সংবাদ বলিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ?" তাঁহারা বলিলেন, "চারি দণ্ড রাত্রির সময়; কিন্তু তোমার আনন্দ সুখ ভঙ্গ হইবে ভয়ে পণ্ডিতজী একথা প্রকাশ করিতে দেন নাই। আড়াই প্রহর হইল শিশু মরিয়াছে, এক্ষণেও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয় নাই; ইহাতে যেমন অভিপ্রায় হয়।"

শ্রীবাসের এই অদ্ভুত চরিত্রের কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র "গোবিন্দ! গোবিন্দ!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মনের গূঢ় কথা, যাহা এতদিন কাহাকেও জানিতে দেন নাই, প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "হায়! যাহারা আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; আমি কোন্ প্রাণে তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব?"

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে 'ত্যাগ' কথা শুনিয়া ভক্তগণ বিষম চিন্তিত হইলেন, ও ভাবিতে লাগিলেন, "কাহাকে ত্যাগ করিবেন?" কিন্তু বিশেষ কথা কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেহ এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। এ দিকে গৌরচন্দ্র ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া সবান্ধবে মৃত পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিতে উঠিলেন এবং বাটীর মধ্যে যাইয়া মৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"শ্রীবাসের গৃহ ছাড়িয়া কেন যাইতেছ?" মৃত উত্তর করিল "যাহা নির্ব্বন্ধ ছিল, হইয়া গেল; এক্ষণে অন্য নির্ব্বন্ধিত স্থানে চলিলাম। নিয়তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। আপনি কি জানেন না, কেহই কাহারও পিতা মাতা নহে? জীব স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; যত দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল, ততদিন

এখানে ছিলাম। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমাকে সপার্ষদে প্রণাম; আমার অপরাধ লইও না; বিদায়।" এই বলিয়া মৃত শরীর নীরব হইল।

দ্রষ্টৃবর্গ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেল; শ্রীবাসের পরিজনবর্গ এতক্ষণ শোক করিয়া কাঁদিতেছিল; এই অলৌকিক ঘটনায় তাঁহাদের শোক দূর হইল। সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া মহাপ্রভুর জয় ঘোষণা করিতে করিতে প্রেমাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাই মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভো! তুমিই আমার পিতা মাতা ও পুত্র; এ সংসারে আমার আর কেহ নাই; বিপদে সম্পদে রোগে শোকে, যে অবস্থায় থাকি না কেন, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাতে অচলা ভক্তি থাকে।"

গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন "শ্রীবাস! তুমি তত্ত্বজ্ঞানী পরম বিবেকী, এ সংসারের অনিত্যতা তোমার কিছুই অবিদিত নাই। এ সংসারের ধন জন যৌবন সুখ সম্পদ, সকলই বিদ্যুতালোকের ন্যায় চকিত দেখা দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়? আমি আর তোমাকে কি বুঝাইব? এ সংসারের দুঃখ তোমার ন্যায় জ্ঞানীকে ত অভিভূত করিতেই পারে না; যে তোমার সংসর্গ করে, সেও ইহাতে মুগ্ধ হয় না।" মালিনীর দিকে তাকাইয়া গৌর আবার বলিতে লাগিলেন, "মা! পিতা! আজ হইতে তোমরা আমার পিতা মাতা হইলে; আমি ও নিত্যানন্দ তোমাদের যুগল নন্দন। এক পুত্র গেল, দুই পুত্র পাইলে; ইহাতে আর শোক কি?"

গৌরের এই কারুণ্যময় কথা শুনিয়া শ্রীবাস মালিনীর শোক-সন্তপ্ত প্রাণ গলিয়া গেল; ভক্তবৃন্দ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং শ্রীবাস অঙ্গনে প্রেমতরঙ্গ খেলিতে লাগিল। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বালকের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

গোপীভাব।

এখন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মভাব নিত্য নূতন শ্রী ধারণ করিতে লাগিল। দিবা নিশি, গৃহে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, চত্বরে, প্রাঙ্গণে নয়ন, বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। ইহার উপরে তিনি যদি কাহাকেও কোন গতিকে হরি বলিতে শুনিতে পাইতেন, অমনি

ভাবের ঘরের কপাট খুলিয়া গিয়া, কম্প, পুলক, ও মহাভাব তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া তুলিত। এক হরিনামের মধ্যে তিনি এত সৌন্দর্য্যপূর্ণ মাধুর্য্য দেখিতেন যে, নাম শ্রবণে একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন; কি বলিতেন, কি করিতেন, কোথায় যাইতেন, কিছুরই ঠিক থাকিত না। কখন তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেন, কখন ভাবে নিমগ্ন হইয়া তুষ্ণী-স্তাব অবলম্বন করিতেন, কখন মহাক্রোধাবেশে পাষণ্ডী-সংহার করিতে চাহিতেন এবং কখন স্বানুভবানন্দে বিভোর হইয়া "আমি সেই, আমি সেই," বলিয়া চীৎকার করিতেন। বন্ধুগণ এই অবস্থায় তাঁহার শরীর রক্ষার্থ সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। পান ভোজন আদি দৈহিক ক্রিয়ার কিছুই ঠিকানা থাকিত না। কেবল জননীকে দেখিলে বা তাঁহার নাম শুনিলে গৌরচন্দ্র কিছু প্রকৃতিস্থ হইতেন। এই জন্য যে, পাছে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে। এক দিন ভাবাবেশে গৌর শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন "শ্রীবাস! আমার বাঁশী কৈ?" পণ্ডিত বলিলেন, 'তোমার বংশী গোপীগণ হরণ করে লয়েছেন।' এই কথায় শচীনন্দন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া আবেশে "বোল! বোল!" বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত তাঁহার মনোগতি বুঝিয়া ভাগবতের রাসাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৃন্দাবন মাধুর্য্য বর্ণিত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া যেরূপে গোপাঙ্গনারা নিকুঞ্জবনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে যেমন করিয়া কৃষ্ণ কথোপকথন করিয়াছিলেন, যেরূপে তাঁহাদের সঙ্গে লীলা কৌতুক হইয়াছিল; কৃষ্ণান্তর্দ্ধান হইলে গোপীগণ যেমন করিয়া প্রতি তরু, লতা, পশু, পক্ষী, পর্ব্বত, নদীর নিকট ব্যাকুলান্তঃকরণে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন; যেমন ভাবে মহারাসে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতি গোপীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া গোপীসঙ্গে পুলিন-ভোজন ও জলকেলই হইয়াছিল, সুবক্তা শ্রীবাস পণ্ডিত একে একে সুমধুর ভাষায় সকলি বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তিনি গোপীভাবে মাতোয়ারা হইয়া কেবল "গোপী! গোপী! বৃন্দাবন, নিধুবন, মথুরা, গোকুল" প্রভৃতি নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তিনি ভূপৃষ্ঠে ত্রিভঙ্গ মুরারি শ্যাম মূর্ত্তি লিখিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে আবার "আমি জন্মে জন্মে কৃষ্ণদাস"

বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন। ভক্তগণ এই অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার গৃহ মধ্যে রাখিয়া আসিলে গৌরচন্দ্র ঘরের দাওয়াতে বসিয়া "গোপী' নাম উচ্চ করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। রাসলীলার ছবি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়াছিল; তাই গোপী ভাবের নেশা তখনও ছুটে নাই।

এই সময়ে একজন টোলের পড়ুয়া কার্য্যান্তরে আসিয়া তাঁহাকে 'গোপী' নাম জপ করিতে শুনিতে পাইয়া বলিল "পণ্ডিত মহাশয়! (ছাত্রেরা এখনও গৌরকে পণ্ডিত শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকে।) 'গোপী' নাম জপ করিয়া কি হইবে? কৃষ্ণ নাম বলুন যে পুণ্যোদয় হবে; গোপী নাম জপ করিবার উপদেশ তো কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না।" অজ্ঞ পড়ুয়া প্রেম ভক্তির কি জানিবে? তাই সে এইরূপে সম্বোধন করিল। গৌরচন্দ্র তখন ভাব মহলের অন্তঃপুরে; সুতরাং পড়ুয়াকে যে উত্তর দিলেন, তাহাও ভাবময়। তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ তো চোর, লম্পট, ধূর্ত্ত ও মহাদস্যু; তাহার ভজনা করিলে কি হইবে? সে মহা কৃতঘ্ন। তা'না হলে সে বিনা দোষে বালী রাজাকে কেন প্রাণে মারিবে? ছলনা করিয়া বলী রাজাকে কেন পাতালে পাঠাবে? স্ত্রীজিত হইয়াও কেন রমণীর নাক কাণ কাটিবে? আর বাঁশীর গানে কুলবধূর কুল মজাইয়া কেন কলঙ্কিনী করবে? তা'কে ভজলে কি ফল?" এই বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভর ক্রোধে অধীর হইয়া সম্মুখস্থিত বৃহৎ যষ্টি হাতে লইয়া পড়ুয়াকে যেন মারিবার জন্য ধাবিত হইলেন। পড়ুয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া নিজ টোল মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অন্য অন্য পড়ুয়াদিগকে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া কত প্রকারে গৌরকে তিরস্কার করিতে লাগিল। পড়ুয়াগণ তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া নিমাই পণ্ডিতকে মারিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। একজন বলিল "আরে ভাই! যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে, সে আবার কিসের বৈষ্ণব?"

দ্বিতীয় উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ সন্তানকে যে মারিতে যায়, সে ব্রহ্মহত্যাকারী; তাহার ধর্ম্ম কোথায়?" তৃতীয় ছাত্র বলিল "ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা কথা; বেটা সেয়ানা পাগল, দশটাকে উচ্ছন্ন দিবে, তাহারই চেষ্টায় আছে।" চতুর্থ ব্যক্তি সাহঙ্কারে কহিল "সে মারিবে; আমরা কি আর মারিতে জানি না; যার অমনি পড়িয়া আছে আর কি?"

পঞ্চম ব্যক্তি কহিতে লাগিল "আরে! কাল তার সঙ্গে আমরা একত্র পড়িলাম, আজ সে মহা মহান্ত গোঁসাই হইয়া গেল! রাতারাতি স্বর্গে যাওয়া আর কি? সে না হয় জগন্নাথ মিশ্রের বেটা; আমরাও কম ঘরের ছেলে নই।"

এই প্রকারে দুর্দ্দান্ত পড়ুয়ার দল নগরের যেখানে সেখানে যাহার তাহার নিকট গৌরের কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং তাঁহাকে দেখিলেই মারিবে, মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

রজনী ঘোরা। বিশ্বম্ভর গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে কেহ দাঁড়াইলে দেখিতে পাইত সে নিদ্রা কি সুখের নিদ্রা। অনিন্দ্য মুখশ্রীতে সুখ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; ললাটে অল্প অল্প ঘর্ম্মবিন্দু, অধর ওষ্ঠ প্রকাশোন্মুখ কুসুমের ন্যায় ঈষৎ বিস্ফারিত, তাহাতে একটু হাসি মাখান, যেন জীবাত্মা কোন এক অদৃশ্য সুখজগতের সুখ-ভাণ্ডার লুঠ করিতেছে। বিশ্বম্ভর স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে হাসিয়া ফেলিলেন। এতদিন ধরিয়া যে চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে, সত্য সত্যই কি তাহা দেবা-দেশ? সত্য সত্যই কি তিনি নামপ্রেম প্রচারের জন্য প্রেরিত? সত্য সত্যই কি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন আর দেবানুমোদিত নহে? আজ সুখময় স্বপ্নের মধ্য দিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল বলিয়া গৌরের আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। পাঠক মহাশয়! সাবধানে গৌরের স্বপ্ন কথা শুনুন।

সেই গভীর নিদ্রার মধ্যে গৌরচন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন যেন, তিনি এক সুরম্য দেশে নীত হইয়াছেন, চারিদিকে কুসুম উদ্যান, তাহাতে নানা প্রকার সুগন্ধি ফুল ফুটিয়াছে, পাদমূলে কল্লোলিনী স্রোতস্বতী কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে; সেই ফুলবাগানের মাঝখানে একখানি পর্ণকুটীরে একজন মহাপুরুষ আসীন। গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! ধর্ম্ম জীবনের পথ কুসুমস্তরে বাঁধান নয়; এ পথ কণ্টকাবৃত ও বিপদসমাকুল। জাননা কি শাস্ত্রে ইহাকে শাণিত ক্ষুরধারের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে? এ পথের যাত্রীদের কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হয়; কল-

ক্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইতে হয়; প্রাণকে তুচ্ছ করিতে হয়; তবে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করা যাইতে পারে।"

বিশ্বম্ভর সেই মহাপুরুষের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে অবনত মস্তকে বলিলেন, "আজ্ঞা এ সব তত্ত্ব তো জানি।"

মহাপুরুষ। "জান যদি তবে প্রতিপালন কর্‌ছো কই? পরিবার বান্ধব লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করিলে কি প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হইবে?"

বি। আমার প্রতি প্রভুর কি আদেশ?

মহাপুরুষ। ভুলেছো কি? কি জন্য তুমি প্রেরিত হয়েছো, তা কি জান না?

বি। কি জন্য?

মহাপুরুষ। কি জন্য? আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে কামাদির সেবা করিয়া কি আত্মহারা হয়েছো?

হঠাৎ পূর্ব্ব কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইলে যেমন হয়, বিশ্বম্ভর তেমনি সচকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন "নাম প্রেম প্রচার কর্‌তে? বৈরাগ্য ও সেবা শিক্ষা দিতে? আদর্শ ভক্তের জীবন দেখাইতে? তা ভুলি নাই; কিন্তু"—বলিয়াই গৌর কাঁদিয়া ফেলিলেন; "আমার মা—দুঃখিনী পুত্র-বৎসলা মা—"

মহাপুরুষ। মোহ! মোহ! ছি! মোহ পরিত্যাগ কর। কে কার মা, কে কার পুত্র? এ সকল সম্বন্ধের কর্ত্তা ঈশ্বর। তাঁহার ইচ্ছা সকলের উপর। সেই প্রভু যাহাকে যাহা করিতে বলেন, অবিচলিত চিত্তে তাহাই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

বিশ্বম্ভর কিছু দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন "গুরুদেব! আপনি মনে করিবেন না যে, আমি মোহের বশীভূত হইয়া কাঁদিয়াছি। সেই প্রভুই যেমন জীবনের নিয়ামক, তেমনি তাঁহারই ইচ্ছাতে, পিতা, মাতা, ভার্য্যা প্রভৃতির সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে। এ সকল সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যও অবশ্য প্রতিপালনীয়। আমি এত দিন ধরিয়া আমার জীবনের উভয় প্রকার কর্ত্তব্যের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিলাম যে কিরূপে উভয়কে প্রতিপালন করা যাইতে পারে।"

মহাপুরুষ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমায় প্রেরণের সময় ভগবানের নামাঙ্কিত যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া

দেওয়া হইয়াছে। সাবধানে তাহা পাঠ করিবে। তোমার আত্মসুখের জন্য কিছুই নাই। আর তোমার সন্ন্যাসগ্রহণ অপরের ন্যায় কেবল ত্যাগের জন্যও নহে। সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও গার্হস্থ্য, এ তিনের সামঞ্জস্যই তোমার জীবনের প্রেরণা।"

বিশ্বম্ভর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে নিয়োগ পত্র কোথায়?"

মহাপুরুষ এবার কথা না কহিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাঁহার হৃদয়ের দিকে দেখাইলেন। বিশ্বম্ভর বুঝিলেন তাঁহার জীবনই সেই নিয়োগ-পত্র। ভগবান্ স্বহস্তে প্রেম, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য, একত্র মিশাইয়া তাহাতে বিবিধ সদ্গুণের রং ফলাইয়া সুবর্ণ অক্ষরে যে ত্বদীয় জীবনরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সকল তত্ত্বের মীমাংসা হইবে। ভাবিতে চিন্তিতে গৌরের দিব্য জ্ঞানোদয় হইল; ও সেই জ্ঞানের আলোকে আপনার কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়া লইলেন। তখন রাগে অভিমানে আপনার গলদেশের উপবীত খুলিয়া লইয়া ছিন্ন করিয়া বলিলেন "গুরুদেব! এই দেখুন, এই দণ্ডেই আমি জাত্যভিমানের মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলিলাম। এক্ষণে আমাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করুন।"

মহাপুরুষ আগ্রহ সহকারে গৌরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কাণে কি মন্ত্র বলিলেন। শচীনন্দন অমনি সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। "বিশ্বম্ভর! এদিকে দেখ" বলিয়া মহাপুরুষ ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। গৌরচন্দ্র সঙ্কেতানুসারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন নব জলধর শ্যামসুন্দর মদনমোহনরূপে বাঁশী বাজাইয়া গান করিতেছেন। সে গানের অর্থ "আয়! আয়! ধন, জন, কুল, মান, মাতা, ভার্য্যা, বন্ধু, বান্ধব, সকলই বিসর্জ্জন দিয়া আমার সেবায় আয়! আমার আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন তোর আর কাজ নাই; যত দিন না আস্‌বি, ততদিন এমনি করে বাঁশীর গানে জ্বালাতন কর্‌বো।"

মহাপুরুষ অন্তর্ধান হইলেন, বাঁশীর গান নীরব হইল, শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি লুকাইয়া গেল, গৌরের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া শয্যায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন;—'আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না; যেখানে আমার প্রাণ নাথ আছেন, সেইখানে যাইব। তিনি আমায় সত্য সত্যই ডেকেছেন। যোগীর বেশে দেশে দেশে বেড়াইয়া নাথের সেবা করিব; জীবন ধন্য হইবে।'

পরদিন প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রভৃতি হৃদয়বন্ধুদিগের নিকটে এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন।

ভক্তগণ শুনিয়া চিন্তিত ও ভীত হইলেন। মুরারি গুপ্ত বলিলেন, "সে মন্ত্র দানের অর্থ এই যে, তুমি স্বগোষ্ঠি লইয়া এই নগরেই হরিনাম মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর।"

গৌর উত্তর করিলেন "তোমরা ভাল বাসিয়া যাই বল; আমার মন কিন্তু প্রবোধ মানিতেছে না। আমি কেমন করিয়া প্রাণনাথের আদেশ উপেক্ষা করিব? আমাকে তোমরা আর কিছু বলিও না। এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচন্দ্র উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কেশব ভারতী।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়। গৌরের প্রাণের মধ্যে সন্ন্যাসের গভীর প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে। সন্ন্যাসগ্রহণের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। উহা গ্রহণ করিতেই হইবে; ঘর, দুয়ার, আত্মীয়, বন্ধু, মাতা, ভার্য্যার সহবাসের সুখ ছাড়িয়া বৈরাগীর বেশে দেশে দেশে বেড়াইতেই হইবে; নইলে প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হইবে না। এ বিষয়ে তাঁহার কোন দ্বিধাই ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন সন্ন্যাসী হইয়াও কি জননী ও আত্মীয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য করা যাইতে পারে না? তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া নিরুদ্দেশ হইলে পিতা সেই শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিরুদ্দেশ হইলে তাঁহার জননীর যে সেই দশা হইবে না, তাহা কে বলিল? তাই তিনি সন্ন্যাসের নূতন পন্থা ভাবিতে-ছিলেন। যাহাতে সন্ন্যাস ধর্ম্মও বজায় থাকে, অথচ গার্হস্থ্যের সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যের ত্রুটী না হয়; এরূপ কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারা যায় কি না? এই চিন্তাই এখন বিশ্বম্ভরের অন্তরে অহরহ প্রধূমিত হইতেছে। বন্ধুগণ ও জননী তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। যেমন সংকীর্ত্তন, নৃত্য, ভাব, মহাভাব হয়, সব তেমনই চলিতে লাগিল। তাহাতে ভক্তগণ মনে করিলেন প্রভুর মনে সন্ন্যাসের যে ভাব উঠিয়াছিল, তাহা বুঝি নিবিয়া গিয়াছে। এই সময়ে হঠাৎ এক দিন নবদ্বীপনগরে কেশব ভারতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি 'ভারতী' সম্প্রদায়ের একজন উদাসীন সন্ন্যাসী, অতি শুদ্ধমতি ও মহাতেজস্বী ভক্ত। আশ্রম—ইন্দ্রানী দেশের কণ্টক নগরীতে। ভাগীরথীতীরস্থ বর্ত্তমান কাটোয়া নগরীকেই তখন কণ্টক নগরী বলিত।

ভারতী মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে নবদ্বীপ হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ইনি একজন কৃষ্ণ-ভক্ত বৈষ্ণব যোগী এবং সুসাধক বলিয়া বিখ্যাত। গৌরচন্দ্র নগরভ্রমণে বাহির হইয়া পথে ভারতী গোঁসাইকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই চম-কিয়া উঠিলেন। পাছে সঙ্গীগণ তাঁহার চাঞ্চল্য বুঝিতে পারেন, এই আশ-ঙ্কায় অনেক যত্নে উচ্ছ্বসিত মনোবেগ দমন করিয়া গৌর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনিই কি তিনি ? সে দিন স্বপ্নে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছি, তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি এখনও হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে ; এ মূর্ত্তি যে সে মূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিতেছি। হায়! এখনও আমি কেন সন্দেহ করি ? আমার সন্ন্যাসগ্রহণ অপরিহার্য্য। নইলে এই সব ঘটনা ঘটিল কেন ?" এই চিন্তা করিয়া গৌরচন্দ্র সোদ্বেগ অন্তরে সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভারতী গোস্বামী বিশ্ব-ম্ভরের পরিচয় পাইয়া প্রীতমনে তাঁহার গৃহাভি মুখে গমন করিলেন। বিশ্বম্ভর অতিথিসেবা করিয়া রজনীযোগে নিভৃতে তাঁহার শয়নকক্ষে যাইয়া উপনীত। গোস্বামী মহাশয় তখনও নিদ্রা যান নাই, হরি নাম করিতে-ছিলেন। বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এত রাত্রে যে"।

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "প্রয়োজন আছে"।

ভারতী। "আমার নিকট আবার কিসের প্রয়োজন ?"

বি। "শুনিলে বুঝিতে পারিবেন"।' এই কথার পর বিশ্বম্ভর নিজ মনের ভাব, আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনের কথা এবং স্বপ্নে তাঁহারই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, সকলই বিবৃত করিয়া প্রেমাবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে ভারতীর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন "গুরুদেব! আপনিই ভগবৎ প্রেরিত আমার সন্ন্যাসের আচার্য্য। যাহাতে আমার সংসার বন্ধন ঘুচিয়া কৃষ্ণপদে মতি হয়, তাহা আপনি করিয়া দিউন।' ভারতী তাঁহার প্রেমের আবেগ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং বিশ্বম্ভর যে একজন অসাধারণ সাধু মহাত্মা তাঁহার প্রতীতি হইল। ভারতী বলিলেন "তুমি যে সে ব্যক্তি নও ; শুক বা প্রহ্লাদের অবতার"। বিশ্বম্ভর নীরবে অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন দেখিয়া ভারতী আবার বলিলেন "উঁহু। ভক্তাবতার বলি কেন ? এ যে সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার।"

বিশ্বম্ভর তখন ব্যাকুলতাসহকারে পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাস দীক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে ভারতী উত্তর করিলেন "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; আমি তোমার কথার অবাধ্য নই। যা বলিবে তাই করিব।"

বিশ্বম্ভর আনন্দিত মনে বলিলেন 'তবে শুভস্য শীঘ্রং; কবে?'

ভারতী। 'যে দিন তোমার ইচ্ছা।'

বিশ্বম্ভর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে এই উত্তরায়ণের সংক্রান্তির পর দিনে।"

ভারতী। তথাস্তু।

অতঃপর বিশ্বম্ভর শয়ন করিতে গমন করিলেন। উদাসীন প্রত্যূষে উঠিয়া কণ্টক নগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে এক নিভৃতে বসিয়া গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেনঃ—

"করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে;
উলটিয়া আরও কফ বাড়িল দেহেতে।"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; স্পষ্ট করিয়া বল।"

বিশ্বম্ভর কহিলেন "বলিব আর কি? দেখিতেছো না; চারিদিকে কি হচ্চে? লোক সব সংসারের দাস, কর্ম্মফাঁস গলায় জড়াইয়া দুস্তর ভবার্ণবে ডুবিয়া মরিতেছে। এই রোগ নিবারণের জন্য দেখ কত চেষ্টা করিলাম, সংকীর্ত্তন করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইলাম কিন্তু তাহার ফল কি হইল? লোকে কি কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজিল? না আরও উদ্ধত হইয়া আমাদের মারিতে চায়; বৈষ্ণবদিগকে উৎপীড়ন করিতে চায়; এবং চারিদিকে বৈষ্ণবদলের উপর রাগ হিংসা বাড়াইয়া দিয়া বিদ্বেষানল জ্বালিয়া দিতে চায়।'

নিত্যানন্দ গৌরের মন পরীক্ষা করিবার জন্য উত্তর করিলেন "তাহা নিবারণের উপায় কি ভাবিয়াছ?"

গৌর বলিলেন "যার জন্ম বিদ্বেষ, তাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলার সঙ্কল্প করিয়াছি; বৈষ্ণবদিগের দলের শ্রীবৃদ্ধি ও সংকীর্ত্তনের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া পাষণ্ডীগণের পাপবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। সঙ্কল্প করিয়াছি, এই দল ভাঙ্গিয়া ফেলিব। তা'হ'লে আর বিদ্বেষের কারণ থাকবে না।"

নি। তবে জগৎ উদ্ধার করবে কি দিয়ে? হরিনাম ভিন্ন তো জীবের নিস্তার নাই।

গৌর। হরিনাম ছাড়বো বল্লেম কি? দল ভাঙ্গিব; কিন্তু হরিনাম বিলাইতে ছাড়িব না।

নি। তোমার কথা ভাল বুঝিলাম না।

গৌরচন্দ্র কিছু উত্তেজিতভাবে কহিলেন "বুঝিলে না? তবে স্পষ্ট করিয়া বলি শুন। ইহার আগেও তো কয়েকবার আভাস দিয়াছি। আমি গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। এ ভাবে নাম কেহ লইল না। মাথার এই কেশরাশি মুড়াইব, জাত্যভিমানের চিহ্ন ও প্রেমের প্রধান অন্তরায় এই যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িব, কৌপীন বহির্ব্বাস পরিয়া দীন হীন কাঙ্গালের বেশে যাহারা এখন মারিতে চাহিতেছে, নিন্দা করিতেছে, তাহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া হরিনাম লইতে বলিব। তবুও কি তাহারা নাম লইবে না, পাপ ছাড়িবে না? আর কি তাহাদের মারিবার বুদ্ধি থাকিবে? তখন কে কাহাকে মারে দেখা যাইবে? নিতাই! তুমি কি জান না এদেশের লোকের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী উদাসীনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। হইবেই বা না কেন? ঘরে বসিয়া ষোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিয়া লোককে উপদেশ দিতে গেলে, লোকে শুনিবে কেন? তুমি আঠার আনা কামাদি বিষয়সেবা করিবে, আর সংকীর্ত্তনে দুফোঁটা চখের জল ফেলিয়া লোকদিগকে ভাব-কালি দেখাইবে; বল দেখি তাতে তাদের মন ভিজিবে কেন? তারা যে আমাদের মারতে চায়, সে কি তাদের দোষ, না আমাদের চরিত্রহীনতার দোষ? তাদের তো বিষয় বিকার জন্মিয়াছে; বিকারের রোগী কি না বলে? কি না করে? কিন্তু আমরা সে রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কি করিয়াছি? তেমন করে কি তাদের প্রাণের নিভৃত স্থান ছুঁইতে পেরেছি? সব ছেড়ে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতে পেরেছি? তা করতে না পারলে হরি-নাম প্রচার হবে না, পাপী উদ্ধার হবে না, প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হবে

না এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ হবে না। তাই সঙ্কল্প করেছি গার্হস্থ্য ছাড়িব; সন্ন্যাসী সাজিব, দেশে দেশে বেড়াব, লোকের দ্বারে কাঁদিব; দেখি কৃষ্ণ পাই কি না। তুমি কি ইহাতে নিষেধ করিবে? তা পার না। যদি জগতের উদ্ধার কামনা থাকে, তবে কখনই তুমি আমাকে বাধা দিতে পার না। তুমি তো সকলই জান।”

নিত্যানন্দ পূর্ব্ব হইতেই গৌরের মনোভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে এই দৃঢ় সঙ্কল্প শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে নবদ্বীপের লীলা কৌতুক ভাঙ্গিবে বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতের সৌভাগ্যোদয়। নামপ্রেমের তরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে। নিতাই প্রকাশ্যে বলিলেন “তুমি স্বাধীন পুরুষ, কে তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে? মায়ামুগ্ধ ইন্দ্রিয়পরবশ লোকই পাছে ইন্দ্রিয় সুখের হানি হয়, এই ভয়ে কর্ত্তব্যের পথে যাইতে ভীত। তুমি তো আর সে প্রকৃতির লোক নও, যে তোমাকে কেহ বাধা দিলে মানিবে? তোমার চেয়ে কয় জন লোক মাকে, ভার্য্যাকে ভালবাসিতে জানে? আমরা তোমার অনুগত, তোমার ভালবাসাতেই সঞ্জীবিত। কিন্তু সে সব ভালবাসা কি তোমাকে কর্ত্তব্য হইতে টলাইতে পারে? সাধুদিগের অন্তঃকরণ কুসুমাপেক্ষাও কোমল ও বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, এই যে মহাজন-বাক্য, তা তোমাতে পূর্ণ হইবে না তো কোথায় হইবে? আমার সাধ্য কি যে তোমাকে বিধি দিই বা নিষেধ করি। যেমন করিয়া জগৎ উদ্ধার হবে, তাহা তুমিই ভাল জান। আমি আর কি কহিব?” বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের কথায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন “ভাই গৌর! তবে সত্য সত্যই কি আমাদের ছেড়ে অগ্রজ বিশ্বরূপের ন্যায় দেশান্তরী হবে? তা’হলে পুত্রবৎসলা তোমার জননীর কি দশা হবে? বৃদ্ধবয়সে পুত্র শোকে পাগল হয়ে তিনি যখন নবদ্বীপের পথে পথে কেঁদে বেড়াবেন, কে তাঁকে সান্ত্বনা দিবে? কেই বা তাঁহার ভরণপোষণের ভার লইবে? আর সোনার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া? জলন্ত অগ্নির ন্যায় যৌবন। অনাথিনীর উপায় কি হবে? শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি প্রাণের বন্ধু; তাঁদের মায়া কি একেবারে ছেড়ে দিবে? শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন “মোহ! মোহ! ছি! ছি! তোমার ন্যায় লোকও কি মোহে অধীর হবে? নিতাই! প্রাণের নিতাই! মোহ পরিত্যাগ কর; আমার মনের

কথা শুন। তোমরা সব আমার প্রাণের বান্ধব; প্রাণ ছাড়িতে পারা যায়, তবু তোমাদের ছাড়া যায় না। মা আমার স্নেহময়ী; আমিই তাঁর প্রাণ। আমার ভার্য্যাও পতিপ্রাণা সতী, আমার হৃদয়ের ভালবাসার পাত্র। কিন্তু কি করি? আমি স্বাধীন নই; সম্পূর্ণরূপে প্রাণনাথের ইচ্ছার অধীন। তাঁর ইচ্ছা আমাকে যেমন চালাইবে, আমি তেমনি চলিতে বাধ্য। আমার নিজের সুখ দুঃখের অতীত সে ইচ্ছা। তোমাদের ছাড়িলে যদি বিষাদব্যাঘ্র আমাকে গ্রাস করে ফেলে, তা কি করবো? কিন্তু সুখের বিষয় প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, আমি সন্ন্যাস করে তোমাদের ছাড়ি, বিশ্বরূপের ন্যায় দেশান্তরী হই।"

নিতাই প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে আবার কি?'

গৌর বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই শচীদেবী আমার মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া আমার পত্নী, তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই আমার সন্ন্যাস। এই দুই ইচ্ছা কখন পরস্পর বিরোধী নহে। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার বিসম্বাদী হইতে পারে না। ইহার সমাধান এই যে, এই সকল সম্বন্ধ জন্য কর্ত্তব্য যতদূর সম্ভব, প্রতিপালন করিতে হইবে, অথচ সন্ন্যাস ধর্ম্মও যাজনা করিতে হইবে। বিষয়ের মধ্যে থাকিব, অথচ তাহা ভোগ করিব না। সন্ন্যাসীর তো বিষয় ভোগ নিষিদ্ধ। আমি তোমাদের ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইব না; যথাসম্ভব পরস্পর মিলিব। মাকে ছাড়িয়া তাঁহার প্রাণে শেল মারিব না; কিন্তু যত দূর পারি তাঁহার ও পত্নীর ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করিব। মা ভিন্ন সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্য স্ত্রীর মুখ দর্শন নিষিদ্ধ; সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর দেখিব না। এই সকল কারণে আমি সন্ন্যাস লইয়া এমন স্থানে থাকিব যে তোমরা অনায়াসে যাইতে আসিতে পারিবে; এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমিও মাকে দেখিয়া যাইতে পারিব।"

নিতাই বলিলেন "এ যে নূতন রকমের সন্ন্যাস। সে স্থান কোথায়?"

গৌর। তাহার এখনও কিছু স্থিরতা নাই; পরে জানিতে পারিবে।

নিতাই বলিলেন "আমি তোমার একান্ত অনুগত; দয়া করে সকলই তো বলিলে। এখন জিজ্ঞাসা করি, কোথায়, কাহার নিকট, কবে, সন্ন্যাস দীক্ষা লইবে? তাহা প্রকাশ করিতে কি কিছু আপত্তি আছে?"

বিশ্বম্ভর হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'তোমার নিকট কিছুই গোপন

করিবার নাই। কিন্তু একটী অনুরোধ, আমার যাইবার স্থান ও দিন পাঁচ জন ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমার জননী, চন্দ্রশেখর, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ ও মুকুন্দ ভিন্ন এ কথা যেন কেহ শুনে না। ইঁহাদিগকেও আমার যাইবার শেষ মুহূর্ত্তে বলিবে; আগে ব্যক্ত হইলে কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। আমি আগামী উত্তরায়ণ দিনে কণ্টক নগরীতে যাইয়া ভক্তিভাজন শ্রীল কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিব।'

নিত্যানন্দ বলিলেন "এ কি ঠিক?"

গৌর উত্তর করিলেন "সুনিশ্চিত; আগামী কল্য বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইব; কিন্তু স্থান ও দিনের কথা কাহাকেও বলিব না।"

বিদায় সভা।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাহির বাটীর দেব মণ্ডপে একে একে বৈষ্ণবগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর স্বায়ংকৃত্য সমাধানান্তে বন্ধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন! সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। হঠাৎ মুকুন্দ দত্ত বলিয়া উঠিলেন; 'আমার বিশ্বাস হইতেছে যে এই প্রভু আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন; কে যেন আমার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে যেন ইনি আর গৃহস্থ আশ্রমে থাকিবেন না। যত ক্ষণ আছেন, এসো আমরা ইঁহার রূপ নয়ন ভরিয়া দেখি, কথা শ্রবণ ভরিয়া শুনি।'

এই কথা শুনিয়া সকলেই ভীত ও শোকার্ত্ত হইলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া বিশ্বম্ভরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না। জিজ্ঞাসা না করিলেও আর বুঝিতে বাকী থাকিল না। বিশ্বম্ভরের অবনত মস্তক ও স্থির গম্ভীরভাব সকলই বলিয়া দিল। অবশেষে গৌরচন্দ্র নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ—"প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা কি জন্য এত উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমরা ভাবিতেছ আমি সন্ন্যাসী হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া দেশান্তরী হইয়া চলিয়া যাইব? ইহা যেন তোমাদের মনে স্থান পায় না। প্রাণ ছাড়িতে পারা যায়, তথাচ তোমাদের মধুময় সঙ্গ ছাড়া যায় না। এ জন্মে কেন? জন্ম জন্মান্তরেও তোমাদের ছাড়িতে পারিব না। আরও দুই বার আমরা একত্র মিলিত হইয়া হরি-সংকীর্ত্তন করিব। আমাদের এ যোগ কখন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। কেবল জনসমাজের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার

জন্ত আমি সন্ন্যাস করিতেছি। ইহাতে তোমাদের সঙ্গ কেন ছাড়িতে হইবে?

শ্রীবাস পণ্ডিত মহা উদার ও সরল বিশ্বাসী। গৌরের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া কাতর স্বরে বলিলেন "এ কি সত্য না স্বপ্ন? বিশ্বম্ভর! আমাদের কি সত্য সত্যই ছাড়িয়া যাবে?" এই বলিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর শ্রীনিবাসের নিকটে আসিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন "পিতা! কাঁদিতেছেন কেন? সাধু মহাজনের পুত্রগণ যেমন নৌকা সাজাইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যায় এবং দেশ বিদেশ হইতে বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত ধন আনিয়া স্বজন কুটুম্বদিগের প্রতিপালন করে; আমিও তেমনি প্রেমধন উপার্জ্জনে বিদেশে যাইয়া কৃষ্ণপ্রেম আনিয়া আপনাদিগকে উপঢৌকন দিব।"

শ্রীবাস উত্তর করিলেন "ততদিন বাঁচিলে তো তোমার প্রেমধন খাব? তুমি দেশান্তরে গেলেই যে আমরা মরিয়া যাইব। তখন তোমার উপার্জ্জিত প্রেমধন দিয়া আমাদের প্রেতাত্মার শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে কি?"

মুরারি গুপ্ত কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরের চরণতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন:—"স্বামিন্! প্রভো! আমি তোমার চির দাস। দাসের প্রগল্ভতা আজ মার্জ্জনা কর। এত যদি মনে ছিল, তবে এই সাধের কল্পতরু রোপণ করিতে গিয়াছিলে কেন? কত পরিশ্রম করে ইহাকে সেচন করেছো, কত যত্নে ইহার রক্ষা করেছো, আর কত যত্নে এই তরুর মূলদেশ বাঁধাইয়া দিয়াছ; তা কি জান না? এখন যেই ফলফুল প্রসবের সময় হইল, আর স্বহস্তে কেটে ফেলিতে চাও? এই কি বিচার? প্রভো! তোমাকে আর কি বলিব? আমি কি বলিবার যোগ্য পাত্র? তবে প্রাণের যাতনা, না বলিয়া পারিনে, তাই বলিতেছি। এখন কি তোমার দেশান্তরে যাইবার সময়? যে সুখের হাট বসাইয়াছ, তার ত এখনও কিছুই হয় নাই। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি চলিয়া গেলে আমরা স্বতন্ত্র হয়ে যথেচ্ছাচার করিব; সংসার-ব্যাঘ্র আমাদের গ্রাস করে ফেলিবে; এত দিন ধরে যত করিলে, সব পণ্ডশ্রম হবে। অতএব মিনতি রাখ; নিঠুর হইও না; সুখের হাট ভেঙ্গে দিও না; আমাদের অকূল পাথারে ভাসাইও না; আমরা তোমা বই আর কিছু জানি না।"

এই বলিয়া ভক্ত মুরারি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ বলিতে লাগি-

লেন—"প্রাণ যে ফাটিয়া যায়! তুমি দেশান্তরে যাবে? যাঁর মুখ এক দণ্ড না দেখিলে, নদীয়া আঁধার লাগে; এ জীবনান্ধকারে যে শুদ্ধ কৌমুদী; যাঁকে গান শুনাইতে পারিলে গান করা সার্থক হয়; আর সেই তুমি ছেড়ে যাবে? এ কি সহা যায়?" চারিদিকে সকল ভক্তগণ তখন কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল। হরিনামের আনন্দধ্বনির পরিবর্ত্তে আজ বিষাদের ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়া সান্ধ্য-সমীরণ আন্দোলিত করিল। গৌরচন্দ্রও ক্ষণকালের জন্য মোহে অভিভূত হইয়া নীরবে অশ্রুধারা ফেলিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! প্রাণের সুহৃদ্‌গণ! আশ্বস্ত হও। ক্রন্দন সম্বরণ কর। মোহ পরিত্যাগ কর। আমার প্রাণের যন্ত্রণার কথা বলি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার অন্তরে যে জ্বালা জ্বলিতেছে, তাহা ভাষায় বলা যায় না। দেহেন্দ্রিয়ে যেন বিষম জ্বর হইয়াছে, জননীর সুধামখা আহ্বান, ও তোমাদের মধুর সম্ভাষণও বিষমিশ্রিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিনে জীবন যৌবন প্রাণ মন সকলই বৃথা। পশুপক্ষীরও তো প্রাণ আছে; মৃত দেহেরও তো অবয়ব আছে; লতা পুষ্পেরও তো সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু বল দেখি তাহা তাদের কোন কাজে লাগে? তাই প্রতিজ্ঞা করেছি কৃষ্ণ-ধন লাভ কর্‌বোই কর্‌বো। দেশে দেশে ফিরিব। দেখি কোন্ দেশে গেলে প্রাণনাথের উদ্দেশ পাই? যদি বল, সংসারাশ্রমে থাকিয়া কি তাঁহাকে লাভ করা যায় না; এখানে কি তিনি নাই? এই তো তাঁহাকে পাইবার জন্য আমরা নিত্য সংকীর্ত্তন করিতেছি? তাহার উত্তর এই যে, এখানে তিনি আছেন সত্য; কিন্তু তাঁহারই বিধানে আমার জীবনের গতি অন্য প্রকার নির্ব্বন্ধিত হইয়াছে। সংসার আমাকে সুখ দিতে পারিবে না; বিষয় আমার নিকট বিষময়। ইন্দ্রিয়গণ নিয়তই বিষয় সেবা করিতেছে, তথাচ শান্ত হয় না; নিত্য নূতন বিষয় ভোগ করিতে চায়। কামাদি সদাই চিত্ত চুরি করিয়া স্ব স্ব দিকে টানিতেছে; সংসারের সকলই যেন কৃষ্ণধনকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। মনে দুর্ব্বাসনার অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; এ অবস্থায় বল আমি কি করিব? এ সংসার ছাড়া ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। তোমরা আমার পরম বান্ধব; আমাকে মোহের গর্ত্তে ফেলিও না। দয়া করে আশীর্ব্বাদ কর যেন কৃষ্ণ লাভ হয়; এ দুঃখ যায়, জগতের মঙ্গল হয়; আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।"

গৌরের করুণানুতাপ-পূর্ণ এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ

মনে করিলেন যে, তাঁহার মনোগতি ফিরানের চেষ্টা, প্রবল তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-মালা ফিরানের চেষ্টার ন্যায় বৃথা। তখন সকলে নিরাশ অন্তরে বলিলেন "তুমি স্বাধীন প্রভু; লোক উদ্ধারের জন্য যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার ও লীলা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার আমরা কি জানি? তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

বিশ্বম্ভর তখন সহাস্য মুখে বন্ধুদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "কে বলিল সন্ন্যাসী হইয়া তোমাদের পরিত্যাগ করিব? তোমরা আমার হৃদয়ের বন্ধু; তোমাদের কি ছাড়া যায়? আমি যখন যেখানে থাকিব, চিরকাল তোমাদেরই।"

এ কথার অর্থ যিনি যেমন পারিলেন, বুঝিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত মনে গৃহে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতা পুত্রে।

কথা উঠিলে ঢাকা থাকে না। চকিতের ন্যায় সমুদায় নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইয়া গেল, বিশ্বম্ভর গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। শচীদেবীর মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; বিষ্ণুপ্রিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন। শচীদেবী সাহস করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; পাছে কথাটা খাঁটি সত্যে পরিণত হয়। কৃষ্ণমেঘে যেমন বিদ্যুতের আলো ঢাকিয়া রাখে, তেমনি সন্দেহ মনে সত্যের জ্যোতিঃ এখনও ঢাকা রহিয়াছে; প্রাণে আশার আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। গৌরকে জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলিয়া ফেলেন 'হাঁ—জনশ্রুতি সত্য', তবেই তো সর্ব্বনাশ। তা'হলে তো সকল আলো নিবে যাবে; ভীষণ সত্যের উলঙ্গ ছবি বিকট মুখব্যাদানে তাঁহার আশার পুত্তলীকে গিলিয়া খাইবে। অতএব শচীমাতা বলি বলি করিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু আর অধিক দিন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেও পারিলেন না। প্রাণের মধ্যে বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে এক দিন গৌরচন্দ্র মধ্যাহ্নে ভোজন সমাপনান্তে বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন, মাতা নিকটে বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতেছেন, কিন্তু মনে মনে কেবল

পুত্রের সন্ন্যাস চিন্তা করিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত আছেন, শচী সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে নিমাই! তুই নাকি আমাদের ছেড়ে সন্ন্যাস—" পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল; নয়ন দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুজল পড়িতে লাগিল এবং চৈতন্য লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল। গৌরচন্দ্র জননীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া তাঁহার মস্তক স্বীয় স্কন্ধে রক্ষা করিলেন এবং নানাবিধ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শচীদেবী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে বিশ্বম্ভর বলিলেন "কে বলিল আমি সন্ন্যাস করিব?"

শচী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, "কেন নগরের লোক কে না বলিতেছে? কেবল আমিই জানি না। নিমাই বাপ! আমার সঙ্গে তো কখন চাতুরী করিস্ নাই; কেন এখন কর্‌ছিস্? আমি যে আর এ সন্দেহ-দোলায় দুলিতে পারি না। সত্য সত্যই কি তুই আমাদের অকুল সাগরে ফেলিয়া চলিয়া যাইবি? আজ যে আমার বিশ্বরূপের শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তোর পিতার কথা যে মনে পড়ে গেল। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তুই বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাসী হবি। সে স্বপ্ন যে সফল হইতে চলিল। তুই কথা বলছিস্ না যে? আর বলিবি কি? হাঁ বুঝিয়াছি আমার ভাঙ্গা কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

বিশ্বম্ভর জননীর বিলাপ শুনিয়া নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন; ক্ষণকালের জন্য মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল; অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। শচীর বুঝিতে আর বাকী থাকিল না। তিনি উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে উন্মত্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন "সোণার গৌরাঙ্গ আমার! হাঁরে! তোর ন্যায় পুত্র ছাড়িয়াও কি প্রাণ ধরা যায়? তোর জন্য যে আমি পতিপুত্রের শোক ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তোর গৌরবে যে নবদ্বীপের মধ্যে গরবিণী ছিলাম, তুই যে আমার অন্ধের যষ্টি, গলার হার, নয়নের তারা, আমার ননীর পুত্তলী। হা বাপ! কেমন করে তুই বনে বনে ভ্রমণ কর্‌বি? ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় কে তোকে অন্ন জল দিবে? তুই যে আমার ভাল খেতে, ভাল পর্‌তে ভালবাসিস্। কেমন করিয়া সন্ন্যাসী হয়ে ভিক্ষা করে খাবি? পথে চল্‌তে যে পায়ে লাগ্‌বে! উঃ! কেমন ক'রে মায়ের প্রাণে এসব সহ্য হবে? একি তোর সন্ন্যাসের বয়স?

এখনও যে তোর সংসারধর্ম্ম সারা হয় নাই; সন্তানসন্ততি কিছু জন্মে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হবে? তাহার রূপ যৌবন যে জলন্ত আগুণ। তো'র বিহনে সোণার প্রতিমা আমার শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। কে তাহাকে রক্ষা করিবে?" শচীদেবী শোকে ক্রোধান্ধ হইয়া এখন নিমাইকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন "নিমাই! লোকে বলে তোর নাকি সর্ব্বজীবে দয়া আছে? এই কি তোর দয়ার ব্যবহার? বুঝিলাম, বুঝিলাম, আর সকলই তোর দয়ার পাত্র; কেবল মা ও ভার্য্যা ছাড়া। তুই সন্ন্যাসে যাবি, কে তোর ভার্য্যাকে রক্ষা কর্‌বে? আমি পার্‌ব না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যা, সেও সন্ন্যাসিনী হোক্; তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরিতে পার্‌বো। শাস্ত্রে বলে, বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুত্রের প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; যুবতী স্ত্রীকে স্বামীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তুই সন্ন্যাস করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর্‌তে যাবি; আমাকে বলতে পারিস্, এ ধর্ম্ম তোর কোথায় থাকবে?" এই ভাব পরিবর্ত্তনে শচীদেবী বলিলেন—"আমি রাগ করেছি! না, না, তোর উপর আর রাগ কর্‌ব না, আর মন্দ বল্‌ব না, বাবা আমার! লক্ষ্মীছেলে, যাদুমণি! ঘরে থাক, আর মন্দ বল্‌ব না। ঘরে বসে যা ইচ্ছা তাই কর বাপ! আমি কিছু বল্‌ব না। নিমাই! কত সময়ে মন্দ বলেছি, তাই মনে করে চলে যাচ্ছিস? যাস্‌নে, যাস্‌নে; আর মন্দ বলব না। হা বাপ! সত্যই কি আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না? বউকে যে কত ভাল বাসিস; তার জন্য কি মন উদ্বিগ্ন হবে না? গদাধর, অদ্বৈত, হরিদাস, মুকুন্দ, মুরারি; যে তোর প্রাণের বন্ধু, তাদের মনে করেও কি তুই ঘরে থাক্‌বিনে?" বলিতে বলিতে শচীদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিশায়িনী হইলেন। গৌরচন্দ্র অনেক যত্নে মাতার চৈতন্য করাইয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং ধীর ও গম্ভীর স্বরে নিজ সংকল্প বলিতে লাগিলেন।

"মা! বৃথা শোক পরিত্যাগ কর; মায়ামোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে বৃথা বিলাপে কেন নিজের কল্যাণ নষ্ট কর্‌ছো? তোমার ন্যায় ধর্ম্মশীলা জননীর পক্ষে এরূপ মোহ সাজে না। তুমি তো জান, এ সংসারের সকলই অনিত্য, সকলই অসার। এখানকার ধন, জন, সম্পদ্, সম্বন্ধ, আত্মীয়তা, সকলই জল বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, চপলা উন্মেষের মত ক্ষণিক। যাহাকে মানব-জীবন ব'লে আমরা অহঙ্কার করি; ভেবে দেখো, কালো মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায়, তাহার আদি ও অন্ত অন্ধকার পূর্ণ। জন্মের পূর্ব্বের

অবস্থাও আমাদের নিকট চিরাবৃত, পরের অবস্থাও তেমনি। কেবল পথের পরিচয়ের ন্যায় দুই চারি দিনের জন্য জীব, 'আমার পুত্র, আমার ভার্য্যা, আমার পিতা মাতা', বলিয়া অহঙ্কার ও মোহে জড়িত হইয়া পড়ে। এই 'আমিত্ব' জ্ঞান যখন একদিন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে, এই সব সম্বন্ধ যখন একদিন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন তাহার জন্য মোহে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের উচিত? চিন্তা করে দেখ, আমার জন্মের পূর্ব্বে আমি তো তোমার পুত্র ছিলাম না; এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে তো আর পুত্র থাকিব না; তবে এই অকিঞ্চিৎকর সম্বন্ধের জন্য কাতর হইয়া সকল সম্বন্ধের জনয়িতা যিনি, সেই গোবিন্দ-চরণ ভুলিয়া সংসারে অভিভূত কেন হইবে? দুই দিন পরে যাহা ভাঙ্গিত, না হয় দুই দিন আগেই তাহা ভাঙ্গিবে; অনন্তজীবনের নিকট দুই চারি দিন কত টুকু সময়? ইহার জন্য চঞ্চলতা কেন?" শচী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, "মৃত্যু প্রিয়পুত্রকে লইয়া গেলে সে শোক সহা যায়; কিন্তু জীবিত থাকিতে আমার পুত্র আমার থাকিবে না, এ যে অসহনীয় শোক।"

গৌর বলিলেন, "তাহাও তো সহিয়াছ। বিশ্বরূপ চলিয়া গিয়াছে; তাহার শোক কি সও নাই? কই তাহার কি করিতে পারিয়াছ? যাক্ সে কথা বলিতেছি না। এই যে "আমার আমার জ্ঞান," এই জ্ঞানই সর্ব্ব-নাশের মূল। ইহাই কর্ম্মবন্ধনে জড়াইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার যাতনায় নিক্ষেপ করে। এ পৃথিবীতে জীব সৃষ্ট হয় কেন? অগণ্য জীব কোলাহল-পরিপূর্ণ এই সুন্দর বিশ্বচ্ছবি কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে? লীলাময়ের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া। তোমার আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্য এ জগৎ সৃজিত হয় নাই। ইহার মধ্যে দেখ মনুষ্যেতর জীবপ্রবাহ এক অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া সেই প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতেছে। তাহাদের সাধ্য নাই যে, লীলাময়ের লীলাশক্তির বাহিরে যায়; লীলা-নর্ত্তকী তাহাদের যেমন নাচাইতেছে, তাহারা তেমনি নাচিতেছে। কিন্তু মনুষ্যের অধিকার অন্যরূপ। মানুষ জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, এই তাহার ব্রত। এখানেও লীলানর্ত্তকী আমাদের নাচাইতেছে বটে, কিন্তু এ নৃত্যের তাল ভিন্ন, ইহাতে একটু অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র আছে। যতদিন আমরা এই

নৃত্য সুন্দর করিয়া নাচিতে না পারিব, যতদিন এখানকার নৃত্য-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া উন্নততর শিক্ষার উপযুক্ত না হইব, ততদিন পুনঃ পুনঃ এই নৃত্যই নাচিতে হইবে; এখানকার কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াই; এখানকার কাজই করিতে হইবে। পশু জীবনের ন্যায় ভোগ বাসনা তত দিন নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া এই খানেই আনিয়া ফেলিবে। তাই বল্‌ছি আমার পুত্র, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার ঘর, আমার বাড়ী, এই মিথ্যা অহংজ্ঞান ছাড়। কে কার পুত্র? কে কার মা? যাঁহার ইচ্ছায় তুমি আমার মা, আমি তোমার পুত্র; সেই গোবিন্দের ইচ্ছা কি সকলের বড় নয়? তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হও, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধন ছাড়িবে, বৈকুণ্ঠবাসে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে; আর সংসারে থাকিয়া কামাদির সেবা করিতে হইবে না। ভেবে দেখো, আমাকে পুত্রজ্ঞানে যে স্নেহ কর, সে টুকু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলে কত সুখ হয়?"

শচীদেবী স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা ছিলেন। পুত্রের ভাবি সন্ন্যাস চিন্তা করিয়া শোকে ও দুঃখে বিহ্বল হইয়া এতক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন; এক্ষণে গৌরের গভীর উপদেশপূর্ণ তত্ত্বকথা শুনিয়া অনেক পরিমাণে তাঁহার মোহের অবসান হইল; বুদ্ধির চঞ্চলতা চলিয়া গেল; এবং তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে এ জগৎ কি মিথ্যা? এখানকার স্বামী, পুত্র, কন্যা, কি কেহই আমার নয়? আমিই বা কে? এ সব কথার মীমাংসা কি?'

গৌরচন্দ্র জননীর জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন:—"না, এ জগৎ মিথ্যা নয়, এখানকার তুমি, আমি প্রভৃতি জীবও মিথ্যা নয়, এখানকার পরস্পর সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্য সকলও অবশ্য পালনীয়। কিন্তু এ সকল মিথ্যা ও কাল্পনিক না হইলেও কেহই নিত্য ও স্বাধীন নয়। এক সত্তার প্রকাশে ইহারা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দই সর্ব্বমূলাধার ও সকলের নিয়ন্তা। তাঁহারই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের ইহারা আভা মাত্র। তিনি হাসিয়াছেন; আর এইপরিদৃশ্যমান বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার হাসিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থির প্রশান্ত সাগরজলে বায়ু প্রবাহিত হইলে যেমন অগণ্য উর্ম্মিরাশি [illegible] হইতে থাকে, তেমনি লীলাময় ভগবানের সত্তাসাগরে লীলা করিবার ইচ্ছা-পবন সমুত্থিত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বোর্ম্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাগরের প্রত্যেক ঊর্ম্মি যেমন পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন

হইয়াও সাগর জলের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত, তেমনি এই জড় ও জীব-প্রবাহ, বিচিত্র ভাবাপন্ন হইয়াও ভগবানের সত্তাসাগরে ওতপ্রোত-ভাবে নিমজ্জমান। তোমার আমার নিজের কিছুই স্বাতন্ত্র্য নাই। আমরা তাঁহার ইচ্ছা-সাগরের বিশেষ বিশেষ ভাব রূপ সম্পন্ন এক বিন্দু বারিকণা মাত্র।"

শচী উত্তর করিলেন, "যদি তাহাই হইল, তবে এখানকার সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যপালন কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সকলই তো তাঁহারই প্রকাশ, তিনিই সকল ইচ্ছার মূলে, তবে তোমার সন্ন্যাসে আমার যাতনা হয় কেন? তুমিই বা আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া আমার সেবায় তৎপর থাক কেন?"

বিশ্বম্ভর বলিলেন "এই টুকুইতো রহস্য। তাইতে তো বলিতেছিলাম যে, মনুষ্যেতর জীবকে তিনি এই কর্ত্তব্য জ্ঞানটুকু দেন নাই; কেবল মানুষকেই ইহার অধিকারী করিয়াছেন। মানুষ স্বীয় জীবনে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিবে, এই তাহার নিয়তি। যদি তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিতে পার, তবেই সকল কর্ম্ম তোমার কৃষ্ণার্পিত হইল; তোমার নিজের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কিছুই কৃত হইল না। সুতরাং তুমি কর্ম্মসূত্র কাটাইয়া এ পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের দায়ে অব্যাহতি পাইলে।"

শচী। তবে কি মনুষ্য জন্ম কষ্ট-ভোগের জন্য? জীবকে কষ্ট দিবার জন্য কি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহা যদি হয়, তবে তাঁহার দয়া কোথায়? তাঁহাকে করুণাময় বলি কেন?

গৌর। তাহাও কি মনে করতে আছে? আমি সে সব কিছু বলিতেছি না। আমি এই মাত্র বলিতেছি যে, আমরা কেবল এ পৃথিবীর জন্য সৃষ্ট হই নাই। আমরা বৈকুণ্ঠের অধিকারী। অনন্ত জীবনে তাঁহার সেবা করিব ও প্রেমে পূর্ণ হইব, এই আমাদের জীবনের নিয়তি। কিন্তু এ পৃথিবীতে যতদিন আমরা তাঁর ইচ্ছার অনুগত হইতে না পারিব, তত দিন বৈকুণ্ঠ-বাসের উপযুক্ত হইব না। অর্থাৎ এ পৃথিবীর কার্য্য যতদিন সমাপ্ত করিতে না পারিব, ততদিন এক জন্মেই হউক আর বহু জন্মেই হউক, এ পৃথিবীতে যাতায়াত করিতেই হইবে। কারণ তাঁহার ইচ্ছা অলঙ্ঘনীয়। আমাদের জীবনে এ পৃথিবীতে তাঁহার সংকল্প পরিপূর্ণ করাইবেনই করাইবেন। শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারিলে আমাদেরই মঙ্গল। বিলম্ব করা কেবল উন্নতির পথে কণ্টক দেওয়া মাত্র।

শচী। তোমার জীবনে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা কি? তা' কেমন করে বুঝলে?

বিশ্বম্ভর। তা' না বুঝ্‌লে আর সন্ন্যাসের কথা উঠিয়াছে কেন? যদি তোমাদের নিয়ে ঘরকন্না করা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতাম, তবে কি আর তোমার মত মায়ের কোমল প্রাণে আঘাত দিই? তোমাকে ছাড়িতে কি আমার মর্ম্মভেদী যাতনা হয় না? কিন্তু আমি কি করিব? প্রভু যে আমাকে ডেকেছেন; আমি কেমন করে তাঁর আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পারি? না, না, তা হবে না। ঘরে থেকে কামাদির সেবা করে তাঁর কথা বলা হবে না; বল্লে কেহ শুন্‌বে না। কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন কর্‌তে হবে; প্রেমে জগৎ ভাসাতে হবে; আপনার পর ভুলে যেতে হবে; তবে নাম প্রচার হবে, তবে তাঁর ইচ্ছা এ জীবনে পূর্ণ হবে। আমি বৈকুণ্ঠের প্রত্যাশা করি না; আমি মুক্তি মোক্ষ চাই না; প্রভুর আজ্ঞাই আমার অবলম্বন; ইহাতে বাধা দিও না। ওই দেখ, শ্যামসুন্দর বংশীবদন আমাকে ডাক্‌ছেন! আর কি ঘরে থাকা যায়? বলিতে বলিতে গৌর উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। একটু সাব্যস্ত হইয়া গৌরচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন "জননি! ক্ষমা কর; আমি তোমার ঋণ এ জনমে পরিশোধ করিতে পারিব না। যেথানেই থাকি, তোমার স্নেহে আমি চিরক্রীত।"

শচী বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন "তবে কি বাপ! তুমি বিশ্বরূপের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাবে?"

বিশ্বম্ভর। না মা! তা যাবো না। আমি তোমাকে কথনই পরিত্যাগ করিব না। আমার সন্ন্যাস পরিত্যাগের জন্য নয়; কিন্তু কৃষ্ণেচ্ছা পূর্ণ করার জন্য। যেথানেই থাকি, তাহা জানিতে পারিবে; মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখা দিয়া যাইব। কেবল গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিব না, এই মাত্র। আর তুমি যখন মনে করিবে; তোমার হৃদয় মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে।

শচী বলিলেন "কবে সন্ন্যাস কর্‌বি?" বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন, "তাহার এখনও বিলম্ব আছে।"

এই সব কথা শুনিয়া শচীদেবী কথঞ্চিত আশ্বস্ত মনে আপনার নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পত্নী-সঙ্গে।

রজনীতে বিশ্বম্ভর নিজ শয়নকক্ষে শয়ান। অতি অন্যক্ষণ শুইয়াছেন,

সে জন্য গভীর নিদ্রা হয় নাই, অল্প অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে। দিবাভাগে মাতা পুত্রে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাকী ছিল না। তাহার পূর্ব্বেই তিনি লোকমুখে এ সব কথার কতক কতক আভাস পাইয়াছিলেন; এখন বিশ্বম্ভরের মুখে শুনিয়াছেন, শচীর রোদন ও বিলাপ দেখিয়াছেন এবং মাতা পুত্রের কথোপকথনও জানিয়াছেন। ঘরের বউ, ফুকারিয়া কাঁদিবার যো নাই, মর্ম্ম যাতনা বলিবার লোকও নাই, হৃদয়ের গভীর ব্যথা বুঝিবার ব্যথার ব্যথীও নাই। তাই বালা সমস্ত দিন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়াছে, হৃদয় বেদনায় অস্থির হইয়াছে এবং ভগ্ন-হৃদয়ে শয়নের কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে। এখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিলেন যে, প্রিয়পতি নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অসুখী করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া পতিপ্রাণা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় আস্তে আস্তে পতির চরণতলে বসিয়া পা দুখানি হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন এবং অতি সাবধানে ঈষৎ চুম্বন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। নীরব অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃবস্ত্র ভিজিয়া গৌরের পদযুগল অভিষিক্ত হইল; উত্তপ্ত নিশ্বাস বায়ু লাগিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সম্মুখে বিষাদের ছবি প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিয়া গৌরচন্দ্রের হৃদয়ে সকল কথা যুগপৎ আবির্ভূত হইল। তথাচ তিনি অতি ব্যস্তে ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! একি? কি হয়েছে বল; এত কাঁদিতেছ কেন?" নিমাই! এত চাতুরী খেলিতেছ কার সঙ্গে? কিছু কি জাননা, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হয়েছে? বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে যেন চৈতন্য নাই; অঞ্চলের অধোদেশ দিয়া যে বড় বড় জলের ফোঁটা গলিয়া পড়িতেছিল, তাহাতেই তাঁহার হৃদয় বেদনার গভীরতা বুঝা যাইতেছিল। গৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি কোন বাক্যালাপ করিলেন না, করিবার ক্ষমতাও ছিল না। যাহার নিকট মনের কথা বলিয়া বালিকা মনে করিয়াছিল সুখী হইবে, সংসার-অরণ্যে যে তরুকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিবে, সেই আজ তাহাকে ছাড়িয়া ফেলিতেছে; তবে আর কার কাছে কথা কহিবে? কেই বা হৃদয় বেদনা বুঝিবে? বালিকা সরল-মতি, সংসারের কুটিল বুদ্ধি জানে না। গৌরের ন্যায় জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত নয় যে, ভগবানের ইচ্ছায় নির্ভর

করিয়া থাকিতে পারিবে। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের যত টুকু ভালবাসা, সব পতির জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। তাই আজ পতির সন্ন্যাস কথা শ্রবণে বালিকা কেবলই কাঁদিতেছে। গৌর তাঁহার মুখের আচ্ছাদনবস্ত্র সরাইয়া দিয়া চিবুক ধরিয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—'প্রিয়ে! কি হয়েছে বল? তোমার ক্রন্দনে আমার হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিতেছে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া এবারে ক্রন্দন মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তাহা যদি লাগিত, তবে কি আর এমন করে ছেড়ে পলাইয়া যাইতে চাহিতে?" গৌর উত্তর করিলেন "কে বলিল আমি তোমাকে ছেড়ে সন্ন্যাস আশ্রমে চলিয়া যাইব?" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; চক্ষু দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা পড়িতে লাগিল। সেই কালের জন্য তিনি স্নেহ-মুগ্ধ হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিল, বুঝি তবে বিধাতা সুপ্রসন্ন; পতি তাঁহাকে ছাড়িবেন না; তাই আস্তেব্যস্তে দুই হস্তে স্বামীর দক্ষিণহস্ত ধরিয়া স্বীয় মাথায় রক্ষা করিয়া বলিলেন "নাথ! তবে আমার মাথায় হাত দিয়া বল, এ কথা কি সত্য নয়? লোকে যে কত কথা বলাবলি কর্‌ছে।" হায়! আশা-মুগ্ধ লোকে এ সংসারে কি না করে! গভীর জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ক্ষুদ্র তৃণলতা ধরিয়া বাঁচিব মনে করে; তেমনি বিপদ্‌মগ্ন লোকে ক্ষুদ্র আশালতা ধরিয়া বাঁচিতে চায়। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর অস্পষ্ট কথা শুনিয়া সেই মিথ্যা আশায় প্রতারিতা হইলেন। গৌরচন্দ্র এবারে বড় মুস্কিলে পড়িলেন, এবং আকাশপাতাল ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া কথান্তর পাড়িয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে যুবতীর মন প্রবোধ মানিল না; তিনি পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ সহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র তখন আসল কথা আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিলেন "এ কথা সত্য হইলে তুমি কি করিবে?" পতিপ্রাণা ইহা শুনিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। স্বামীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। গৌর অনেক যত্নে মূর্চ্ছাপনোদন করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! স্থির হও, এখন যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর।" স্বামীর ক্রোড়শায়িনী বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিলেন "আমাকে স্থির হইতে বলা, আর ব্যঙ্গ করা সমান কথা। তোমার মত কি আমার হৃদয়ে বল আছে যে, আমি এই নিদারুণ সংবাদে ধৈর্য্যা-বলম্বন করিতে পারিব? হায়! আমার মনে কত যে সাধ ছিল! তোমা-

হেন গুণের সাগর স্বামী পেয়ে আমি যে নবদ্বীপমধ্যে সৌভাগ্যবতী ছিলাম। বিধাতা আমার সকল সাধে বাদ সাধিল। তা' আমার জন্ত এখন আর আমি ভাবিতেছি না। তোমার জন্ত যে বড় ভয় হয় প্রভু! কেমন করে তুমি এ নবীন বয়সে সন্ন্যাসের কঠোর দুঃখ সহিবে? আমাকে যদি তোমার সন্ন্যাসপথে অন্তরায় মনে কর; তবে আমি এখনি এ জীবন হাসিতে হাসিতে পরিত্যাগ করিব; তুমি ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নামপ্রেম প্রচার কর। অনাথিনী মাকে প্রাণে বধ করো না; তোমার প্রিয় বন্ধুগণকে বিষাদসাগরে ডুবাইও না। জগজ্জনে তোমাকে যে প্রেমের অবতার বলে; আমাদের ছাড়িয়া গেলে তোমার অকলঙ্ক-চরিতে কলঙ্ক দিয়া লোকে যে কত অপযশ করিবে? কেমন করে সে সব নিন্দার কথা শুনিব? হা বিধাতঃ! তো'র মনে এত ছিল?"

গৌরচন্দ্র তখন ধীর ও গম্ভীর ভাবে আর্য্যাকে বলিতে লাগিলেন—"বিষ্ণুপ্রিয়ে! চিত্ত স্থির কর; একবার জ্ঞান চক্ষু মিলিয়া উপস্থিত বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর। যত কিছু স্থূল সূক্ষ্মাদি বস্তু দেখিতেছো, এ সকলের স্বাধীন সত্তা কিছু নাই; ইহারা একের প্রকাশে প্রকাশিত। সত্য বস্তু একমাত্র ভগবান্। তিনিই পরমাত্মারূপে সকলের আত্মা হইয়া প্রকাশিত। তিনিই চিদ্ বস্তু, আর সব চিদাভাস; তিনিই একমাত্র পুরুষ, তুমি, আমি আর আর যত কিছু, তাঁহারই প্রকৃতি। সংসারে কে কাহার পতি? কে কাহার পত্নী? তিনিই সকলের পতি। অতএব আমাকে সামান্ত পতি জ্ঞান ছাড়, সেই বংশীবদন শ্যামসুন্দরই তোমার সত্য পতি। এই যোগ অভ্যাস কর; তাঁকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিলে কখন বিচ্ছেদ হবে না। সে প্রেমের সমান আর প্রেম নাই। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া! সে নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। চিরকাল সুখে যাবে; বিষয়গরল পান করে, সংসার আগুণে আর পুড়ে মর্‌তে হবে না।'

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু সহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার এমন কি তপস্যা আছে যে, কৃষ্ণ সহবাস লাভ কর্‌তে পারবো? সংসার ছাড়িতে না পার্‌লে তো তাঁকে পতিরূপে বরণ করা যায় না। আমি কেমনে তাঁতে মতি স্থির কর্‌তে পারি, তার উপদেশ বল। তা'হলে তোমার বিরহযন্ত্রণা আর আমাকে অভিভূত কর্‌তে পার্‌বে না।"

গৌর সাগ্রহে উত্তর করিলেন "এ ত বেশ কথা; আমিও তো তোমাকে

সেই কথা বলিতেছি। প্রিয়ে! একটু চিন্তা করে দেখ, তাঁহাকে পাই-বার জন্য গৃহাদি ছাড়িয়া যে বনে যাইতে হইবে, এরূপ নয়। গৃহে থাকি-য়াও তাঁহাকে লাভ করা যায়। যাহাকে আমরা সংসার বলি, সে বস্তু আমাদের মনে। যেখানে থাকি না কেন, তাঁহাকে হৃদয়মাঝে রাখিয়া তাঁহার সহবাসে থাকিতে পারিলেই বৈকুণ্ঠ বাস হয়। আর তাঁহাকে ভুলিয়া থাকার যে অবস্থা, তাহাই সংসার। টাকা কড়ি, ধন দৌলত, গৃহ অট্টা-লিকা, বন্ধু বান্ধব, ধন মান, দাস দাসী, সুখ ঐশ্বর্য্য, পরিবৃত থাকিয়াও মানুষ যদি সেই প্রাণপতিকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া থাকিতে পারে, স্পর্শ-মণিতে সকল সুখৈশ্বর্য্য ছোঁয়াইয়া রাখিতে পারে, তবে তাহার সংসার কোথায়? যেমন একটু মাত্র লবণ সংযোগে স্বাদবিহীন উদ্ভিদাদি মধুর আস্বাদযুক্ত হয়; তেমনি সেই রসস্বরূপের কিঞ্চিন্মাত্র রসের প্রক্ষেপ এ সকলে দিতে পারিলে, ইহারাও আস্বাদনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু যে জন গৃহত্যাগী বৈরাগী হইয়া বনে গিয়াও তাঁহাকে চায় না; তাঁহার স্মরণ মনন ধ্যান করে না; নিজের অসার অহঙ্কারে, বাসনায়, কামনায় ডুবিয়া থাকে; সেই ত যথার্থ সংসারী। প্রিয়ে! মন এমন বস্তু নয় যে স্থির থাকিবে। তাহাকে যদি হরিপাদপদ্মে না লাগাইতে পার; সে অহং জ্ঞানে ডুবিবেই ডুবিবে; কুবাসনায় মজিবেই মজিবে। তাই বলিতেছি তাঁহার স্মৃতিবিহীন মিথ্যা সংসার-জ্ঞানকে ছাড়। এই ঘরে বসিয়াই তাঁহার দাসী হইতে পারিবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া সুযোগ পাইয়া উত্তর করিলেন "তবে তুমি কেন গৃহত্যাগ করিতে চাহিতেছো? তোমার তো মিথ্যাসংসার ছুটিয়াছে। ঘরে বসে কেন সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিয়া বিষয়ভোগ কর না? অনর্থক আমাকে কেন অকুল সাগরে ভাসাইতেছো? আদ্‌মারা মাকে মারিয়া ফেলিতেছো? প্রাণের বন্ধুদিগকে অনাথ করিতেছো?" গৌর এ কথার উপর কথা দিয়া বলিলেন "আমার প্রতি প্রভুর আদেশ অন্য রূপ; আমি নিজে স্বতন্ত্র নই, তাঁহার আজ্ঞার একান্ত অধীন।" এই বলিয়া নিত্যানন্দাদির নিকট যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা একে একে বিবৃত করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর করিলেন—"তবে আমার জীবনে কি প্রভুর কোন আদেশ নাই? সামান্য উদ্ভিদ, কীট পর্য্যন্ত তাঁহার কাজে লাগে; আর বঙ্গনারীর জীবন কি এতই নীচ যে, ইহাতে তাঁহার কোন সেবাই হইবে না?"

গৌর। কে বলিল হইবে না? নারীপ্রকৃতি, পরমপবিত্র প্রকৃতি। ইচ্ছাময়ের ভাণ্ডারে যত সুন্দর সুন্দর কোমল রত্ন ছিল, তাহা দিয়া তিনি নারী হৃদয় সাজাইয়াছেন; আর স্বয়ং মাধব, মা হয়ে তাহাতে বসে প্রেম-লীলা করছেন। কিন্তু আমরা এমনি পামর যে, এমন সুন্দর ও পবিত্র বস্তু চিনিতে পারি না। ইহা তাঁহার সেবার জিনিস; তাহা ভুলে গিয়ে আমরা ইহার কি না হীন ব্যবহার করিতেছি? দেবতার ভোগের বস্তু পিশাচে অর্পণ করিতেছি। যাক্, সে কথায় কাজ নাই। তুমি যদি বংশীবদনের বংশী-স্বর শুনিয়া থাক; সেইরূপে ব্যবহার করিতে পার। তাহাতে কেহ তোমাকে বাধা দিবার অধিকারী নাই। বলিতে বলিতে গৌরের অনুরাগসিন্ধু উছলিয়া উঠিল। তিনি অনুরাগ ভরে কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কথিত হইয়াছে যে, এই সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ নিরীক্ষণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ঘটনা যাহাই হউক, ইহা সত্য যে, শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশে বিষ্ণুপ্রিয়ার জ্ঞানদৃষ্টি প্রস্ফু-টিত হইয়াছিল। গৌর প্রিয়পত্নীকে অনুরাগভরে বার বার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! তোমার ও আমার আত্মায় যখন গভীর প্রেম-যোগ রহিয়াছে; তখন আমি যেখানেই থাকি না কেন? তোমার হৃদয় ছাড়া কখন হইব না। প্রভুর আজ্ঞানুসারে দেশে দেশে নামপ্রেম প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাসে যাইতেছি; তাই আমাদের বাহিরের যোগ ছিন্ন হই-তেছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের যোগ কখন যাইবার নহে। আমি তোমার প্রেমে চিরকাল তোমার হৃদয়ে বাঁধা থাকিব। বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন "ইনি স্বতন্ত্র প্রভু; আমার সাধ্য কি যে ইহার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারি? বিশেষতঃ ভগবানের আদেশপালনে ইনি ব্রতী; আমি যদি সে ব্রত ভঙ্গ করি; আমিই প্রত্যবায়ভাগিনী হইব। আমার এ সংসারের সুখ গেল গেল, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে এ দগ্ধ হৃদয় ছারখার হবে হউক, আমি তথাচ আর নিজের দুঃখের কথা বলিয়া ইহার কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত জন্মাইব না।" বঙ্গরমণি! তোমরা কি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার এই দেবতুল্য স্বার্থ-বিসর্জ্জন শিখিবে না?

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস যাত্রা।

পলে পলে দণ্ড, দণ্ডে দণ্ডে দিন, দিনে দিনে মাস। এমনি করে নবদ্বীপ-নগরে মাসের পর মাস কাটিয়া গেল। গৌরের সন্ন্যাসের কথা অবান্তর ঘটনারাজির মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। নিমাই পণ্ডিত গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া যে একটা জনরব উঠিয়াছিল, তাহা সকলে এক প্রকার ভুলিয়া গেল। গৌরও অতি সাবহিতে সে কথা হৃদয়ের নিভৃত দেশে লুকাইয়া রাখিলেন, আর তাহার উচ্চবাচ্য করিলেন না। তাঁহার ব্যবহার একেই অমায়িক ছিল; এই সময়ে আরও মধুরতর হইয়া উঠিল। যে কথা বা যে চিন্তা স্মৃতিতে জাগরিত হইলে মাতার মনে কষ্ট ও দুশ্চিন্তার উদয় হইতে পারিবে, তাহার দিক দিয়াও তিনি যাইতেন না। মায়ের মন ও ইচ্ছা বুঝিয়া সর্ব্বদা সাধন ভজনের ব্যাঘাৎ জন্মাইয়াও সেবা করিতে তৎপর হইলেন; নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদকৌতুকে ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন; কত সুন্দর সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার তাঁহাকে উপঢৌকন দিতে লাগিলেন; ধর্ম্মবন্ধুদিগের যাঁহার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত, তদপেক্ষাও মধুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন; মুরারি, মুকুন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, প্রভৃতি বন্ধুদিগের গৃহে পান ভোজন, আমোদকৌতুকে নিরন্তর অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাড়ীর বালকবালিকা, দাস দাসীদিগকে লইয়া গৌর কত রহস্য, প্রেমালাপে সময় কাটাইতে লাগিলেন; তাঁহার বিদ্বেষী পাষণ্ডীদিগের বাটীতে যাইয়াও বিবিধ প্রকারে আত্মীয়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া সকলেই এক প্রকার সন্ন্যাস যাত্রার বিষয়টা ভুলিয়া গেল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃতি যাঁহারা, তাঁহার মনের নিগূঢ় ভাব জানিতেন, তাঁহারা এই বাহ্য ব্যবহারে প্রতারিত হইলেন না।

আজ ১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন। বিশ্বম্ভর আজ প্রত্যূষ হইতে শ্রীবাসগৃহে খুব উন্মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তমণ্ডলী ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়া গিয়াছেন; জমাট ভাবের প্রভাবে শ্রীবাস অঙ্গন আজ সত্য সত্যই বৈকুণ্ঠের শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেই

দিনই যে নবদ্বীপের প্রেমমহোৎসবের শেষদিন, সরলমতি শ্রীবাস তাহা তখনও জানিতে পারেন নাই। আজ রজনীশেষে নবদ্বীপপুরীকে অন্ধকারসাগরে ডুবাইয়া দিয়া নবদ্বীপচন্দ্র যে অন্তর্হিত হইবেন, তাহা জানিতে পারিলে ভক্তগণ এ মহোৎসবে যোগ দিতে পারিতেন না। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইলে সকলে কিছুকালের জন্য স্নান ভোজনে গমন করিলেন। বিশ্বম্ভর বাটীতে আসিয়া স্নান পূজা সমাপনান্তে জননীর পাদবন্দনা করিলেন এবং প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিয়া সুহৃদ্বর্গসঙ্গে নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা কথায় নগরের অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া তিনি শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে বন্ধুগণসহ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন এবং সেখানে সকলকে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে যাইতে বলিয়া দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সায়ংকৃত্য সমাধানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের পিঁড়ায় উপবেশন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে মুকুন্দ, মুরারি, শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর, নিত্যানন্দ, হরিদাস, প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া জুটিলেন। তখন নানারূপ ভগবৎ কথার আলোচনা হইতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই সময়ে গৌরচন্দ্র নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের মালায় বিভূষিত ও অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ মাধুরী শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া লোকের মন আকৃষ্ট করিতেছিলেন। নগরের নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে নিজের গলার পুষ্পমালা উপঢৌকন দিয়া কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "বন্ধুগণ! যদি আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে; তবে কেবল কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাক। জীবনে, মরণে, সম্পদে, বিপদে, স্বদেশে, বিদেশে, শয়নে, ভোজনে, কেবল কৃষ্ণনাম ভিন্ন আর কিছু বলিবে না।"

এইরূপ সৎপ্রসঙ্গ ও উপদেশ চলিতেছে, এমন সময় তরকারি-বিক্রেতা শ্রীধর এক লাউ হাতে করিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে শ্রীধর! এমন সুন্দর লাউ কোথায় পাইলে?" শ্রীধর উত্তর করিল, "তোমার কৃপায় লাউর অভাব কি?" এই কালে আর এক ভক্ত দুগ্ধভেট আনিয়া দিলে বিশ্বম্ভর তখন জননীকে

ডাকিয়া বলিলেন "মা! বড় ভাল হয়েছে; এই দুগ্ধ ও লাউ দিয়া দুগ্ধ-লাউ পাক করগে।" শচীদেবী পুত্রের ইচ্ছানুসারে রন্ধনের কার্য্যে গমন করিলেন। এদিকে রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর পর্য্যন্ত বন্ধুগণসঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গ করিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া ভোজনে বসিলেন। কেবল গদাধর ও হরিদাস বিষ্ণুমণ্ডপের পিঁড়ায় শয়ন করিয়া থাকিলেন। কি যেন মনে ভাবিয়া তাঁহারা সে রাত্রি শচীর মন্দিরে যাপন করিলেন। বিশ্বম্ভর আচমনান্তে শয়নকক্ষে গমন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত একত্র শয়ন করিলেন। চৈতন্যমঙ্গলকার লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরচন্দ্র সেই রজনীতে নানারূপ কৌতুকক্রীড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, গৌরের আত্ম-ধারণার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বৈরাগ্যের তীব্র উত্তেজনা, অনুরাগের প্রগাঢ় তরঙ্গ, যখন হৃদয়মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে; তখন স্থির ও অচঞ্চল ভাবে মাতা পত্নী আত্মীয় বন্ধুদিগের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সক্ষম হওয়া, বড় কম আত্মসংযমের ব্যাপার নহে।

গৌরচন্দ্রের ইঙ্গিতে নিত্যানন্দ, শচীদেবী প্রভৃতি পাঁচ জনকে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সন্ন্যাসগমনের সময় অবগত করিয়াছিলেন। শচীর প্রাণে সে কথা জাগিতেছে। তাই আজ রাত্রিতে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; নিঃশব্দে বালিশে মাথা দিয়া সমস্ত রজনী অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। শচী ডাকিয়া কাঁদিতে পারিলেন না, পাছে যাত্রাকালে পুত্র মনে কষ্ট পান, পাছে পুত্র-বধূর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

আহা! সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া ইহার কিছুমাত্র জানে না; আজ যে তাহার কপাল ভাঙ্গিবে জানিতে পারিলে সে কি আর সুখে পতির কোলে ঘুমাইতে পারিত? বিশ্বম্ভর একটী বারও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। পারিবেনই বা কেন? এ অবস্থায় কি কাহারও ঘুম আইসে? রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে গৌরচন্দ্র ইষ্টদেবের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া এবং ভগবানের হস্তে মাতা পত্নীকে সমর্পণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং গমনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী লইয়া, এ জন্মের মত ঘর বাড়ী, মাতা, বনিতা, প্রিয় জন্মভূমি, পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। গৌর শয়নকক্ষের দ্বারের নিকটে গিয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিলেন; অন্ধকারের ক্ষীণালোকে আবার একটী-

বার নিদ্রিতা পত্নীর মুখারবৃন্দ দেখিয়া লইলেন। গৌর! ফের! ফের! আর যাইও না, অবলাকে অকুল পাথারে ভাসাইও না। প্রিয়তমা ভার্য্যার সরলতা ও স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিয়া গৌরের মন একটু চঞ্চল হইল। তিনি একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হৃদয়মাঝে আবার সেই বাঁশী বাজিয়া উঠিল; স্বপ্নের মধ্যে যে নবঘনসুন্দর মুখেবাঁশীর গান শুনিয়া ছিলেন, আবার সেই বাঁশী তেমনি করে বাজিয়া উঠিল; "আয়! আয়! আয়! ধন, মান, কুল, শীল, মাতা ভার্য্যাকে ছেড়ে নামপ্রেম বিলাইতে আয়! যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে আয়!" বলিয়া আবার বাঁশরী বাজিল। গৌর অমনি সিংহের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন, আপনার দুর্ব্বলতাকে শত ধিকার দিয়া জোরে দ্বার খুলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার শব্দ পাইয়া গদাধর হরিদাস নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমরা সঙ্গে যাইব।" গৌর বলিলেন "তা'হবে না, আমি কাহাকেও সঙ্গে লইব না; সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষই কেবল আমার সঙ্গ।" তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন।

শচীমাতা সারানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাষাণ সমান হইয়াছেন। পুত্রের গমনোদ্যম বুঝিতে পারিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় বাহির দ্বারে আসিয়া বসিয়া আছেন। মুখে বাক্য নাই, নিষ্পন্দজড়ের ন্যায় বসিয়া আছেন। গৌরচন্দ্র জননীকে তদবস্থ দেখিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার কর ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা! কি আর বলিব? নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া তুমি চিরদিন আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ, কত সুখে রাখিয়াছ, লেখাপড়া শিখাইয়াছ, এবং অশেষ প্রকারে সুখী করিয়াছ। তুমি আমার যত করিয়াছ, আমি কোটি জন্মেও তাহার পরিশোধ দিতে পারিব না। তোমার ঋণে আমাকে চিরদিন ঋণী থাকিতে হইবে। শুন মা! এ সংসার নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের অধীন; কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহার ইচ্ছার এক চুলও ব্যতিক্রম করিতে পারে। যত সংযোগ বিয়োগ, মিলন, বিরহ, সেই প্রভুর ইচ্ছাতেই হইতেছে। তাঁহার লীলা বুঝিতে কাহার সাধ্য আছে? আমি সেই নাথেরই নিয়োগানুসারে তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেছি; ইহাতে তোমার চিন্তা করা উচিত না।" এই বলিয়া গৌরচন্দ্র জননীর বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "কিন্তু মা! তোমাকে আমি একেবারে ছাড়িব না, ছাড়িতে পারি না, তোমার ভরণ পোষণ, ধর্ম্ম যাজন,

পরমার্থ, সব আমার ভার। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তোমার সর্ব্বাঙ্গীন ভার, আমার—আমার।" বিশ্বম্ভর যত বলিলেন, শচীদেবী তাহার একটি কথারও উত্তর দিলেন না, দিবার সাধ্যও ছিল না। তিনি পৃথিবীর ন্যায় নিস্পন্দ জড়ভাবে কেবল অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিশ্বম্ভর তখন শোকাভিভূতা পতিতা জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং আর কিছু না বলিয়া দুয়ার খুলিয়া একেবারে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন ও ভাগীরথী পার হইয়া নিঃসঙ্গ পদব্রজে কণ্টকনগরী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ আঁধার করিয়া নবদ্বীপচন্দ্র অস্তমিত হইলেন; তাই যেন শীত-যামিনীর ঊষা-বধূ শিশির ছলে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ম্লান মুখে পূর্ব্বাচলে উঠিতে লাগিল; পশুপক্ষী শোকাভিভূত হইয়া স্ব স্ব রবে যেন কাঁদিয়া উঠিল; শ্রীবাসের অঙ্গনে অন্ধকারের ভিতর দিয়া যেন বিষাদের আবরণ পড়িয়া গেল। শচীদেবী মূর্চ্ছিতা জড়ের ন্যায় দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার কালনিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই, গদাধর হরিদাস মাথায় হাত দিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বর্গেতে আর এক দৃশ্য হইল। দেবগণ জীব উদ্ধারের উপায় হইল ভাবিয়া দুন্দুভি-নিনাদ ও পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যে সাধু-মহাজন ছিলেন, সেই ঊষা সময়ে কে যেন তাঁহাদের প্রাণের আনন্দ-তন্ত্রী ঝঙ্কারিয়া দিল। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবী ভূমিকম্পচ্ছলে আনন্দে নাচিয়া উঠিল, এবং দশ দিঙ্‌মণ্ডল সুপ্রসন্নভাব ধারণ করিল। নবযুগের নবধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীব নিস্তার করিতে নবীনবয়সে গার্হস্থ্য ছাড়িয়া নব যুগাবতার বাহির হইতেছেন; স্বয়ং ভগবান্ জীবন্তভাবে তাঁহার রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। গৌরের হৃদয়ের যত প্রেম, যত ভাব, যত আনন্দ, ভবিষ্যৎ জীবনের জ্যোতির্ম্ময় আভাস, একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘর বাড়ী, মাতা, ভার্য্যা, বন্ধুগণ, এ সকলের চিন্তা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চিদানন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন; দুর্দ্দান্ত প্রেমানুরাগে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; এবং গাইতে, নাচিতে, হাসিতে, পড়িতে, ঢুলিতে ঢলিতে কাটোয়ার পথে মন্থর গতিতে যাইতে লাগিলেন।

এদিকে রজনীপ্রভাতে দুই একটী করিয়া ভক্তবৃন্দ গৌরের সহিত

সাক্ষাৎ করিবার জন্য শচীর মন্দিরের নিকট আসিতে লাগিলেন। আসিয়া শচীদেবীকে জড়ের ন্যায় দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িলেন এবং হরিদাস গদাধরের মুখে সকল কথা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ ও মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল। বিষাদ ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল; আঙ্গিনা লোকে পূর্ণ হইয়া গেল; বিষ্ণুপ্রিয়া জাগরিতা হইয়া স্বামীকে শয্যায় না দেখিয়া এবং বাড়ীতে জনকলরব ও ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে জ্ঞানশূন্যা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় অভাগিনী ছুটিয়া আসিয়া দ্বারদেশে যেখানে শচীমাতা পড়িয়াছিলেন,—সেইখানে পড়িয়া গেলেন। যাঁহার মুখ কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই কুলবধূ, শোকে নির্লজ্জা হইয়া গুরুজনের সমক্ষে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাহা শুনিয়া পাষাণও ফাটিয়া গেল। নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধনরনারী আজ শচীর মন্দির পূর্ণ করিয়া শচীনন্দনের সন্ন্যাস গমনে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ভক্তগণ শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি যে পাঁচ জনকে গৌরচন্দ্র স্বীয় সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা একত্র মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার অনুসরণ জন্য গঙ্গাপার হইয়া কাটোয়ার পথে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য এবং ব্রহ্মানন্দ, এই পঞ্চজন তাঁহার নিষেধ না মানিয়া তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কতকদূর যাইয়া পথিমধ্যে সঙ্গ লইয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইলে গৌরচন্দ্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে বন্ধুগণ সহ কেশব ভারতীর কুটীর দ্বারে যাইয়া উপনীত হইলেন।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের সহিত চৈতন্যমঙ্গলের কথা যথাসম্ভব ঐক্য করিয়া উপরোক্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। কিন্তু শিবানন্দসেন মহাশয়ের পুত্র কবি কর্ণপুর স্বরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সন্ন্যাসযাত্রার যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা এই বৃত্তান্ত হইতে কিছু বিভিন্ন। কর্ণপুর গৌরচন্দ্রের নীলাচলে অবস্থিতি করার সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন কয়েক বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে নীলাচলে গিয়াছিলেন; গৌরচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে বালকের নাম পুরীদাস রাখা হইয়াছিল; এবং বালকের সহিত গৌর কত হাস্য পরিহাস করিয়াছিলেন।

এ অবস্থায় কর্ণপুরের বৃত্তান্ত বৃন্দাবনদাসের বৃত্তান্তাপেক্ষা অধিক সঠিক হইবার সম্ভব ছিল। কিন্তু কর্ণপুর নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, গৌরের জীবনী লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার নাটকে প্রেম, ভক্তি, মৈত্রী, প্রভৃতি কল্পিত পাত্র সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বৃন্দাবন দাসের ন্যায় তাঁহার বাসস্থান নবদ্বীপে ছিল না। তিনি স্বয়ং কিছু গৌরের বাল্য জীবনের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেন নাই। বৃন্দাবনের ন্যায় তাঁহাকেও গ্রন্থের বর্ণনীয় বৃত্তান্ত তাঁহার পিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট শুনিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের সংগ্রহ যেমন, নবদ্বীপস্থ ব্যক্তি-নিচয়ের নিকট হইতে গৃহীত; তাঁহার সেরূপ হইবার তত সুযোগ ছিল না। তবে কর্ণপুরের গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক কোন্ বৃত্তান্ত নির্ভরণীয়, সে বিষয়ে আমাদের মতামত কিছু নাই। উভয় বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, পাঠকগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন। কবি কর্ণপুর বলেন, গৌরচন্দ্র স্বীয় সন্ন্যাসগ্রহণের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; কেবল তাঁহার মাতাকে একদিন ইঙ্গিতে এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, কোন প্রয়োজন সাধন জন্য গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য তিনি তীর্থ গমন করিবেন; শচী যেন তাহাতে উদ্বিগ্না না হন। এমন কি, সন্ন্যাস গমনের পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে জমাট সংকীর্ত্তন হইয়াছিল; বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে গৌর সে রাত্রিতে কর-তালি দিয়া কত নাচাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য দিনের ন্যায় কীর্ত্তন সমা-ধান্তে ভক্তগণ যে যাহার গৃহে গমন করিলে গৌরচন্দ্রও স্বীয় গৃহে যাইবার ব্যপদেশে শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কেবল মাত্র চন্দ্র-শেখর আচার্য্যরত্ন ছিলেন। তাঁহাকে গৌর 'চলুন একটু প্রয়োজন আছে' বলিয়া সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন; পথে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকেও বলিলেন "চল, তুমিও যাবে।" তাঁহারা কিছু উত্তর না করিয়া ছায়ার ন্যায় পশ্চাদ্গামী হইলেন এবং গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়াভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঈদৃশ অভাবনীয় ব্যবহারের জন্য তখন উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছু উত্তর দিলেন না; কখন মৌনভাবে, কখন হাসিতে, কান্দিতে প্রেমে গর গর হইয়া সমস্ত দিন পরে কণ্টক নগরীতে কেশবভারতীর কুটীরে যাইয়া উত্তীর্ণ হইলেন। সমভিব্যাহারী দুইজন অবাক্ হইয়া গেলেন। নবদ্বীপের

লোক ইহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি জানিতে পারিল না। শচী মনে করিলেন বিশ্বম্ভর শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তনে জাগরণ করিতেছেন; শ্রীবাসাদি মনে করিলেন, প্রভু স্ব মন্দিরে শয়ন করিতে গেলেন। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া শচীর সন্দেহ ঘনীভূত হইল; ভক্তগণ ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল তৃতীয় দিনে যখন আচার্য্য রত্ন কাটোয়া হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ।